এককুড়ি ভালবাসা

এককুড়ি ভালবাসা

বুকমার্ক
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট ১৯৬৩

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু



নীল-লোহিতের আদিপ্রেম

প্রমথ চৌধুরী

কি কুক্ষণেই নীল-লোহিতের হামবড়ামির গল্প পাঁচজনের কাছে বলেছিলুম। তারপর থেকে যাঁর সঙ্গে দেখা হয় তিনিই আমার মুখে নীল-লোহিতের আর-একটি গল্প শুনতে চান। সে গল্প বলা যে কত কঠিন তা নীল-লোহিতের admirer-রা একবারও ভাবেন না। প্রথমত নীল-লোহিতের গল্প শুনেছি বহুকাল পূর্বে, এখন তা উদ্ধার করতে স্মৃতিশক্তির উপর বেজায় জবরদস্তি করতে হয়। কারণ নীল-লোহিতের বাজে কথা সব পলিটিক্স বা ধর্মের লাখ কথার এক কথা নয়, যা শোনবামাত্র মনে গেঁথে যায় আর কাঁটার মতো বিঁধে থাকে। সুতরাং আমার বন্ধুবরের রূপকথার জন্য স্মৃতির ভাণ্ডারে হাতড়ে বেড়ানোর চাইতে গল্প নিজে বানিয়ে বলা ঢের সহজ। তবে গল্প যদি আমি বানিয়ে বলি তা হলে তাতে কেউ কর্ণপাত করবেন না। কারণ সে গল্পের ভিতর বীররসও থাকবে না, মধুররসও থাকবে না। এর কারণ আমি বাঙালি। আমরা অবশ্য মরি, কিন্তু সে মৃত্যু ঘটে যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, রোগশয্যায় ; আর আমরাও ভালোবাসায় পড়ি, কিন্তু সে শুধু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে, সঙ্গদোষে বা গুণে। পরিণয় হচ্ছে আমাদের বাধ্যতামূলক প্রণয়শিক্ষার সনাতন ইস্কুল। আর সে স্ত্রীও আমাদের সংগ্রহ করতে হয় না, গুরুজনেরা সংগ্রহ করে দেন— কিঞ্চিৎ দক্ষিণাসমেত। অপরপক্ষে নীল-লোহিত ছিলেন বীররস ও আদিরসের অবতার। নীল-লোহিতের আত্মকাহিনী আগাগোড়া অলীক হলেও, তাঁর সকল কাহিনীর ভিতর একটা জিনিস ফুটে উঠত— সে হচ্ছে তাঁর মুক্ত আত্মা। আজ তাঁর একটা ছোট্টগল্প মনে পড়ছে, সেইটে আপনাদের কাছে বলতে চেষ্টা করব। আশা করি এর পর নীল-লোহিতের আর কোনো গল্প আপনারা শুনতে চাইবেন না। আজগুবি কথারও একটা সীমা আছে।

(২)

সেদিন আমাদের সভায় আমাদের বন্ধু উদীয়মান কবি শ্রীভূষণ মন খুলে বক্তৃতা করছিলেন, আর আমরা পাঁচজনে নীরবে তাঁর বক্তৃতা শুনছিলুম। সে বক্তৃতার বিষয় ছিল অবশ্য প্রেম। শ্রীভূষণ বহু ইংরেজ কবির কাব্য থেকে দেদার কোটেশানের সাহায্যে প্রমাণ করছিলেন যে, প্রেম বস্তুটি হচ্ছে মূল্যহীন ফুলের বিনিসুতোর মালা। শ্রীভূষণের ভাষার ভিতর এতটা প্রাণ ছিল যে, প্রেমনামক আকাশ কুসুমের অশরীরী গন্ধে আমরা ঈষৎ মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলুম। একমাত্র মেডিকেল কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র অনিলচন্দ্রের মুখ দেখে মনে হল যে,

শ্রীভূষণের কবিত্ব তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছে। শ্রীভূষণ থামবামাত্রই অনিল বলে উঠলেন যে, মানুষে যাকে প্রেম বলে সে বস্তুটি একটি শারীরিক বিকার ছাড়া আর কিছুই নয় আর তা যে নয়, তা অনুবীক্ষণের সাহায্যে সকলকেই দেখিয়ে দেওয়া যায়। ওর বীজ আমাদের দেহের gland-এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। আর সেইজন্যই লোকের মনে কৈশোরেই প্রেম জন্মায়, তার পূর্বে নয় ; কারণ বালকের দেহে প্রেমের বাহন gland এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। নীল-লোহিত শ্রীভূষণের কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছিলেন, কিন্তু অনিলের কথা শুনে একেবারে চটে উঠে বললেন, "তোমাদের শাস্ত্রে বলে নাকি যে, ছোটো ছেলে প্রেমিক হতে পারে না? অথচ আমি যখন প্রেমে পড়ি, তখন আমার বয়স কত জান? সবে পাঁচ বৎসর।"

অনিল বললেন, "কি! পাঁচ বৎসর?"

নীল-লোহিত উত্তর করলেন, "তুমি যদি আমার বিলেতিদস্তুর জীবনচরিত্র লিখতে চাও তা হলে বলি— তখন আমার বয়েস পাঁচ বৎসর. পাঁচ মাস, পাঁচ দিন। যদি জানতে চাও যে আমি ঠিক বয়েস জানলুম কি করে? জানলুম এইজন্যে যে, যেদিন আমি প্রেমে পড়ি সেইদিন আমি মাকে গিয়ে আমার জন্মতিথি কবে, জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমার ঠিকুজির সঙ্গে পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে, আঁক কষে আমার ঠিক বয়েস বলে দিলেন।"

নীল-লোহিতের এ কথা শুনে আমরা সকলে চুপ করে থাকাই সংগত মনে করলুম। শুধু শ্রীভূষণ বললে যে, চণ্ডীদাস লিখেছেন—

জনম অবধি পীরতি বেয়াধি অন্তরে রহিল মোর,
থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া ওঠে, জ্বালার নাহিক ওর।

চণ্ডীদাসের উক্তি যে সত্য— নীল-লোহিত তার প্রমাণ। নীল-লোহিত প্রতিবাদ করে বললেন যে, চণ্ডীদাসের কথা সত্য হত, যদি তিনি ঐ ব্যাধি শব্দটা ব্যবহার না করতেন। অনিল পাছে ঐ ব্যাধি নিয়ে একটা তর্ক বাধায়, এই ভয়ে আমি প্রস্তাব করলুম যে, প্রেম জিনিসটা ব্যাধি কি না, তা নিয়ে পরে তর্ক করা যাবে ; এখন নীল-লোহিতের আদিপ্রেমের উপাখ্যান শোনা যাক। অমনি নীল-লোহিত তাঁর বর্ণনা শুরু করলেন।

(৩)

নীল-লোহিত এই বলে তাঁর গল্পের সূত্রপাত করলেন যে, এ গল্প তোমাদের বলতুম না, কারণ প্রেম যে কি বস্তু তা যারা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে তারা পাঁচজনের কাছে প্রেমের ব্যাখ্যা করে না ; করে তারাই, যারা প্রেমের শুধু নাম শুনেছে, কিন্তু রূপ দেখেনি— যথা আধ্যাত্মিক কবিরা আর দেহতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকেরা। এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ তোমরা হাতে হাতেই পেলে। কবি শ্রীভূষণ প্রেমকে এত উঁচুতে ঠেলে তুললেন যে দূরবীক্ষণের সাহায্যেও তার সাক্ষাৎ মেলে না ; আর বৈজ্ঞানিক অনিলচন্দ্র তাকে এত নিচুতে নামালেন যে চোখে অনুবীক্ষণের চশমা এঁটেও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। আজ তোমাদের কাছে

যে আমার প্রেমের হাতে খড়ির কথা বলছি, সে শুধু এই কবি ও বৈজ্ঞানিকের মুখ বন্ধ করবার জন্য। এখন ব্যাপার কি ঘটেছিল শোনো।

আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম একটি পাড়াগেঁয়ে শহরে। পাড়াগেঁয়ে শহর কাকে বলে জান? সেই লোকালয়— যা শহরও নয়, পাড়াগাঁও নয়। ও হচ্ছে একরকম কাঁঠালের আমসত্ত্ব। একটি পাড়াগেঁয়ে শহর দেখলেই বোঝা যায় যে, তা একটা পুরানো শহরের ভগ্নাবশেষও নয় ; তার অতীতও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। যদি ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত, থানা জেলখানা, বিদ্যালয় ও অবিদ্যালয় থাকলেই একটা মান্ধাতার আমালের পল্লিগ্রাম শহর হয়ে ওঠে তো আমার জন্মস্থানও শহর ছিল। কারণ সেখানে জজও ছিল, ম্যাজিস্ট্রেটও ছিল, দারোগাও ছিল, স্কুলমাস্টারও ছিল। আর স্কুল ছিল দু'জাতের— অর্থাৎ মেয়েদের আর ছেলেদের। কোন্‌টি যে কি, তা দেখলেই চেনা যেত। ছেলেদের স্কুল ছিল কোঠাবাড়ি, আর মেয়েদের চালাঘর। এর কারণও স্পষ্ট। ছেলেদের পড়ানো হত জজ ম্যাজিষ্ট্রেট উকিল দারোগা বানাবার জন্য ; আর মেয়েদের পড়ানো হত কেন, তা মা-গঙ্গাই জানেন। অবশ্য এ প্রভেদ এখন ততটা চোখে পড়ে না, কারণ একালে ছেলেরা হয়ে পড়েছে সব মেয়েলি, আর মেয়েরা পুরুষালি।

(৪)

আমার বয়েস পাঁচ বৎসর হতেই আমাকে একটি বালিকাবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হল। বিদ্যালয়টি ছিল আমাদের বাড়ির কাছে ; ভিতরে শুধু একটি মাঠের ব্যবধান ছিল। এ বিদ্যালয়ের শুধু একটিমাত্র ক্লাস ছিল, কাবণ একটি বড়ো আটচালার একটিমাত্র ঘরে স্কুল বসত। মাথার উপর ছিল খড়ের চাল, আর চারপাশে দরমার বেড়া। আর ছাত্রীরা বসত সব ছেঁড়া মাদুরের উপর। মাস্টার কি মাস্টারনী কেউ ছিল কি না মনে পড়ে না। তবে এইটুকু মনে আছে যে আমরা সকলে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করতুম ; কিন্তু কি যে সেখানে পড়েছি, তার বিন্দু-বিসর্গও মনে নেই। সম্ভবত সেখানে পড়ার চাইতে লেখাটাই বেশি হত। আমি অবশ্য এ স্কুল ছেড়ে ছেলেদের স্কুলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলুম, কারণ ছেলেদের স্কুলে গেলে পাঁচজন ছেলের সঙ্গে মারামারি করা যায়, পাঞ্জা কষা যায় ; কিন্তু এ স্কুলে পরস্পর পরস্পরকে শুধু চিমটি কাটত। আমাকে বালিকা-বিদ্যালয় থেকে তুলে নিয়ে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করে দেবার কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় এমন-একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে কেউ আমাকে আর সে স্কুল ছাড়াতে পারলেন না। আমাদের স্কুলে পুরানো ছাত্রী নিত্য ছেড়ে যেত, আর নূতন ছাত্রী নিত্য ভর্তি হত। আমার বয়েস যখন পাঁচ বৎসর, পাঁচ মাস, পাঁচ দিন ঠিক সেইদিন একটি নূতন ছাত্রী আমাদের স্কুলে এল, যাকে দেখাবামাত্রই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলুম। এর মূলে ছিল— আলংকারিকেরা যাকে বলে পূর্ব্ববাসনা।

(৫)

এ কথা শুনে অনিলচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না, নীল-লোহিতের কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার মনের নতুন ভাবকে তুমি সেই মুহূর্তেই প্রেম বলে চিনতে পারলে? নীল-লোহিত বললে, "অবশ্য এ জাতীয় মনোভাব তো আর বই পড়ে শিখতে হয় না, ঠেকেই শিখতে হয়। প্রেমে পড়া আমার সহজ প্রবৃত্তি। এর পর আমি বছরে অন্তত দুবার করে প্রেমে পড়েছি, কিন্তু সে-সবই হচ্ছে আমার সেই আদিপ্রেমের reprint মাত্র। পূর্বের সঙ্গে পরের যা-কিছু প্রভেদ, সে শুধু ছোটোবড়ো type এর। অনেকের বিশ্বাস যে, ছোটো ছেলের কোনো স্পষ্ট অনুভিত নেই, আছে শুধু বয়স্ক লোকের। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার বয়েস যখন ছ বৎসর, তখন আমার একটি আত্মীয় মারা যান। সেদিন আমার চোখে পৃথিবীর যে নতুন চেহারা দেখা দিয়েছিল, তারপরে পরিবারে যত বার মৃত্যু ঘটেছে, প্রতিবারেই সেই চেহারা দেখেছি। মরে শুধু একজন লোক, আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন জনশূন্য হয়ে যায়, রোদ খাঁ খাঁ করে, আকাশের আলোর ভিতর একটা বিশ্রী ঔদাস্যের ভাব আসে, আর চার পাশের লোকজন সব ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। মৃত্যু ও প্রেম সম্বন্ধে ছেলে-বুড়োর কোনো অধিকারী-ভেদ নেই। কিন্তু মানুষে মানুষে ঢের প্রভেদ আছে। সকলেই মরে, কিন্তু সকলেই আর প্রেমে পড়ে না। তাই ডাক্তারের কথা যেমন সর্বলোকগ্রাহ্য, প্রেমিকের কথা তেমনি ডাক্তারি শাস্ত্রে আগ্রাহ্য।" এই বক্তৃতার পর অনিলচন্দ্র আর রা কাড়লেন না।

(৬)

এর পর শ্রীভূষণ বললেন যে, তোমার প্রেমে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবান্তর ঘটেছিল তার বর্ণনা কর তো তা হলেই বোঝা যাবে ব্যাপারখানা কি ঘটেছিল।

নীল-লোহিত বললেন, "তুমি যে-সব বিলেতি বচন শোনালে, তার সঙ্গে আমার কথা মিলবে না। ইংরেজরা প্রেমে পড়লে তাদের মনের অবস্থা কি হয় জানি নে, তবে তারা যা লেখে তার সঙ্গে সত্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। আমার বিশ্বাস তারা প্রেম করে অনিলের শাস্ত্র-মতে, আর তা ব্যক্ত করে শ্রীভূষণেব ভাষায়। আমার যা হয়েছিল, তা অবশ্য desire of the moth for the star নয়। কারণ আমিও morh নই, সেও ছিল না। এক কথায়, প্রেমে পড়বামাত্র আমি যেন প্রথম জেগে উঠলুম, তার আগে ঘুমিয়ে ছিলুম। সেইদিন প্রথম আবিষ্কার করলুম যে, তেলাকুচোর রঙ লাল। হঠাৎ দেখি পৃথিবী প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠল, আকাশের রোদ চন্দ্রালোক হয়ে এল, চারিদিকের যত আলো সব হেসে উঠল, আর ঐ মেয়েটির চোখে আশ্রয় নিলে। কি সুন্দর সে আলো. আর তার অন্তরে কি গভীর অর্থ! তার চোখ দুটি প্রথমে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তারপর আমার উপর যেই পড়া, সেই চঞ্চল চোখ একেবারে স্থির হয়ে গেল, আর তার পল্লব কিঞ্চিৎ নত হয়ে এল। আমি বুঝলুম

যে সেও আমার প্রেমে পড়েছে। যেমন এক হাতে তালি বাজে না, তেমনি এক পক্ষেও প্রেম হয় না। আমি ভালোবাসলুম, কিন্তু সে বাসলে না— এমন যদি হয় তা হলে সে একটা হা-হুতাশের ব্যাপার হয়ে ওঠে, তাকেই ব্যাধি বলা যেতে পারে। আমাদের উভয়ের মনে যা জন্মাল সে হচ্ছে যথার্থ প্রেম— তাই উভয়ের মন একসঙ্গে নীরব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

(৭)

এ প্রেমের কোনো ইতিহাস নেই ; কেননা সেইদিন আর পরের দিন ছাড়া তার সঙ্গে আমার জীবনে আর কখনো দেখা হয়নি। কেন, তা পরে বলছি। তবে তার স্মৃতি আমার জীবনের বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে।

আমি এমন কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনো প্রেমে পড়িনি যার মুখে আমি তার চেহারা দেখতে পাইনি। বর্ণ তার ছিল উজ্জ্বল শ্যাম, গড়ন ছিপছিপে, নাক তোলা, আর চোখ সাত রাজার ধন কালোমানিকের মতো। আমি চিরজীবন তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর যখনই তার ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তখনই আবার প্রেমে পড়েছি। এই কারণেই আমি বলেছি যে, আমার সব নতুন প্রেম আমার সেই আদিপ্রেমের reprint মাত্র। যখনই কোনো নতুন প্রেমে পড়েছি তখনই পৃথিবী একেবারে উল্টে-পাল্টে গিয়েছে, ডুমুরের ফুল ফুটেছে, অমাবস্যার জ্যোৎস্না ফুটেছে, আকাশকুসুমের গন্ধ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমার মনে হয়েছে যেন আমি হঠাৎ জেগে উঠেছি, আর তার আগে ঘুমিয়ে ছিলুম। এই আদিপ্রেমের কৃপায় কোনো ইংরেজ কিংবা জাপানি অথবা ইহুদি মেয়ের প্রেমে কখনো পড়িনি। কারণ ইংরেজের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম নয়, চুনের মতো সাদা ; জাপানির নাক তোলা নয়, চাপা ; আর ইহুদিদের নাক হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা। এখন আমাদের কি কারণে বিচ্ছেদ ঘটল, তা শোনো।

(৮)

তারপর নীল-লোহিত বললেন যে, পরের দিন বালিকা-বিদ্যালয় থেকে তাঁর ইংরেজি স্কুলে বদলি হবার কথা ছিল ; কিন্তু তিনি বালিকা-বিদ্যালয়রূপ স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট হতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তাঁর মা নিলেন তাঁর পক্ষ, আর বিপক্ষ হলেন তাঁর বাবা। এ দুজনের মধ্যে অনেক বকাবকি হল ; শেষটায় নীল-লোহিতের জেদই বজায় রইল। তার বাবা, 'এটার ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়ে জন্মানো উচিত ছিল'— এই কথা বলে মার সঙ্গে তর্কে ক্ষান্ত দিলেন। তর্কে বাবা কোথায় মার কাছে পেরে উঠবেন?

পরদিন সকালবেলায় নীল-লোহিত যথাসময় স্কুল গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে দেখেন যে, মেয়েটি আগেই এসে যথাস্থানে একটি মাদুরের উপরে যোগাসনে বসে আছে, আর

তার কালো কালো চোখ দুটি কি যেন খুঁজছে ; তাঁকে দেখবামাত্রই সে চোখ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মতো হয়ে গেল।

নীল-লোহিত অমনি তাঁর স্লেট নিয়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে ক খ লিখতে বসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে মেয়েটির যা-কিছু কথাবার্তা হল সে শুধু চোখে চোখে, মুখের ভাষায় নয়। চোখের আলাপ যখন খুব জমে উঠেছে তখন হঠাৎ একটা বন্দুকের বেজায় আওয়াজ হল। অমনি ছাত্রীরা সব চমকে উঠে ভয়ে হাঁউমাউ করতে আরম্ভ করলে, আর সেই মেয়েটি নীল-লোহিতের দিকে সকাতরে চেয়ে রইল। সে চাহনির ভাবটা এই যে, গুলির হাত থেকে আমাকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারে তো সে তুমি। এই সময়ে নীল-লোহিতের চোখে পড়ল যে, দরমার বেড়া ফুটো করে একটা গোলাপী রঙের গুলি সোজা মেয়েটির দিকে ছুটে আসছে।

নীল-লোহিত আর তিলমাত্র দ্বিধা না করে বাঁ হাত দিয়ে স্লেটখানি মেয়েটির মুখের সুমুখে ধরলেন আর গুলিটি স্লেট ভেদ করে বেরবামাত্র ডান হাত দিয়ে সেটি চেপে ধরলেন। তখন সে গুলির তেজ কমে এসেছে, তাই সেটি নীল-লোহিতের মুঠোর মধ্যে রয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বেড়ায় আগুন ধরে গিয়েছে, মেয়েরা সব ডুকরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে, আর বাইরে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। এমন সময়ে নীল-লোহিতের বাবা একটা দোনালা বন্দুক হাতে করে স্কুলে এসে উপস্থিত। তিনি এসেই প্রথমে আগুন নেবাবার ব্যবস্থা করলেন, এবং পরে ব্যাপার কি হয়েছিল তা গৃহস্বামীকে বললেন। নীল-লোহিতের বাবার অভ্যাস ছিল বাড়ির সুমুখের পুকুরে একটা ছিপি-আঁটা বোতল ভাসিয়ে দিয়ে সেই বোতলকে গুলি মারা— চোখের নিশানা ও হাতের তাক ঠিক রাখবার জন্য। সেদিন গুলিটা বোতালের গা থেকে ঠিকরে বেঁকে বিপথে চলে এসেছে। অবশ্য পথিমধ্যে তার তেজ অনেকটা মরে গিয়েছিল, তবুও নীল-লোহিত যদি সেটিকে না আটকাতো তা হলে গুলিটি অন্তত ঐ মেয়েটির কপালে চিরদিনের জন্য একটি আধুলি-প্রমাণ হোমের ফোঁটা পরিয়ে যেত।

তারপর তিনি নীল-লোহিতের পিঠ চাপড়ে বললেন যে 'তুমি ছেলে বটে, বাপকা বেটা।'

মেয়েটি অমনি তার কচি হাত দুখানি জোড় করে নীল-লোহিতকে ভক্তিভরে প্রণাম করলে। এরপর তার বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

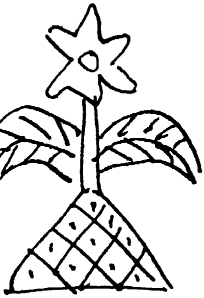
এই ঘটনার পরে গৃহস্বামী তাঁর আটচালায় বালিকা-বিদ্যালয় বসবার অনুমতি আর দিলেন না। ফলে সেইদিনই বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা সকলে নীল-লোহিতের আদিপ্রেমের কাহিনী শুনে না হোক, আদিবীরত্বের কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেলুম।

এখন আপনারা বিচার করুন, এ গল্পের কোনো মানে-মোদ্দা আছে কি না।

অঞ্জনা দেবী

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



বড়দিনের ছুটিতে আসাম গিয়াছিলাম। একা নয়— দু'জন বন্ধু ছিলেন সাথী। অসিত আর বিজয়।

শিকারে তাঁদের গভীর অনুরাগ। আমার ও-সখ নাই। আমি নিরীহ লেখক, গল্প লিখি। আমাকে তাঁরা ধরিলেন,— একটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স.....সঙ্গে চলো।

পাঁজি দেখিয়া বাহির হই নাই! যাত্রা নিষ্ফল! কোথায় বাঘ-ভাল্লুক! পাখীর ঝাঁক দেখিয়াই শিকারের সখ মিটিল!

বনের পথে ফিরিতেছিলাম। রাণীপোতার ছোট ইন্‌স্‌পেকশন-বাঙলোর এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। সাহেবী পোষাক-পরা।

পরিচয় হইল। শচীন্দ্র সান্যাল! এখানকার ডেপুটি। বন-বাদাড় লইয়া আছেন। রাণীপোতায় আসিয়াছিলেন একটা তদারকীর কাজে। থাকেন, রাণীপোতা হইতে চার ক্রোশ দূরে শালবনে।

সান্যাল সাহেব বলিলেন,— যখন দেখা হলো, ছাড়বো না। আমার ওখানে দু'চার দিন থেকে তার পরে ফিরবেন।

আপত্তির কারণ ছিল না।

হাকিমের সঙ্গে হাতীর পিঠে সওয়ার হইয়া শালবনে আসিলাম।

উঁচু টিলার উপর পরিচ্ছন্ন বাঙলো-বাড়ী। চারিদিকে বন— পাখীর কল-কাকলীতে ভরিয়া আছে। ছোট-খাট দু-একটা পাহাড়ে-নীদ। মনে হইল, এমন বনে এমন বাঙলো-বাড়ী পাইলে বনবাসে কিসের দুঃখ।

হাতী হইতে নামিলাম।

সান্যাল সাহেব বলিলেন,— আমার স্ত্রী খুব খুশী হবেন আপনাদের দেখে! একা এই বনে বাস করছেন.... কথা ক'বার লোক বলতে শুধু আমি!

আমি বলিলাম,— ছেলেমেয়ে?

সান্যাল সাহেব বলিলেন— হয়নি।

অসিত বলিল— তাঁকে একা রেখে বেরিয়েছিলেন?

সান্যাল সাহেব বলিলেন— চাকরি-রক্ষা করতে।

আমি বলিলাম,—যদি তাঁর অসুখ-বিসুখ হতো?

বিজয় বলিল— চোর-ডাকাতের ভয়ও আছে!

মৃদু হাস্যে সান্যাল সাহেব বলিলেন— অসুখ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা যে হয় না, তা নয়।

আমার স্ত্রী বলেন, অসুখ হলে যদি সারবার হয়, সে-অসুখ সারবেই। আর যাবার অসুখ হলে কারো সাধ্য নেই, সারাবে! কুইন ভিক্টোরিয়া, জর্জ দি ফিক্‌থ্— এঁদোরো কেউ সারাতে পারেনি!

আমি কহিলাম— কথাটা সত্য।

সান্যাল সাহেব বলিলেন— বনে নিরুপায়ে বাস করি, কাজেই সনাতন-কথাগুলোর উপর আস্থা না রাখলে চলে না! তা ছাড়া এখানে হাসপাতাল আছে, ডাক্তার আছে। আর সেপাই পাহারওয়ালা আছে বাড়ী চৌকি দিতে.....

অসিত বলিল— হুঁ..

একটা ভৃত্য অসিল। আসামী ভৃত্য।

সান্যাল সাহেব বলিলেন—মেম-সাব?

সে বলিল, মেমসাহেব বেড়াইতে গিয়াছেন।

সান্যাল সাহেব আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। চায়ের ফরমাশ করিলেন ; তার পর বলিলেন,— আমি দেখি, কি খাবার আছে। এখানে মাছ-মাংস মেলে, ফল-মূল মেলে, রুটি মেলে। কমলা লেবু অজস্র! আর কমলা মধু আছে। চায়ে চিনির বদলে মধু দিতে বলি!

চায়ের আসর।

সান্যাল সাহেব বলিলেন,— শালবন যা জায়গা, সত্যি মেয়েদের পক্ষে এখানে বাস করা শক্ত। এখানে আমরা আছি আজ তিন বছর। উনি আবার শহরে ছিলেন বরাবর.... লেখাপড়া জানেন...গান-বাজনা জানেন। ওঁর পক্ষে এ-বনে বাস করা....তবে, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী বলেন— শহরের মানুষের সঙ্গে মিশতে, কথা কইতে ভুলে গেছি.... দেখলে গা কেমন যেন ছম্-ছম্ করে!

আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিজয় বলিল— ইনি ঔপন্যাসিক..... দেখুন, গল্পে-স্বপ্নে যদি তাঁকে একটু আরাম দিতে পারেন!

কহিলাম,— বিবাহ হয়েছে ক'বছর?

— প্রায় সাত বছর হলো। একটু বেশি বয়স? বিয়ে করবো না ভেবেছিলাম। চাকরি নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরছি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা। আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে এসেছিলেন। সেখানে আমার খুব অসুখ হয়। ওঁর সেবা....জীবনে ভুলবো না। তার পরেই আর কি....

হাসিয়া আমি কহিলাম,— আমরা তা হলে যে-সব রোমান্স লিখি, সেগুলো নিছক ভুয়ো নয়! জগতে সত্যিকার রোমান্স ঘটে!

সান্যাল কহিলেন— রোমান্স বলতে পারেন! চাকরির আর সাত-আট বছর বাকী। তারপব

পেন্সন নেবো। ওঁকে বলেছি, পেন্সন নিয়ে কলকাতায় গিয়ে থাকবো। আমার জন্য উনি যেমন বনবাস-দুঃখ সহ্য করছেন, তেমনি এ-বনবাসের খেশারৎ হবে তখন।... কিন্তু উনি বলেন....

কথা শেষ হইল না। বাহিরে নারী-মূর্ত্তি!

বুঝিলাম, মিসেস্ সান্যাল।

তরুণী নন্.....তবু তারুণ্যের আভা মুখে জ্বলজ্বল্ করিতেছে! নিটোল দেহ। মনে হয়, হাজার নারীর মধ্যে দাঁড়াইলে ইহার পানে চাহিতেই হইবে! চেহারায় এমন দীপ্তি!

সান্যাল সাহেব বলিলেন,— এসো শান্তি। বাড়ীতে অতিথি-সমাগম। এঁরা কলকাতার লোক, বন থেকে ধরে এনেছি....

শান্তি দেবী আসিলেন, মৃদু্য হাস্যে কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন,—নমস্কার!

তারপর আলাপ-পরিচয়। অসিত বড় চাকুরে....বিজয় ডাক্তার....শিকারে দুজনের প্রচণ্ড অনুরাগ। আমি গল্প উপন্যাস লিখি। আসিয়াছি বন্ধুদের সঙ্গে আসামের জঙ্গলে এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে!

শান্তি দেবী বলিলেন— "আন্‌কোরা" উপন্যাস আপনার লেখা, না?

বলিলাম,—হ্যাঁ।

শান্তি দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,— এ-বনে রাজ্যের মাসিক-পত্র আনিয়ে, গল্প নভেল পড়েই দিন কাটাই। দায়ে পড়ে বাঙলা-সাহিত্যের চর্চা করি।

সান্যাল বলিলেন,— এবং সঙ্গীত-চর্চাও করেন। সে অবশ্য আমার বিরাম-সুখের জন্য ...নিজের সখে নয়।

অসিত বলিল— আমরাও গান শুনে আনন্দ পাই।

হাসিয়া সান্যাল বলিলেন,—শুনবেন। অতিথিদের সেবার জন্য উনি গাইবেন বৈ কি, নিশ্চয় গাইবেন।

সন্ধ্যার পর।

সান্যাল সাহেবের হেডক্লার্ক আসিয়াছিলেন, কেদার বড়ুয়া। দু'জনে বারান্দায় কি কথাবার্ত্তা হইল....তারপর সান্যাল ঘরে আসিলেন, বলিলেন,— শিকার করতে চান? আমার হেডক্লার্ক কেদার বড়ুয়া এসেছে....মস্ত শিকারী। ওর সঙ্গে....

অসিত আর বিজয় যেন লাফাইয়া উঠিল।

সান্যাল বলিলেন,—চলুন, তা হলে আপনাদের শিকারের ব্যবস্থা করে দি।

তিন জনে বাহিরে ছুটিলেন কেদার বড়ুয়ার কাছে।

ঘরে শান্তি দেবী এবং আমি।

শান্তি দেবী বলিলেন.— আপনার গল্প আমার খুব ভালো লাগে। ফী-মাসেই তো আপনার

গল্প ছাপা হয় দেখি 'প্রণতি" কাগজে। প্রণতি এলে আমি সব ছেড়ে আপনার লেখা আগে পড়ি।

আনন্দে-গর্বে আমি কহিলাম,— আমার সৌভাগ্য:

বলিলেন,— মানুষের মনের এত কথা যে লেখেন, সে-কথার সত্য-কিছু আছে? না, নিছক কল্পনা?

বলিলাম,— দেখা-জানা কথার সঙ্গে কল্পনা মেশাই। নিছক কল্পনা নিয়ে আমি কারবার করি না!

শান্তি দেবী জবাব দিলেন না....দুই চোখের অবিচল দৃষ্টি আমার মুখে নিবদ্ধ করিলেন।

আমি তাঁর পানেই চাহিয়াছিলাম....শান্তি দেবীর দু'চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন ভয় ও সংশয়ের মলিন ছায়া! ও-দৃষ্টি বড় করুণ! যেন ভীতি-বিহ্বলা হরিণীর দৃষ্টি!

হঠাৎ মনে হইল, এ দৃষ্টি'....এমনি প্রতিমার মতো মূর্ত্তি....এই রঙ....আগুনের হল্‌কা নাই, শুধু আলোর দীপ্তি!

অনেকক্ষণ পবে শান্তি দেবী বলিলেন,—গেল-মাসে আপনাব একটা গল্প পড়েছি...'নারীর ইতিহাস"....

কহিলাম,— প্রণতিতে বেরিয়েছিল।

— হ্যাঁ। আচ্ছা, ও-গল্পের নায়িকা হিরণকে আপনি দেখিয়েছেন....বেশী-বয়সে নায়ক অরবিন্দকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। তারপর যখন জানতে পারলে, অরবিন্দু আগে শৈলকে বিয়ে করে তাকে ত্যাগ করে এসেছিল, তখন শৈলকে আনিয়ে স্বামীর হাতে সঁপে দিয়ে তিন জনে মিলে ঘর-সংসার করতে লাগলো।....মেয়ে-জাতটাকে এমন অপদার্থ করে গড়তে আপনার বাধলো না?

আমি কহিলাম,— স্বামী ছাড়া মেয়েদের আর গতি কি, বলুন?

শান্তি দেবী বলিলেন,— মেয়েদের নিজেদের আত্মসম্মানবোধ থাকবে না? জানেন তো বঙ্কিমবাবু লিখে গেছেন ভ্রমরের মুখ দিয়ে...স্বামী যত দিন ভক্তির যোগ্য, তত দিন স্ত্রী তাকে ভক্তি কববে!

তারপর ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন,— বাঙলাদেশের মেয়েকে কবে আপনারা মানুয করে গড়বেন জ্ঞানবাবু? তাদের মন, তাদের সুখ-দুঃখ— সেগুলোর অস্তিত্ব.....চিরদিন তাদের কাঠের পুতুল করে রাখবেন?

কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিলাম, দেওয়া হইল না...সান্যাল-সাহেব আসিলেন।

বলিলেন,— ওঁরা মশগুল! কেদারের সঙ্গে কাল সকালে সব বাঘ মারতে বেরুবেন।...আপনি যাবেন?

আমি বলিলন,— না....যখন আশ্রয় পেয়েছি, তখন আর বনে বাঘের মুখে যাবো না।

এ্যাদ্দিন তো ঘুরলুম বাঘ দেখবো বলে।....কিন্তু বাঘ কি, একটা বেড়াল পর্য্যন্ত নজরে পড়লো না! শুধু নিরীহ পাখী মারা। একে শিকার বলে না....পাখী-মারাকে কশাইগিরি বলে!

সান্যাল বলিলেন,— এ দেশের লোক বিষ-মাখা তীর ছুড়ে জন্তু-জানোয়ার মারে। আমার মনে হয়, বাজে কথা! ওরা বলে, তীরে শুধু বিষ-মাখানো নয়..হরিণ-ছাগলের গা-ফুঁড়ে রক্তে বিষ ইনজেক্‌ট করে দেয়....সে হরিণ কিম্বা ছাগলকে ধরলে বাঘকে মরতেই হবে।

আমি বলিলাম,— এমন বিষ আছে?

শান্তি দেবীর পানে চাহিলাম, কহিলাম,— আপনি বিশ্বাস করেন মিসেস সান্যাল?

শান্তি দেবীর কেমন যেন উন্মনা ভাব!

বলিলেন,—বিষের কথা বললেন?

বলিলাম,— হ্যাঁ! এমন বিষ আছে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তি দেবী বলিলেন,— না, না, বিষ-টিষ শুনলে আমার বুক কেমন কেঁপে ওঠে...

সান্যাল সাহেব বলিলেন,— তা ছাড়া জানেন জ্ঞানবাবু, এই বুনো সমাজ এমন যে, ঘরে মেয়ে জন্মালে ওরা সে মেয়েকে সদ্য তখনি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। ডাক্তারী-বিদ্যায় সে-বিষের সন্ধান মেলে না!.... এই সে-দিন একটা বুনোর ঘরে এমন কাণ্ড হয়েছিল। মাকে আমি সাজা দিলুম.... এক বছরের জেল।

বলিলাম,— মা মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল :

সান্যাল বলিলেন,— হ্যাঁ। ওরা বলে, মেয়ে-জাতটা অসার, অপদার্থ। তাকে মানুষ করতে খরচ.... অথচ মা-বাপকে আয় দেবে না!

আমি বলিলাম,— এমন খুনীকে এক বছরের জেল!

সান্যাল বলিলেন,— এদের পক্ষে এক-বছর কয়েদে থাকা অসহ্য ব্যাপার! তা ছাড়া এ হলো নন্‌-রেগুলেটেড্ জায়গা— এখানে একটু কাজীর বিচার-প্রথা অবলম্বন করতে হয়। মেয়ে-মানুষকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলোনো...shocking! মেয়ে-জাত!

রাত্রে চোখে ঘুম আসিতেছিল না! মনের উপর শান্তি দেবী এমন আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন! কেবলি মনে হইতেছিল.....দেখিয়াছি.....কোথায় যেন এই শান্তি দেবীকে! ও মুখ নূতন নয়...অপরিচিত নয়!...

কিন্তু কোথায়?

সহসা মনে পড়িল...

পৃথিবী যেন দুলিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে ক'বছর আগেকার ঘটনাগুলো বায়োস্কোপের ছবির মতো চোখের সামনে..

কি খেয়াল হইল...উঠিয়া পেন আর কাগজের প্যাড্ লইয়া লিখিতে বসিলাম।

লিখিলাম—

"......রূপসী নারী...বিদুষী...

আইনের পাকে আসামী হইয়া তাকে আদালতে দাঁড়াইতে হইল।

অপরাধ....খুন! স্বামিহত্যা।

দিনের পর দিন অভাগিনী মলিন-মুখে বসিয়া আছে আসামীর কাঠগড়ায়। উকিল সওয়াল-জবাব করিতেছে, সাক্ষীর পর সাক্ষীর এজাহার চলিয়াছে। তারপর একদিন জজ আর জুরি বলিল— আসামী নির্দোষ! খালাশ!

আইনের চোখে নির্দোষ হইলে কি হইবে, সমাজে যে দুর্নাম, যে কলঙ্ক রটিল, সমাজে আর কি তার স্থান হয়?

কিন্তু কোথায় যায়? যদি বাঁচিতে চায়? কতই বা বয়স!

এমন সুন্দর পৃথিবী...এই আলো-বাতাস...এমন অজস্র ফুল ফল... উপরে নীল আকাশ...বুকে স্নেহ-মায়া-প্রীতি-ভালাবাসা...মনে কত সাধ, কত আশা!

সমাজ যদি ঠাঁই দেয়, বুক-ভরা সাধ-আশা দিয়া হয় তো আবার সুখের সংসার গড়িতে পারে!

আজ দেখিলাম সেই নারীকে!

পাঁচ বৎসর পূর্বে এই নারীকে দেখিয়াছি খুনের দায়ে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়! এ নারীর কাহিনী লইয়া কাগজে-কাগজে তখন কত লেখা-লেখি....কত মন্তব্য...কদর্য্য নিষ্ঠুর কত ইঙ্গিত!

আজো যেন স্পষ্ট দেখিতেছি, পরণে সেই লাল পাড় শাড়ী....গায়ে মোটা চাদর....মলিন...মুখী কিশোরী!

অঞ্জনা দেবীর মকর্দমার কথা বাঙলাদেশ আজো ভোলে নাই, নিশ্চয়! ধনী-ঘরের বধূ...স্বামী ব্রজনাথ চৌধুরীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া আদালতে তাঁর বিচার!

আদালতে কত মামলা নিত্য হয়......কিন্তু এমন? ভদ্র বাঙালী-ঘরের বধূ স্বামীকে হত্যা করিয়াছে!

আদালতে কি ভিড়! সে ভিড়ে তাঁর সেই অবিচল প্রশান্ত মূর্ত্তি! যেন ছায়ার দেহ লইয়া আদালতে বসিয়া আছেন! যাকে লইয়া আদালতে এত কলরব-কোলাহল—তার সঙ্গে অঞ্জনা দেবীর যেন কোনো সম্পর্ক নাই! ফাঁসি জেল খালাশ....কোনো-কিছুতেই আগ্রহ নাই

ব্রজনাথ চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যু....তাঁর দেহ-মধ্যে পাওয়া গিয়াছে বিষ! সকলের সন্দেহ পত্নী অঞ্জনা দেবীর উপর!

সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিয়া বলিয়া গেল অঞ্জনা দেবীর উপর স্বামী ব্রজনাথের পীড়ন-অপমানের কাহিনী! অঞ্জনা দেবী না কি কার কাছে বলিয়াছিলেন, অপমানের এমন শোধ নিব, তার জন্য যদি ফাঁস-কাঠে ঝুলিতে হয়, ঝুলিব।

এ-কথার পরের দিন হঠাৎ ব্রজনাথের অসুখ। ....ডাক্তার? অঞ্জনা দেবী বলিলেন,—

না! ডাক্তার কি করিবে? তাই ডাক্তার ডাকা হইল না। তারপর রাত্রে ব্রজনাথের জীবন-দীপ নিবিয়া গেল!

মাতাল দুশ্চরিত্র ব্রজনাথ মরিল। ব্রজনাথ বাঁচিয়া থাকিয়া স্ত্রীকে যখন পীড়ন করিত, তখন এ-পরিবারের জন্য কাহারো মাথা-ব্যথা ধরে নাই! আজ ব্রজনাথ মরিবামাত্র এ-পরিবারের জন্য সকলে একেবারে প্রমত্ত হইয়া উঠিল!

লোকজন কলরব তুলিল। পুলিশ আসিল ; এবং অঞ্জনা দেবীর সেই কথার জের তুলিয়া পুলিশ তাঁকেই দিল চালান। ব্রজনাথের পাকস্থলীর মধ্যে বিষ পাওয়া গেছে! এ-বিষ কে আর দিবে? ঘরে আছে স্ত্রী— প্রহারে পীড়নে জর্জ্জরিতা স্ত্রী! সে বলিয়াছিল, এমন শোধ নিব, তার জন্য যদি ফাঁসি-কাঠে ঝুলিতে হয়....

শিহরিয়া সকলে বলিল, যে-স্ত্রী এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে..... সে-স্ত্রীর পক্ষে স্বামী-হত্যা বিচিত্র নয়!

তারপর কাগজে-কাগজে এ খুনের মকর্দমা লইয়া কি কলরব! আতঙ্কে শিহরিয়া কোনো কাগজ লিখিল—গেল, এবার হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইল! স্বামী না হয় প্রহার করে,— স্বামী ইহলোকের দেবতা....জীবন-দেবতা....সে-দেবতা...সে-দেবতার প্রহার পুষ্পাঞ্জলির মতো গায়ে লইতে পারো না...? স্ত্রী হইয়া স্বামীর প্রাণ লইবে এমন করিয়া! প্রাণ কাহারো চিরদিনের ইজারা-করা নয়! ক্ষণিক তার মেয়াদ! সে প্রাণ রক্ষা করিতে স্বামীকে হত্যা! এ-প্রাণ লইয়া এখন কি করিবে মা-লক্ষ্মী? যার স্বামী গেল, তার তো ইহ-জন্মটাই গেল!

কোনো কাগজ লিখিল— এই তো চাই! কে বলে মা, তুমি অবলা! পীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক দিন জাগিয়াছিলেন মহিষাসুর-দলনী। যে-স্বামী দুশ্চরিত্র মাতাল, অত্যাচারে যে-স্বামী তোমার দেহ-মন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে, সে-স্বামী সাক্ষাৎ মহিষাসুর! তাকে নিধন করিয়া নারীর শক্তি, নারীর মহিমা প্রচার করিয়া জলদ-মন্দ্র স্বরে বলো—মাভৈঃ! এই তো চাই! এবার আশা হইয়াছে, ভারত-ললনার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে!

কিন্তু মামলায় গলদ বাহির হইল। অনেক গলদ! এ বিষ কে আনিয়া দেছে? ঘরের কোণে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া যে-বধূ একান্তে বসিয়া শুধু লাঞ্ছনা-পীড়ন সহিয়াছে, বাজারে সে গিয়া বিষ আনিয়াছে— প্রমাণ মিলিল না! লোকজন আনিয়া দিয়াছে বলিয়া কাহারো উপরে এতটুকু সন্দেহ নাই! এমন দোকানীর সন্ধান মিলিল না....যে বিষ দিয়াছে! জুরির দল বলিল— এ বিষ বাহির হইতে পেটে পড়িয়াছে! যে-মাতাল পথে-ঘাটে মদ খাইয়া বেড়ায়, তাকে বিষ দিতে বাহিরে লোকের অভাব হয় না।

কাজেই মামলা ফাঁসিয়া গেল। অঞ্জনা দেবী খালাশ!

খালাশ পাইয়া তিনি গৃহে গেলেন না....মা-বাপের কাছে ফিরিলেন না। দু-চার জন

বান্ধবী ছিল, তারা বলিল— আমাদের কাছে এসো। অঞ্জনা দেবী বলিলেন, যে-কলঙ্ক রটিয়াছে, লোকালয়ে বাস করিতে পারিব না!

তারপর....

কোথায় গেলেন অঞ্জনা দেবী? অঞ্জনা দেবীর মকর্দমার উত্তেজনা থামিবার সঙ্গে সঙ্গে কালের তরঙ্গে কোথায় তিনি ভাসিয়া গেলেন, কেহ সে-সংবাদ রাখিল না! সকলে তাঁকে ভুলিয়া গেল।

কিন্তু আমি ভুলি নাই! উপন্যাসের প্লট খুঁজিতে বসিয়া মন তাঁকে খুঁজিত! কোথায় গেলেন? আশ্চর্য্য! তাঁর মামলার বিবরণ লইয়া মানুষ এমন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল....তার পর এখন কোথায় তাদের সে কৌতূহল?...কাগজে-কাগজে নিত্য সেই কত রচনা, ...ট্রামের ধারে-ধারে তাঁর নামে ছড়া ও গল্পের রকমারী বই...আসরে-বৈঠকে লোকের মুখে তখন আর অন্য কথা ছিল না... শুধু অঞ্জনা দেবী! তার পর?

আজ কত কাল পরে এই নির্জন বন-তলে প্রতিমার মতো সেই মূর্ত্তি....সুখের সংসার.... স্নেহে প্রেমে অখণ্ড নিশ্চিন্ত নির্ভর....

সেই অঞ্জনা দেবীকে সান্যাল সাহেব কোথায় পাইলেন? সান্যাল সাহেব জানেন এক দিন কি বর্বর নিষ্ঠুর রহস্য কৌতুক....কি তীব্র অভিশাপ এই অঞ্জনা দেবীকে ঘিরিয়া দিকে-দিকে উৎসারিত হইয়াছিল?

অঞ্জনা দেবী আজ নাম বদলাইয়াছেন! তিনি আজ অঞ্জনা দেবী নন...শান্তি দেবী! সব অশান্তি-বিরোধেব শেষে শান্তি চাহিয়া নাম লইযাছেন শান্তি দেবী!

এ শান্তি সত্যই পাইয়াছেন?..."

এই পর্যন্ত লিখিয়াছি, তার পর চোখে দারুণ ঘুমের ঘোর....

লেখা এইখানেই শেষ....

পরের দিন সকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম....একা। কারো সঙ্গে, কারো কোলাহল ভালো লাগিতেছিল না...তাই একা বাহির হইয়াছিলাম। মনের উপর অঞ্জনা দেবী সারাক্ষণ বিচরণ করিতেছেন! কখনো সেই পুরানো অঞ্জনা দেবীর মূর্ত্তিতে....আদালতে বসিয়া মলিনমুখী অশ্রুময়ী অঞ্জনা দেবী! পরক্ষণে এই শান্তি দেবী...স্নিগ্ধ-হাস্যময়ী....স্বামীর প্রেমে দুঃখ ভুলিয়া এ-গৃহের গৃহলক্ষ্মী!

ফিরিয়া আসিলাম বেলা তখন দশটা। বন্ধুরা বাহিরে গিয়াছে.....সান্যাল সাহেব বাড়ী নাই। আসিয়া বারান্দার বসিযা আছি...মিষ্ট গন্ধে বাতাস ভরিয়া গেল!

চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। দেখি, স্নান-শেষে কৃষ্ণ কেশদাম এলায়িত করিয়া মাথার উপর লাল-পাড় শাড়ীর একটু আবরণ....শান্তি দেবী। বলিলেন,— বেড়ানো হলো?

কহিলাম,—হ্যাঁ.....

চারিদিকে চাহিলেন। আরো কাছে আসিলেন। বলিলেন— রাত্রে গল্প লিখছিলেন?

বুকখানা ধড়াশ্ করিয়া উঠিল।

— ক্ষমা করবেন...অনুমতি না নিয়ে সে গল্প আমি পড়েছি।

মাথা তুলিতে পারিলাম না।

বলিলেন— ভেবেছিলুম, অন্য-কিছু গল্প। তা নয় বাস্তব!

আমি কোনো কথা কহিলাম না। তাঁর পানে চাহিলাম.....দু চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি লইয়া!

শান্তি দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন— সব কথা নিয়েই গল্প লেখবার অধিকার আছে...সকলের। আপনার এ গল্প কত লোকে পড়বে....নতুন রকমের গল্প....বাঙালী ঘরের বৌ স্বামীকে মেরেছে বলে আদালতে দাঁড়িয়েছে আসামী হয়ে! লোকের খুব চমক লাগবে....

মনের উপর যেন চাবুক পড়িল!

শান্তি দেবী বলিলেন— মানুষকে শুধু গল্পের খোরাক জোগাবার উপাদান বলেই আপনারা জানেন...না? তাদের মনে সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার কি অফুরন্ত উৎস আছে, সে-খবর রাখেন না? যে-সব মানুষের কথা লেখেন....পুতলের মতো যে-সব মানুষকে আপনাদের গল্পে-নাটকে ইচ্ছামত দেবতা সাজান, দানব গড়ে তোলেন, খেয়াল-ভরে নাচান-খেলান...কখনো ভেবে দেখেছেন, তারা সত্যিকারের পুতুল নয়? তারা মানুষ....শত আঘাতেও তাদের মনকে তারা চূর্ণ হতে দেয় না....সারিয়ে তুলতে চায়? তারা বাঁচতে চায়?

আমি কহিলাম—বলেছি তো, সত্যিকারের মানুষ যা দেখি, তাদের উপর একটু কল্পনা মেশাই।

— মস্ত কীর্ত্তি রাখবেন, না? এই অঞ্জনা.....একে যে ভাবে দেখেছেন...বাইরে থেকে লোকজনের কথায় এর যে পরিচয় পেয়েছিলেন, সেইটুকুই এর সব পরিচয়? কি অপমান-লাঞ্ছনায় তার দিন কেটেছে, রাত্রি কেটেছে....জগতে বাস করেও সে কতখানি জগৎ-ছাড়া ছিল....সে পরিচয় কখনো নিয়েছেন? জানবার চেষ্টা করেছেন, শত নিগ্রহ-পীড়নেও তার মন ভেঙ্গে-চুরে ঝরে যায়নি— সে বাঁচতে চেয়েছিল, সুখী হতে চেয়েছিল? তার বুকে ছিল অজস্র মায়া-মমতা. ...যে মায়া-মমতা দিয়ে সে চেয়েছিল একখানি সংসার গড়ে তুলতে? আজ যদি সকলকে সে অঞ্জনার সত্য পরিচয় আমি বলি.....

আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন ; তার পর বলিলেন,— মানুষ মানুষের কতটুকু খবর রাখে, জ্ঞানবাবু? মানুষের বিচার করতে বসে বাইরের বাজে কথার উপর নির্ভর করে আমরা কতখানি অবিচার করি.....সে-কথা ভেবে দেখেছেন কোনো দিন? মানুষকে সত্যি এ-ভাবে দেখবেন না। মেডিকেল-কলেজের ছেলেরা যে-ভাবে শব-দেহ উস্কে-ছিঁড়ে-কুটে এ্যানাটমি-বিদ্যা শেখে, তেমন করে কাটাছেঁড়ার সূত্র ধরে মানুষের মনকে বিশ্লেষণ করলে সে-মনের পরিচয় পাবেন না।

এ-কথা শুনিলাম। উত্তর দিতে পারিলাম না....

শান্তি দেবী হাসিলেন। মলিন মৃদু হাসি।

হাসিয়া আবার বলিলেন,—আপনার, এ গল্পে প্রাণ নেই, জ্ঞানবাবু। রাগ করবেন না—মানে, আমি এ-গল্পে প্রাণ দিতে পারি....সত্যকার প্রাণ! আসামীর ডকে বসে অঞ্জনা দেখতো, রাজ্যের লোক তার পানে তাকাচ্ছে-তাদের চোখে কত-রকমের দৃষ্টি......সে-দৃষ্টি তার গায়ে বিঁধতো তীরের মতো! তখন তার মনে কত কথা জাগতো...কত বেদনা! পুরাণে আমরা পড়েছি, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা! সে অগ্নি-পরীক্ষা কি, তা যদি বুঝতেন!

কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। লজ্জায় ক্ষোভে মন যেন চূর্ণ হইয়া যাইবে! কোনো মতে আমি বলিলাম— সে অঞ্জনা দেবীকে যদি ভুলে যাই? এ গল্প যদি আমি না লিখি?

শান্তি দেবী উদাস নেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন...কিছুক্ষণ। তারপর বলিলেন,— আপনার পাঠক-পাঠিকা যদি এ-গল্প না পড়ে, তাতে আপনার ক্ষতি হবে?...আপনি যদি বলেন, লোক শিক্ষা...যদি বলেন, প্রতারণায় আর-একজনকে ভুলিয়ে এই বালির ঘর তৈরী করা....এ কতখানি অন্যায়, কত-বড় পাপ? ...আমি বারণ করবো না জ্ঞানবাবু.....করা উচিত হবে না! আপনি যদি মনে করেন, এ গল্প লিখে আপনার পাঠক-সমাজকে আপনি চমক দেবেন, তাদের খুশী করবেন, তাদের উপদেশ দেবেন,— তাতে যদি আমি বা আমার স্বামী লজ্জা পান, তা হলেই কি আপনি কলম বন্ধ করবেন? আপনারা লেখক......পরের সুখ-দুঃখ নিয়ে যে-ভাবে আপনারা বিশ্লেষণ করতে বসেন, তাদের দোষ-দুর্বলতার বাইরের দিকটাই শুধু দেখেন....এ দোষ-দুর্বলতার পিছনে কি যাতনা, কতখানি নিরাশা, ক্ষোভ, বেদনা জেগে থাকে, সে-খবর আপনারা কখনো ন্যান্ না...আপনাদের পাঠক-পাঠিকারা তো ন্যান্ই না....

কথাটা বলিয়া শান্তি দেবী আবার নিশ্বাস ফেলিলেন, বড় নিশ্বাস। তার পর চুপ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন.....দু চোখে সেই উদাস দৃষ্টি!

আমি বলিলাম,— আমায় ক্ষমা করুন শান্তি দেবী....এ লেখা আমি ছাপতে দেবো না। যে-পর্যন্ত লিখেছি, ছিঁড়ে আপনার সামনেই পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছি!

শান্তি দেবী বলিলেন,— মেয়েদের কথা লিখতে বসে একটু মমতা-ভরে লিখবেন জ্ঞানবাবু। তারা বড় অসহায়, নিরুপায়.....কি অসহ্য যাতনা সয়ে তারা বাইরের জগতে অবিচল মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়ায়....মেয়ে-জন্ম না নিলে শুধু সাইকলোজি পড়ে তা বুঝতে পারবেন না। সে-দিনের সে লাঞ্ছনা মনে হলে আজো আমি শিউরে উঠি! ....কিন্তু জানেন, আজ আমি কি-সুখে সুখী! সে-লাঞ্ছনার কথা ভুলে গেছি...জীবনে সে যেন মস্ত দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম! ভালোবাসা কি বস্তু.....ভালোবাসায় মানুষের মন কি হয়....বিশ্বাস করুন, আজ আমি বুঝেছি! পুরাণে অহল্যা-পাষাণীর মানুষ হবার কথা আগে বুঝতে পারতুম না....বাল্মীকি-মুনি কি করে অহল্যার ব্যথা বুঝে তাকে আবার পাষাণ থেকে মানুষ করেছিলেন, আজ বুঝতে পেরেছি। হয়তো বোঝাতে পারবো না! শুধু এইটুকু বলতে পারি....সে দিনকার সেই লাঞ্ছিতা কালিমাখা

অঞ্জনা আজ আর সে-অঞ্জনা নেই! আপনাদের সভ্য সমাজে যে সুখ, যে সম্মানগৌরব সে পায়নি, আজ সভ্যতার আড়ালে বসে সে-সুখ, সে-সম্মান পেয়ে তার পুনর্জন্ম হয়েছে, সত্যি! যিনি তাকে এ সুখ, এ গৌরব দিয়েছেন, তিনি....অঞ্জনার স্বামী...অঞ্জনা তাঁকে ভগবানের উপরে আসন দিয়েছে! আপনার এ লেখা পড়ে আমার আতঙ্ক হচ্ছে! স্বামী যদি জানতে পারেন... নিজেকে কতখানি গোপন করে অঞ্জনা এসে ওঁর কাছে দাঁড়িয়েছে!

নিশ্বাসের বাষ্পে শান্তি দেবীর কথা রুদ্ধ হইয়া গেল! তিনি চুপ করিলেন। দুই চোখের পিছনে স্তম্ভিত অশ্রু.....

তাহা লক্ষ্য করিলাম। লেখার গর্ব নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল!

কহিলাম,— ক্ষমা করবেন। সান্যাল সাহেব সত্যি জানেন না আপনার জীবনে একদিন কি ঝড় বয়ে গেছে?

শান্তি দেবী আবার নিশ্বাস ফেলিলেন....দুই চোখ মুদ্রিত করিলেন। অনেকক্ষণ স্তিমিত নয়নে রহিলেন। তারপর শুধু বলিলেন,— না....

তারপর অন্য দিকে চাহিয়া মৃদু-কম্পিত স্বরে বলিলেন,— উনি এত ভালো, এমন সহজ বিশ্বাসে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন!....শুধু আশ্রয়? আমাকে রাণীর আসন বসিয়েছেন! উনি যদি সে-কথার বিন্দুবাষ্প কোনোদিন জানতে পারেন...উনি বাঁচবেন না। এত ভালোবাসেন...আমার কথায় শহর ছেড়ে চিরদিন এই সব বুনোর দেশে বনে-বনেই চাকরির ব্যবস্থা করে দিন কাটাচ্ছেন! লোকজনকে আমি ভয় করি। জানেন জ্ঞানবাবু, হাসি-তামাসার লোভে মানুষ এমন মত্ত হয় যে, সে হাসি-তামাসায় অপরের সর্বনাশ হতে পারে, সে কথা সে ভাবে না!.... আমার ভালো লাগে না বলে উনি সমাজ...বন্ধু-বান্ধব...সব ছেড়ে ভোলা-মহেশ্বরের মতো এই জঙ্গলে জঙ্গলে আজ সাত বছর বাস করছেন! কেন আমার শহর ভালো লাগে না, কেন আমি সমাজ চাই না, সে সম্বন্ধে কখনো আমায় ছোট একটি প্রশ্ন করেননি। এ-ত্যাগ, এ-মহত্ত্বের দাম আমি ছাড়া আর-কেউ বুঝবে না। পুরুষ-মানুষ আরো দেখেছি....এঁকেও দেখছি। স্বামী-স্ত্রীও অনেক দেখছি...স্বামীকে আমাদের শাস্ত্রে দেবতা বলে। মনে হয়, শুধু এঁর মতো স্বামীই দেবতা! শহর থেকে কেউ এলে আমার ভয় করে জ্ঞানবাবু। মনে হয়, যদি সে-কথা ওঠে? আমায় ডেকে যদি উনি জিজ্ঞাসা করেন— এ-সব সত্য? আমি জানি, আমি নির্দোষ। আদালত আমার শুধু-শুধু খালাশ দ্যায়নি। সে-বিষ আমি দিইনি একথা খুব সত্য! তবু ওনার সামনে এ-কথা বলবার সাহস আমার হবে না।

এ-কথায় আমার নভেলিষ্ট-মন মাতিয়া উঠিল। আমি বলিলাম— আমার কি মনে হয়, জানেন?

— কি?

— আপনি যখন নির্দোষ, তখন সব কথা বলতে কি ক্ষতি?.

শান্তি দেবী যেন শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন— না না মানুষের মন! আপনি নভেল লেখেন, এ-কথা জানেন তো, কখনো যদি অভিমান-বশে ওঁর মনে ছোট একটা প্রশ্ন জাগে তা হলে আমাদের এ-স্বর্গ ছায়ার মতো মিলিয়ে যাবে!

কহিলাম,— তবু মনে হয়, স্পষ্ট বোঝাপড়া হয়ে গেলে আপনার মনে কোনো দিন আর আতঙ্ক জাগবে না।

—স্বামী-স্ত্রী মনে যদি কোনো-কিছু গোপন রাখে, তাতে কি ক্ষতি?

বলিলাম,—হুঁ...

কথাটা বলিয়া গল্প-লেখা কাগজগুলো আমি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

শান্তি দেবী বলিলেন,— আপনার এ দয়া কোনোদিন ভুলবো না।

সন্ধ্যার পর বন্ধুরা বলিলেন— কাল ভোরেই যাত্রা। কাছে আছে মাজুয়ার জঙ্গল। সেখানে বাঘ মিলতে পারে। না মেলে, ঐ পথেই দেশের দিকে পুনর্যাত্রা!

সকালে হাতী আসিল। দুটো হাতী।

সান্যাল আমার হাতীতে চড়িয়া বসিলেন, বলিলেন— চলুন, একটু এগিয়ে দিয়ে আসি

শান্তি দেবী বিদায়-সম্ভাষণ করিলেন ; বলিলেন,— আবার আসবেন জ্ঞানবাবু। আপনার নতুন বই ছাপা হলে আমাদের কথা মনে করে সে-বই পাঠাবেন।

হাসিয়া সান্যাল সাহেব বলিলেন,— ভি-পি ডাকে?

আমি বলিলাম,— না। উনি আমাকে যে-মন্ত্র দিয়েছেন,.... আমার গুরু!

তারপর যাত্রা।

গাছপালার আড়ালে বাঙলো-বাড়ী মিলাইয়া গেল। তবু ঐ দেখা যায় সবুজ পত্র-পল্লবের ফাঁকে সাদা শাড়ী....পায়ে-পায়ে শান্তি দেবী কত দূর যে আসিলেন।

ঘন্টা খানেক পরে একটা খোড়া আটচালা।

সান্যাল সাহেব বলিলেন,— আমি এইখানে নামি।

কহিলাম,— কি করে বাড়ী ফিরবেন?

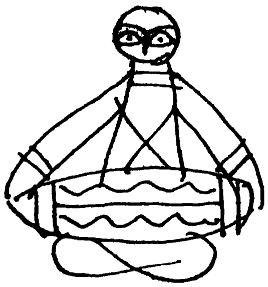
কহিলেন,— এটা পুলিশ-ফাঁড়ি। ওদের বাইসাইক্‌ল্ আছে। তাতে চড়ে ফিরবো ....নিতান্ত নিরুপায় না হলে শান্তিকে একা রেখে দূরে কোথাও আমি যাই না জ্ঞানুবাবু বেচারী আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ...একদিন যে-দুঃখ পেয়েছেন...আপনাকে বলতুম ওঁর বেদনার কাহিনী যদি লেখেন। মানে, আমি বিধবা-বিবাহ করেছি। একদিন স্বামী-হত্যার দায়ে ওঁকে আসামী হতে হয়েছিল— এ-কথা বিশ্বাস করতে পারেন?

চমকিয়া উঠিলাম। কহিলাম,— আপনি সব জানেন?

— জানি। কিন্তু উনি জানেন, আমি সে-কথা জানি না। আমি কোর্টে যেতুম সে-মকর্দমা দেখতে। ওঁর উপর পীড়ন-অত্যাচারের সে-কথা শুনে আমার মন কি ব্যথায় ভরে উঠেছিল! তারপর কত সন্ধান করে ওঁকে খুঁজে পাই! ... উনি সে-সব কথা ভুলতে চান, বাষ্পাকারে আমিও ওঁকে কিছু বলিনি.... বলবার কোনো প্রয়োজন হয়নি। উনি আমায় দেবতা করে তুলেছেন। নিজের অস্তিত্ব রাখেননি। ....যেন আমার ছায়া। বিশ্বাস করতে পারেন, এ যুগের বিদুষী মেয়ে....She lives in me? ওঁকে আমি শুধু ভালোবাসি, তা নয়, শ্রদ্ধা করি! এমন মন আমি কখনো দেখিনি।

কবির মেয়ে

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী



বৎসর দুই-একের মধ্যে আমাদের দলের তিন-চারি জন আড্ডাধারী যখন সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেল, তখন আমরা দস্তুরমত শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। গেরুয়া না পরিলেও ত্যাগে আমরা গেরুয়াধারী অপেক্ষা কম ছিলাম না। আর এই পার্থিব জগতে আড্ডা দেওয়া হইতে যে অপার্থিব সুখ আর নাই, এ কথার ব্যবহারিক পরিচয় দিয়া অনেক গৃহবিমুখ সন্ন্যাসীকেও আমরা আড্ডামুখী করিয়া তুলিয়াছি। এহেন আড্ডা ছাড়িয়া লোক কি সুখে সন্ন্যাসী হইতে চাহে, এ সমস্যার মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া আমরা সকলেই মনমরা হইয়া দিন কাটাইতেছিলাম, এমন সময় একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে আরও একটি বড় স্তম্ভ খসিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ কি না আমাদের দীনবন্ধু হঠাৎ সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।

ভাঙ্গা আড্ডা কোনরূপে চলিতে লাগিল। বছর দুই-তিন আশায় আশায় থাকিয়া পলাতক আড্ডাধারীদের ঘরে ফেরা সম্বন্ধে যখন আমরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন সময় এক দিন দীনবন্ধু হৈ-হৈ করিয়া আড্ডায় উপস্থিত।

— সংবাদ কি?

— কোথায় ছিলি এত দিন?

— গেরুয়া গেল কোথায়?

— ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল বুঝি?

চারিদিক হইতে তাহার উপরে অজস্র প্রশ্নের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু বলিল, "সন্ন্যাসী হয়েছিলুম ভাই।"

সুরেশ বলিল, "সে ত আমরা সবাই জানি। কিন্তু সন্ন্যাসীই যদি হলি, তবে ফিরলি কেন?"

দীনবন্ধু বলিল— "ওরে বাবা! সংসারীর চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ফ্যাঁসাদ বেশী।"

মহেন্দ্র দাদা বলিল, "সেই জন্যই ত পৃথিবীতে সংসারী লোক বেশী, আর সন্ন্যাসী কম। এই কথাটা বোঝাবার জন্য অত কষ্ট করলে কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই ত এর উত্তর পেতে।"

দীনবন্ধু বলিল— "মহেন্-দা, উত্তরের অভাব হলে নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতুম, কিন্তু

তখন আমার যা প্রয়োজন হয়েছিল, তা উত্তরের একেবারে বিপরীত। আর সে জিনিষ অন্ততঃ তোমার কাছে পাওয়া যেত না।"

মহেন্দ্র বলিল— "কি হয়েছিল, বল ত?"

দীনবন্ধু বলিল— "পৈতৃক বাড়ীখানা বাঁধা পড়েছিল জানত। পাওনাদাররা নালিশ করে বাড়ীখানা বিক্রী করে নিলে। এর পরে আর সংসারে টান থাকে? তুমিই বল?"

মহেন্দ্র-দা বলিল,— "সংসার-সমুদ্রে অর্থই হল সব চেয়ে বড় নোঙর, তারই শিকল যখন ছিঁড়ে গেল, তখন কিসে আর রাখবে বল। কিন্তু আবার ফিরে এলে কিসের টানে, বল দেখি। ছোট ছোট নোঙর কোথাও ফেলবার চেষ্টায় আছো না কি?"

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিল— "না দাদা, আর নোঙরে কাজ নেই। এ রকম ভেসে ভেসেই বেড়াব।"

সুরেশ বলিল,— "আচ্ছা, বেরিয়েই বা গেলে কেন আর ফিরেই বা এলে কেন?"

দীনবন্ধু বলিল— "বেরিয়ে যাবার কারণ ত বলেছি। অবিশ্যি ফিরে আসবারও কারণ একটা আছে।'

দীনবন্ধুকে সকলে চাপিয়া ধরিলাম— "কারণ বলিতেই হইবে।"

তাহারও বিশেষ আপত্তি ছিল না। সে আরম্ভ করিল।

"তোমাদের ত আগেই বলেছি, পৈতৃক ভিটেখানি পাওনাদাররা মিলে বিক্রী করালে। তখন আমার হাতে আছে মোট তিপ্পান্ন টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বসে বসে ভাবলুম, কি করা যায়! যেমন বাজার, তাতে চাকরী বাকরীর সুবিধা কোথাও হবে না। ও দিকে তিপ্পান্ন টাকা ফুরাবার আগে যে উদরযন্ত্রের দাবীও ফুরিয়ে যাবে, এখন কোনও আশা নেই। এই সব নানা দিক ভেবে ঠিক করে ফেললুম, সন্ন্যাসীই হওয়া যাক্। যাঁহাতক মনে হওয়া, অমনই আনা-দুয়েকের লাল মাটি কিনে এনে দুখানা ধুতি গেরুয়া রঙে ছেপে ফেলা গেল। তার পরদিন দুপুর বেলায় হরিদ্বারের গাড়ীতে সন্ন্যাস-যাত্রা।

"হরিদ্বারে গিয়ে ত পৌঁছলুম, কিন্তু গুরু আর খুঁজে পাইনে। অনেকে পরামর্শ দিলে যে হিমালয়ে অনেক ভাল ভাল সন্ন্যাসী আছেন, সেখানে গিয়ে কারুর কাছ থেকে দীক্ষা নাও।"

হিমালয়ের দিকেই যাত্রা করা গেল। সমস্ত দিন চলি আর রাত্রে কোন চটিতে আশ্রয় নিই। পথে লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করি, ভাল সন্ন্যাসী কোথায় আছে? তাদের নির্দ্দেশমতো কোনও মঠে গিয়ে উঠি। কোথাও বা যাওয়া মাত্র তাড়িয়ে দেয়, কোথাও বা দুদিন বাদে বলে দেয়, তোমাকে দীক্ষা দেব না। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করি।

"এই রকম প্রায় মাস খানেক পাহাড়ে ঘুরে একদিন এক সন্ন্যাসীর আস্তানায় গিয়ে

উপস্থিত হলুম। এর নাম জীবানন্দ। হরিদ্বারে থাকতেই খুব উচ্চদরের সাধক বলে এঁর নাম শুনেছিলুম। ছোট্ট একটি উপত্যাকার মধ্যে এঁর মঠ। তিন-চার খানি ঘর, তাতে গুটি দুয়েক শিষ্যকে নিয়ে তখন বাস করছিলেন।

"সন্ন্যাসীকে গিয়ে প্রণাম করে বল্লুম— 'বাবা আমার মনে বড় অশান্তি, তাই আপনার আশ্রয়ে এসেছি।'

"সন্ন্যাসী স্মিতহাস্যে বল্লেন— 'বেশ করেছ, এখানে থাক। শান্তিময় এই স্থান, শান্তি পাবে।'

"সেখানে দু'-তিন দিন থাকার পর একদিন বিকেলবেলা তাঁকে একলা পেয়ে আমি বলে ফেল্লুম— 'বাবা, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, আপনি আমায় দীক্ষা দিন।'

"আমার কথা শুনে সন্ন্যাসীর চোখ দুটো হঠাৎ লাল টকটকে হয়ে উঠল। আমি তাঁর পদসেবা করছিলুম, তিনি পা গুটিয়ে নিয়ে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলেন— 'কি বল্লে?'

"স্বামীজিকে হঠাৎ অমন উত্তেজিত হতে দেখে আমি থমথম খেয়ে গিয়েছিলুম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন— 'কি, কি বল্লে?'

"এবার আমি সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললুম— 'আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিতে এসেছি। আমি সংসার ত্যাগ—'

"স্বামীজি সেই সুরেই বললেন— 'কে তোমাকে সংসার ত্যাগ করতে বলেছে? আমার কাছে আসতেই বা কে বলেছে?'

"কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি আবার বললেন— 'আমি মনে করেছিলুম, তুমি এখানে বেড়াতে এসেছ, কিছুদিন থেকে মনটা ভাল হলে ফিরে যাবে। এই ভেবেই তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলুম।'

"জানোই ত! এ রকম ধরণের কথা কোনদিনই সহ্য করা আমার অভ্যাস নেই। তবুও সন্ন্যাসী লোক, তাকে কিছু বলব না মনে করে এতক্ষণ চুপ করেই ছিলুম। কিন্তু আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। বলে ফেললুম— 'আশ্রয়ের আমার এমন অভাব হয়নি যে জন্য এই পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙ্গে আপনার কাছে আসতে হবে—'

"আরও একটু কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু স্বামীজি তার আগেই একটি প্রকাণ্ড ধমক ছেড়ে বললেন— 'তবে উঠ্। এই মুহূর্ত্তেই এখান থেকে দূর হয়ে যা।"

"চীৎকার শুনে শিষ্য দুজন ছুটে এল। স্বামীজি তাদের বললেন— 'এখনি এখান থেকে মঠের চৌহদ্দী পার করে দিয়ে এস।'

"আমি তখনই উঠে পড়লুম। শিষ্য দুজন আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে একটা রাস্তা দেখিয়ে বললে— 'এই পথ ধরে যাও, কেদারে পৌঁছবে। রাস্তা দুর্গম, একটু সাবধানে যেও। পথে যাত্রী দেখলে তাদের সঙ্গ নিও, অসুবিধা হবে না।'

"শিষ্যরা চলে গেলে সেই পথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। অনেকক্ষণ চলার পর বিপরীত দিক থেকে একজন লোক আসছে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম— 'চটি কত দূরে?'

সে বললে— 'এখানে চটি কোথায়? দশ মাইল দূরে একটা চটি আছে বোধ হয়।'

"লোকটার কথা শুনে আমি একেবারে বসে পড়লুম। একে তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অন্ধকারে পথও চিনতে পারি না, মঠে যাবার পথ চিনি বটে, কিন্তু সেখানে ফেরবার পথ নিজেই নষ্ট করে এসেছি। এই রাত্রিতে দশ মাইল পাহাড়ে-পথ অতিক্রম করে চটিতে পৌঁছবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। বাইরের অন্ধকার ক্রমেই ঘনিভূত হয়ে উঠতে লাগলো। অন্তরের আশার শিক্ষাও স্তিমিত। একমাত্র ভরসা আমার দুর্জয় সাহস। সেই সাহসে ভর করে আমি অগ্রসর হতে লাগলুম।

"রাত্রি এক প্রহর কেটে যাবার পর আকাশে একটু চাঁদের আলো দেখা দিল। ক' মাইল পথ চলে এসেছি তা ঠিক করতে পারলুম না, তবে যতদূর মনে পড়ে— একটা ছোট আর একটা বড় উপত্যকা পার হয়ে হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। স্থির করলুম যে, এক জায়গায় বসে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলতে সুরু করব।

"একটা গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করছিলুম, কখন যে সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছি, তা জানতেই পারিনি, হঠাৎ খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস আমায় ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিল।

"জেগে দেখি, চাঁদের আলোতে চারিদিক ভেসে গেছে। আমার চারিদিকে ছোট থেকে বড় একটার পর একটা পাহাড় থাকে থাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে, সবার পিছনে একটা পাহাড় আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে নীল আকাশ ভেদ করে উঠেছে। বাতাস অতি মৃদু ভাবে তার গায়ে মেঘের চামর বুলিয়ে দিচ্ছে। কি স্থির আর কি শান্ত ভাবে তারা কাল-সমুদ্রের বুকে অনন্তের নোঙর পেতে পড়ে আছে!

"আমার মনে হতে লাগল, পাহাড়গুলো যেন এই শব্দহীন, অন্তহীন নীল চাঁদোয়ার নীচে বসে মহাপ্রলয়ের দিন কে কি কাজের ভার নেবে, তারই পরামর্শ করছে। সেই বিরাট মহান প্রকৃতির সামনে মাথা আপনি নুয়ে পড়ল।

"মাথা তুলতে না তুলতে শুনতে পেলুম— 'চল্, এত রাতে আর এখানে বসে থাকে না।'

"পিছনে ফিরে দেখি, স্বামীজি তাঁর দুই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ফিরতেই তিনি বললেন,— 'তুই ত ভারী অভিমানী ছেলে। চলে যেতে বল্লুম বলেই কি চলে যেতে হয়?"

স্বামীজিকে প্রণাম করে বল্লুম— 'প্রভু, আপনি তাড়িয়ে না দিলে এ দৃশ্য আমি দেখতে পেতুম না। চলে যেতে বলে ভালই করেছিলেন।'

স্বামীজি আমার একখানি হাত ধরে বল্লেন— 'চল্ ফিরে চল। রাগ করিস্‌নি।'

'সেই রাত্রিতে আবার মঠে ফিরে এলুম। বোধ হয়, চারদিন পরে স্বামীজি আমায় দীক্ষা দিলেন। আমার সংসারী নাম ঘুচে গিয়ে নাম হলো— 'অরূপচৈতন্য'।

"মঠে বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে লাগল। সকালে স্বামীজি আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন দূরে দু-তিনখানা গ্রাম ছিল, তারই বাসিন্দারা আমাদের আহার্য্য যোগাত, মধ্যে মধ্যে স্বামীজির ধনী শিষ্যরা ভেট পাঠাত। শক্ত কাজের মধ্যে ছিল ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসা। জ্যোৎস্না রাত্রি হলেই আমি পাহাড়ে বেরিয়ে পড়তুম, ঘন্টার পর ঘন্টা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মঠে এসে শুয়ে পড়তুম।

'বাইরের যে পৃথিবীটার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে চলে এসেছিলুম, মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার আহ্বান আমার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ে আমাকে আকুল করে তুলত। কিন্তু নির্জনতার মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। তার নেশা ধরতে দেরী লাগে বটে, কিন্তু সে মৌতাত একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর ছাড়া মুস্কিল। আস্তে আস্তে এই একলা থাকার মৌতাত আমি মসগুল হয়ে উঠেছিলুম। এমন সময় কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে স্বামীজিকে বোম্বাইয়ের দিকে চলে যেতে হলো।

"মঠে তখন আমরা তিনজন মাত্র শিষ্য ছিলুম। স্বামীজি একজনকে সঙ্গে নিলেন, এক জনকে পাঠিয়ে দিলেন প্রয়াগ অঞ্চলে আর আমায় বললেন— 'তুই নিজের দেশে যা।" সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর একবার দেশে যেতে হয়।'

"মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে আর আমার মোটে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গুরুর আগ্রহে আমায় বেরুতে হলো। তিনি আমাদের দুজনকে বলে দিলেন— 'দুবছর পরে আমি এইখানে.....। বিনা টিকিটেই রেলে উঠে পড়া গেল। টিকিট নেই শুনে কেউবা সন্ন্যাসী বলে ছেড়ে দেয়, আবার কেউবা ঘাড় ধরে নামিয়ে দেয়। তখনকার মত নেমে পড়ি পরদিন আবার ট্রেনে উঠে চলতে থাকি।

এই রকম করে অগ্রসর হতে হতে এক দিন মধুপুর রেলষ্টেশনে একজন কর্ম্মচারী আমার নিকট টিকিট নেই দেখে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে। আমি মনে করেছিলুম, আমাকে নামিয়ে দিয়েই সে নিশ্চিন্ত হবে, আমিও আবার অন্য গাড়ীতে চড়ব। কিন্তু তা হল না ষ্টেশন থেকে গাড়ীখানা চলে যাবার পর সে ব্যক্তি আমাকে একেবারে রেলপুলিশের জিম্মায় সমর্পণ করলে। এরকম ফ্যাঁসাদে এর আগে আর কখনও পড়িনি। প্রায় আট দশ দিন টানা-পড়েন। থানা-পুলিশ হতে হতে ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। আমি আন্দাজ করেছিলুম এই সুযোগে জেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা বোধ হয় হয়ে যাবে। কিন্তু অবোধ হাকিম কোম্পানীর সমস্ত কথা শুনে আমায় বললে. "যাও, এমন কাজ আর করো না।'

"সন্ন্যাসীর নামে মামলা হওয়ায় সেখানে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। আমি মুক্তি পেতেই শহরের এক ধনী আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। কলকাতায় যাব শুনে তারা রেলের

টিকিট কিনে দিতে চাইলে। কিন্তু রেলে উঠতে আমার আর প্রবৃত্তি হলো না। আমি সেখান থেকে হেঁটেই রওনা হলুম।

"মধুপুর থেকে কলকাতা অবধি বেশ ভাল হাঁটা-পথ আছে। সেই রাস্তা ধরে কলকাতার দিকে এগিয়ে চলেছি, তখন বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে কষ্ট দেয়, আর পাহাড়ে নদীগুলো ভরে ওঠায় কোনও কোনও জায়গায় পারের জন্য একটু মুস্কিলে পড়তে হয়। তা না হলে সন্ন্যাসীর পক্ষে পথ চলায় কোনও কষ্ট নেই।

"মাস খানেক পথ চলে বাঙ্গলায় এসে পৌঁছলুম। বৃষ্টি তখনও থামেনি, বরং আরও বেড়েছে। মাঠ-ঘাট সব জলে ভর্ত্তি, রাস্তাও আর তেমন শুকনো নয়। মধ্যে মধ্যে ভারী কাদা।

"একদিন— সেদিন আর কোনও গ্রামের মধ্যে ঢুকিনি। রাস্তা বেয়ে তাড়াতাড়ি চলেছি, কোনও রকমে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। কতবার বৃষ্টি এল, আর কতবার যে ভিজে কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেল, তার ঠিকানা নেই। সমস্ত দিন চলে চলে সন্ধ্যার সময় একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলুম। পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, তার উপর জলে ভিজে ভিজে ক'দিন থেকে শরীরটা জ্বর-জ্বর করছিল।

"সন্ধ্যার কিছু পরেই আবার বৃষ্টি শুরু হলো। মনে করেছিলুম, রাত্রিটা সেইখানে কোন রকমে কাটিয়ে সকালে আবার চলা শুরু করব। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ল, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।

"আমি যে গাছের নীচে আস্তানা কবেছিলুম, তার একটু দূরেই একটা রাস্তা গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে। এই দুর্যোগে কোনও রকমে কোনও গৃহস্থের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারলে নিশ্চয় রাত্রির মত একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে, এই ভরসায় গাছের তলা থেকে দৌড় দিলুম।

"দৌড়— দৌড় দৌড়!— কিছুক্ষণ দৌড়ুই, আবার কিছুক্ষণ হাঁটি। এই রকম করে চলতে চলতে দূরে একটা আলো দেখতে পেলুম। ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেটা একটা মুদীর দোকান, ছোট একটা চালা-ঘর। মুদী সেখানে আশ্রয় দিলে না, তবে সে দয়া করে গ্রামের রাস্তটা আমার দেখিয়ে বল্‌লে— "গাঁয়ের ভিতরে যাও, সেখানে আশ্রয় পেতে পার।'

"গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তার উপর কালো মেঘের ছায়া ধরণী যা কিছু সব যেন নিকিয়ে নিয়েছে। চোখে কিছুই দেখতে পাই না। অন্ধকার, কাঁটা আর কাদায় মিলে সে একটা বীভৎস ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তার উপর দিয়ে এক রকম গড়াতে গড়াতে চলতে লাগলুম।

"গ্রাম একেবারে নিশুতি। একে এই দুর্যোগ, তার উপরে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, গ্রামবাসীরা

যে যার শুয়ে পড়েছে। মানুষ ত ছার, একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শুনা যাচ্ছে না। এরই ভিতর দিয়ে আমি পিছলে পিছলে টলতে টলতে চলেছি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। তবুও চলেছি। এমন সময় অনেক দূরে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল।

"প্রায় আধ ঘন্টা সেই আলো লক্ষ্য করে গিয়ে আমি একটা একতলা জীর্ণ বাড়ীর সামনে উপস্থিত হলুম। একটা খোলা জানালা দিয়ে ক্ষীণ আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছিল। একটু ঘুরে বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজা ভেজান ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল বটে, কিন্তু কেউ নেই সেখানে। আমি ডাক দিলুম,— 'বাড়ীতে কে আছেন? বাড়ীর ভিতরে রমণীকণ্ঠ শুনা গেল,—' ওবে দেখ্, বোধহয় ডাক্তারবাবু এলেন।'

"সঙ্গে সঙ্গেই একটি কিশোরী একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। কিশোরী প্রথম আমাকে দেখতে পায়নি। সে লণ্ঠনটা তুলে 'কে' বলে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

"আমাকে সেই অবস্থায় দেখে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না, কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িযে থেকে লণ্ঠনটা ঠক করে নামিয়ে রেখে সে ভিতর চলে গেল।

"একটু পরেই একজন বিধবা রমণী— 'কে' বলে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছুতে গুটি দুই তিন ছেলে-মেয়ে।

"আমি একটু এগিয়ে এসে বললুম— 'আমি অতিথি। এই দুর্য্যোগে বড় বিপদে পড়েছি, রাত্রির মত একটু আশ্রয় চাই।'

"রমণী স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—'তোমার বাড়ী কোথায বাবা?'

"বললুম—- 'সন্ন্যাসীর আবার বাড়ী কোথায মা!'

'ও, তুমি সন্ন্যাসী! তা গেরুয়া দেখেই মনে হয়েছিল। এস, বাবা, ভিতরে এস। ভগবান্ তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

"বাড়ীর ভিতরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে কাপড়খানা নিংড়ে পরলুম। শরীর একেবারে ভেঙ্গে আসছিল, শোবার জন্য জাযগা খুঁজছি, এমন সময় সেই বিধবা আমার বল্লেন—'বাবা, আমাদের বড় বিপদ। তাই বোধ হয়, ভগবান্ এত রাত্রে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

"ঘুমটুম্ সব ছুটে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম— 'কি বিপদ, বলুন আমার যদি সাধ্য থাকে—'

"তিনি বল্লেন 'আমাব বড় মেয়েটি আজ ছয় মাস ধরে জ্বরে ভুগছে। আজ সন্ধ্যা বেলায় কাস্তে কাস্তে কি রকম অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছে, এখনও ভাল করে জ্ঞান হয়নি। এ গ্রামে কোন ডাক্তাব নেই, ভিন গাঁয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠান হয়েছে! তা এই দুর্যোগে সে বোধ হয় আব এল না!'

“চলুন, তাকে দেখে আসি।’

“এই বলে উঠলুম। বিধবা আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের এক দেওয়ালের গায়ে লাগা এক খাটে রোগিণী শুয়ে আছে। এই ঘরেরই খোলা জানালা দিয়ে যে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল, তাই লক্ষ করে আমি এসেছি। রোগিণীর বয়স বোধ হয় কুড়ির কাছাকাছি। দেখতে হয়ত সুন্দরীই ছিল, কিন্তু নির্মম রোগ তার সমস্ত সৌন্দর্যই গ্রাস করেছে।

‘অনেকক্ষণ বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে মুখ দেখলুম। চোখ বুজিয়ে সে পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, ‘এর নাম কি?’

‘ললিতা।’

“রোগিণীর তপ্ত ললাটে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলুম— ‘ললিতা’।

“ডাকামাত্র তার নিমিলিত চোখ দুটো খুলে গেল। সে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুলে।

“রোগিণীর মা বল্লে— ‘সন্ধ্যার আগে একবার বমি করে সেই চোখ বুজেছিল, আর এই খুলল। তোমাকে কি বলব বাবা—’

“আমি বল্লুম— আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আর কোন ভয় নেই। কাল ডাক্তার এলে যা হয় ব্যবস্থা হবে।’

“রোগিণীর ঘরের বাইরে একটা চওড়া দাওয়া। তারই কোণে আমার শোবার ব্যবস্থা হল।”

“পাশের একটা ঘরে ছেলে-মেয়েদের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছিল. ললিতার মা আমাকে শুইয়ে সেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

“তখনও বৃষ্টি থামেনি। বৃষ্টির সেই অখণ্ড ঘুমপাড়ানিয়া গানে গ্রামের সমস্ত প্রাণীই নিদ্রিত। আমার চোখ থেকে কিন্তু ঘুম ছুটে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই পাশের ঘরের সেই রুগ্না মেয়েটির শীর্ণ মুখ চোখের সামনে ভাসতে থাকে! তার কথা ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আমাকে তার দিকে টানতে লাগল।’

“ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, বাতিটা তখনও মিট-মিট করছে। কোণে এক বৃদ্ধা ঝি পড়ে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। খাটের দিকে চেয়ে দেখলুম, ললিতা আবার চিৎ হয়ে শুয়েছে। সেই স্তিমিত আলোকে তার মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। আমি খাটের ধারে গিয়ে ঝুকে তার মুখখানা দেখতে লাগলুম।

“একদৃষ্টে তাকে দেখছি। নিশ্বাস এত ক্ষীণ যে, তা পড়ছে কি না তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার একখানা হাত তুলে নাড়ী দেখতে লাগলুম। জীবন-প্রবাহ অতি ক্ষীণ, যে কোন মুহূর্ত্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ রুগ্নার চোখ দুটো খুলে গেল। আমাকে দেখেই সে বলে উঠল— ‘কে! কে তুমি।’

“আমি তাড়াতাড়ি হাতখানা নামিয়ে রেখে বললুম— ‘কোনও ভয় নেই। আমি সন্ন্যাসী।’

"সন্ন্যাসী! ও, তুমিই বুঝি রোজ ঐ জানালার ধারে বসে থাক? আজ এত কাছে এসেছ যে?"

আমি বললুম— "তুমি ঘুমোও। বেশী কথা বললে অসুখ বাড়বে।"

"কিন্তু তুমি এত কাছে এসেছ কেন? আমাকে বুঝি নিয়ে যাবে? না না, আমি যাব না, তুমি যাও।"

স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, বিকারের ঘোরে সে ভুল বকছে। আমি তার কপালে হাত দিয়ে বললুম— 'তুমি চোখ বুজোও, ঘুমোও।"

"মেয়েটি আর একবার দৃষ্টিহীন চাউনীতে আমার দিকে চেয়ে চোখ বুজলো।

"একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার সেই শীর্ণ মুখ আর অসহায় অবস্থা দেখে তার প্রতি করুণায় আমার মনটা আর্দ্র হয়ে উঠতে লাগল। আমি বসে বসে ললিতাকে পাখার বাতাস করতে লাগলুম। গুরুদেবের শিক্ষা একেবারে বিফলে যায়নি। তোমাদের সত্যি বলছি, সেখানে বসে বসে আমার মনে হতে লাগল যে, এর মধ্যে ভগবানের নিশ্চয় কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তা না হলে কোথাকার লোক আমি আর আজ এই শেষরাতে কোথায় বসে কাকে বাতাস করছি। আশ্চর্য দৈবের খেলা!

"সূর্য্যের রথখানা তখনও উদয়াচলের শিখরে এসে পৌঁছেনি। অন্ধকার একটু ফ্যাকাসে হয়েছে মাত্র, এমন সময় ললিতার মা ঘরে ঢুকে আমাকে ঐ অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বললেন— 'সারারাত্রি এইখানে বসে আছ, বাবা? তুমি আর জন্মে নিশ্চই আমাদের কেউ ছিলে। তা না হলে—'

"তাকে বাধা দিয়ে বললুম— 'আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। সেবাই আমাদের ধর্ম্ম।'

"আমাদের কথা শুনে ললিতার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ চেয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চাইতে লাগল। তাব মা কাল রাত্রির সমস্ত কথা বলে আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে একটু হাসবার চেষ্টা করে শুয়ে শুয়েই আমাকে নমস্কার করলে।

"সকালবেলা ক্রমে ক্রমে ললিতাদের বাড়ীর অবস্থা জানতে পারলুম। ললিতার বাবা ছিলেন এক জন কবি, কাজেই দরিদ্র। চাকরী-বাকরীর চেষ্টা চার-পাঁচবার করেছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি কোথাও বনিবনাও হয়নি। অতি সামান্য আয় আছে, তাতে কষ্টে দুবেলা খাওয়া চলে। জাতে তারা ব্রাহ্মণ। বছর খানেক আগে ললিতার বাবা তিন দিনের জ্বরে মারা গেছেন। ললিতা ছাড়া আরও একটি মেয়ে আছে, তার নাম অমিতা। দুটি ছেলে, তারা মেয়েদের চেয়ে ছোট। মেয়েদের কারও বিয়ে হয়নি। ললিতার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছিল; এমন সময় তার বাবা মারা গেলেন। তার পরে আজ ছ'মাস সে জ্বরে জ্বরেই সারা হচ্ছে। কাল বিকেলে সে রক্তবমি করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ভিনগাঁয়ে ডাক্তার থাকে, রাতে লোক পাঠান হয়েছিল, লোকও ফেরেনি, ডাক্তারও আসেনি।

"ললিতার মা'র বয়স বেশী নয়, চল্লিশের কাছাকাছি হবে। সংসারের কাহিনী বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন— 'বাবা, ললিতা বাঁচবে ত, কর্ত্তার বড় আদরের মেয়ে ও।'

"আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করলুম। বললুম, না বাঁচার কোন কারণ দেখছি না— ও সেরে উঠবে।'

"তিনি বললেন— 'তুমি কটা দিন এখানে থাক, বাবা! তোমায় দেখে আমার ভরসা হচ্ছে।'

"মাসখানেক ধ'রে হেঁটে হেঁটে আমিও ক্লান্ত হয়েছিলুম। বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাঁর কথা শুনে বললুম, 'বেশ আমি আছি'।

"ললিতার মা সংসারের কাজে ব্যপৃত হলেন, আমি আবার ললিতার বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। তার মনটা একটু প্রফুল্ল করার জন্য বল্লুম— 'ললিতা, গল্প শুনবে।'

"সে উৎসাহিত হয়ে বল্লে— 'হ্যাঁ, বলুন শুনব।'

"একটা গল্প বল্লুম, সে শুনে বল্লে,— 'এ গল্প আমি জানি'। আর একটা বললুম সে বললে, 'এ-ও আমি জানি।'

"সকালবেলা গল্প করে কাট্‌ল। দুপুরবেলা ডাক্তার এলেন। হাতুড়ে ডাক্তার, কলকাতার কোন এক স্বদেশী ডাক্তারী কলেজে বছর ছয়েক পড়ে পাঁচটি অক্ষর উপাধি পেয়েছিল। কিন্তু ললিতার যে রোগ, তা ধরবার জন্য দিগ্‌গজ ডাক্তার না এলেও চলে। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করে দুটি টাকা নিয়ে আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে 'রাজযক্ষ্মা হয়েছে, দুটো ফুসফুসই আর কিছু নেই। যে কোন মুহূর্তেই মৃত্যু হতে পারে।'

"বিকেলবেলায় ললিতার খাটেব পাশে বসে আছি। অস্তোন্মুখ রবির এক টুকরো ম্লান রশ্মি খোলা জানালা দিয়ে বিছানার ধারে এসে পড়েছিল। ললিতা অনেকক্ষণ সেই আলোটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লে— "সন্ন্যাসী, ডাক্তার কি বলে গেল, আমি আর বাঁচব না?'

"আমি বল্লুম— 'সে কি! কে বল্লে তোমাকে? ডাক্তার বল্লে তুমি শীগ্‌গীর সেরে উঠবে ও সব কথা ভেবো না লক্ষ্মীটি।'

"আমার কথা শুনে ললিতার শীর্ণ মুখ খুশীতে ভরে উঠল। সে বল্লে— 'না না, সন্ন্যাসী আমি ত সে কথা ভাবি না। আমি দিন-রাত বাঁচবার কথাই ভাবি। শুধু ভাবি, কবে ভাল হয়ে উঠব। এখন আমি মরতে চাই না। আমার এই উনিশ বছর বয়স, এই বয়সে কি মরতে ইচ্ছে হয়? আমার অনেক আশা আছে, অনেক।'

"এই অবধি বলে সে ভয়ানক হাঁপাতে লাগল। পাছে আবার সেই প্রসঙ্গ ওঠে এই ভয়ে তাকে বল্লুম— 'ললিতা, গল্প শুনবে?'

"ললিতা একটু হেসে বল্লে, 'না, গল্প নয়। ঐ তাকের উপরে কবিতার বই আছে, নিয়ে এসে আমায় শোনাও না।'

"তাকের উপর সারি সারি ইংরাজী, বাঙ্গলা কবিতার বই সাজান ছিল। একখান বাঙ্গলা বই নিয়ে এসে বললুম 'কোন্‌টা পড়ব?

'ললিতা বললে, 'যেটা ইচ্ছে পড়।'

"আমি পড়তে লাগলুম আর ললিতা চোখ বুজিয়ে রইল। একটার পর একটা পড়ে যাই, তার আর ক্লান্তি নেই। ঝি এসে আলো দিয়ে গেল, মা এসে কাছে বসলেন, অমিত এসে খাইয়ে গেল, মা অন্য কাজে গেলেন, পড়ার আর বিরাম নেই। একবার সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে আমি পড়া বন্ধ করলুম, কিন্তু তখনই সে চোখ চেয়ে বল্লে— "কৈ পড়ছ না?"

"আবার পড়তে শুরু করা গেল। একবার ললিতার দিকে চেয়ে দেখলুম, তার দুই চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

"তার সেই অবস্থায় মনের উপর কোন চাপ পড়া উচিত নয় ভেবে পড়া বন্ধ করলুম ললিতা তখনই চোখ চেয়ে বললে—, থামলে যে?'

"আমি বললুম— 'আজ এই অবধি থাক, আবার কাল হবে। কি বল?"

"ললিতা বললে— 'আচ্ছা।'

"তাকে বইখানা রেখে এসে তার কাছে বসা মাত্র সে বললে, 'সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল। বড় সুন্দর পড়তে পাব তুমি। আমার বাবাও খুব সুন্দর পড়তে পারতেন। আমাতে আর বাবাতে বই হাতে করে চলে যেতুম সেই নদীর ধারে, কখনও বা ঐ বড় মাঠটা পেরিয়ে সেই বটগাছের নীচে। সমস্ত দিন আমরা সেখানে বসে বসে কবিতা পড়তুম। এই ভাদ্রমাসে আমবা ভাই-বোনে মাঠে-ঘাটে কত খেলাই করেছি। আজ প্রায় ছ মাস হলো বাড়ী থেকে বেরুইনি, প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠছে। কত দিনে আমি ভাল হয়ে উঠব, বলতে পার সন্ন্যাসী?'

'ললিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, 'তুমি শিগ্‌গীর সেরে উঠবে। সেরে উঠলে আবার আমরা তেমনিই খেলতে যাব। তোমার শরীরটা একটু ভাল হোক্‌।'

"আমার কথা শুনে সে সন্দিগ্ধ ভাবে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, 'তুমি ঘুমোও, তা না হলে আবার অসুখ বাড়বে।'

"ললিতা আর কিছু না বলে চোখ বুজিয়ে ফেললে।

"সে রাত্রিতে ললিতার অসুখ ভয়ানক বেড়ে উঠলো। রাত্রি বারোটা কি একটার সময় সে কাশতে আরম্ভ করলে। কিছু পরেই তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল আমি ছুটে গিয়ে তার মাকে খবর দিলুম। ললিতার মা আর বোন্ অমিতা এসে আর্তের পাশে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগলো। বাতাস করতে করতে একটু যদি যন্ত্রণা কমে ত অমনই কাসি শুরু হয়, তার পরেই দু ঝলক লাল টক্‌টকে রক্ত। একটুখানি নিশ্বাস

নেবার জন্য সে কি চেষ্টা। শত ছিদ্র ফুসফুসের সে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা, তা যক্ষ্মারোগীকে যে না দেখেছে, সে বুঝতে পারবে না। আমার মনে হতে লাগল, আজ রাত্রিতে বোধ হয় শেষ। কিন্তু মানুষের প্রাণ পৃথিবীর সমস্ত পাওনা চুকিয়ে না দিয়ে ত মুক্তি পায় না। সারারাত্রি সেই যন্ত্রণা সহ্য করে শেষ রাত্রির দিক ললিতা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। আমরা তিনজনে সারারাত তাঁর বিছানার পাশে বসে বসে কাটালুম।

"ললিতাদের গ্রামের ধার দিয়েই গঙ্গা বয়ে গিয়েছে। আমি রোজ নদীতে গিয়ে স্নান করতুম। সকালবেলা একটুখানি ঘুমিয়ে স্নান সেরে এসে দেখি, ললিতা জেগেছে আর প্রফুল্ল ভাবেই তার ভাইবোনদেব সঙ্গে গল্প করছে। একটি ভাই আদব করে তার দিদির পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকতেই ললিতা আমায় জিজ্ঞাসা করলে— "সন্ন্যাসী, তুমি স্নান করতে গিয়েছিলে বুঝি?'

"হ্যাঁ।"

"এখন গঙ্গার দুকুল ভরে উঠেছে না?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, সন্ন্যাসী, গঙ্গার ধাবে সেই বড় গাছটা, সেটা দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"তারই একটা মোটা শিকড় মাটি থেকে ধনুকেব মত হয়ে উঠে আবার মাটিব মধ্যে গিয়েছে, সেটা দেখেছ?"

"কৈ, তা ত দেখিনি!'

"তাহলে সেটা জলে ডুবে গিয়েছে। আব কত দিনে সে গঙ্গার আবার সেই রূপ দেখতে পাব!"

"ললিতা তার ক্লান্ত চোখ দুটো বন্ধ করল। কিছুক্ষণ পরে ললিতার মা অমিতা ও তার ছোট ভাই দুটিকে খাবার জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন।

"ভাই-বোনেরা চলে যাবার পর ললিতা চোখ মেলে আমায় বললে— 'সন্ন্যাসী, এই সময় মাঠে খুব কাশ-ফুল হয়। আমার জন্য কাল ক গোছা তুলে আনবে?"

"আমি বল্লুম— কাল কেন, আজই বিকেলে তোমার জন্য কাশ নিয়ে আসব। মাঠে অনেক কাশ দেখেছি।"

"ললিতা এতক্ষণ বেশ হাসিমুখেই কথা কচ্ছিল, হঠাৎ তার চক্ষু দুটি সজল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ নিবর্বাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বল্লে— 'সন্ন্যাসী, আমার যেন মন হচ্ছে, মাঠভরা কাশের সেই শোভা, বর্ষার গঙ্গার সেই আপনভোলা উদ্দাম স্রোত, শরতের সকালে এই মিষ্টি রোদ এই শেষ সব শেষ। আর দেখতে পাব না।'

"ললিতার কণ্ঠে এমন একটা অসহায় ও উদাস সুর বাজতে লাগল যে চোখের জল

সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীর অভিমান আমার যায়নি। নিজের মনকে ধমক দিতে লাগলুম—ছি, এত কোমল তুমি!

"ললিতাকে বল্লুম— ললিতা, ও সব কথা ভেবে নিজের অসুখ বাড়িয়ে কেন আমাদের দুঃখ দিচ্ছ? তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো।"

"ললিতা আবার আমার মুখের দিকে তাকালে। সেই সজল দৃষ্টিতে। এবার সে বললে— 'সন্ন্যাসী, আমার জন্য তোমার দুঃখ হয়? আমি যদি মরে যাই— আমার কথা কি তোমার মনে থাকবে? আমি মরে গেলে তুমিও এখান থেকে চলে যাবে। তারপর তুমি কত দেশে দেশে ঘুরবে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে, তারই মধ্যে সজনে, নির্জ্জনে পাড়া-গাঁয়ের এই ললিতার কথা— যার সঙ্গে দুদিনের জন্য তোমার ভাব হয়েছিল, তার কথা কি মনে থাকবে?'

"আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছিল। কোনও রকমে গলাটি পরিস্কার করে নিয়ে বল্লুম, 'থাকবে, ললিতা। তোমাকে কখনও ভুলব না।'

"ললিতা যেন একটা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে বল্লে— আ, সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল মানুষ।'

"ললিতাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার মাকে নির্জ্জনে ডেকে বল্লুম— 'ললিতার অবস্থা ভাল নয়, বোধ হয় দু-এক দিনের বেশী বাঁচবে না।'

"কথাটা শুনে তিনি চম্‌কে উঠলেন। সন্তানের মৃত্যু-সম্ভাবনার সংবাদে মায়ের সে চমকানি— তার বর্ণনা করার ভাষা আমি জানি না। তিনি কোনও কথা না বলে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। সদ্যবিধবা সেই নারীকে সান্তনা দেবার মত ভাষা আমার যোগাল না। বসে বসে ভাবতে লাগলুম, মৃত্যু এ সংসারে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু ধরণীর এই অতি পুরাতন অতিথি প্রতি গৃহে প্রতিবারেই দেখা দেয়। সকলেই জানে, এর কোন প্রতিকার নাই, তবুও তারা শোকে কাতর হয়, সকলেই জানে, সান্ত্বনার কোন মূল্য নাই, তবুও সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে মরে। ললিতার মাব অশ্রু দেখে আমিও দু চারটে সান্ত্বনার গৎ আওড়াতে লাগলুম। কিন্তু ছেলেরা সেখানে এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেলুম।

"বিকেলবেলা অমিতা ও তার ভাই দুটিকে নিয়ে মাঠ থেকে কয়েক গোছা কাশফুল তুলে নিয়ে এলুম। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা কি রকম বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। ফুলগুলো দেখে তার মুখে আবার ম্লান হাসি ফুটে উঠল। সে এক গোছা ফুল নিয়ে নিজের মুখের উপর বুলোতে আরম্ভ করলে।

"সে দিন সন্ধ্যার দিকে ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল— ঘুম ভাঙ্গল একেবারে রাত্রি বারোটা কি একটায়। এর মধ্যে তাকে একবার জাগিয়ে খাওয়ান হয়েছিল। আমি তার পাশে বসেছিলুম, সে আমার একখানা হাত ধরে বলে— 'সন্ন্যাসী, ঠিক করে বল ত, আমি বাঁচব কি না? দেখ, আমার কাছে গোপন করো না। যদি আমি আর না বাঁচি, তা হলে তোমায় একটা

কথা বলে যাব। সে কথা তোমাকে বলবার আগে আমি মরে গেলে আমার ক্ষোভের আর সীমা থাকবে না। সে দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না। বল বল আমি কি আর বাঁচব না?"

"ললিতার সে অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। বলে ফেল্লুম— 'তোমার অবস্থা খুবই খারাপ, যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে।"

"আমার কথা শুনে সে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে— "বড় উপকার করলে তুমি আমার। এ কথাটা আমায় না বল্‌লে মরেও আমি শান্তি পেতুম না। শুনবে সে কথা?"

"বল্, শুনি।"

"আমি তোমায় ভালবাসি।"

"এ্যাঁ! আমার সন্দেহ হলো যে, বিকারের ঝোঁকে সে বুঝি ভুল বকছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লুম— 'ললিতা, ঘুমোও তুমি। বেশী কথা কইলে'—

"ললিতা আমার কথা গ্রাহ্য না করে বলে যেতে লাগল— 'দেখ, সন্ন্যাসী, জীবনে আমার সব সাধই মিটেছে, কিন্তু আমি কখনও কারুকে ভালবাসিনি। আমার বুকে ভালবাসার যে সম্পদখানি আছে, ধনী যেমন যত্ন করে নিজের বুকের মধ্যে মহামূল্য রত্নকে আগলে রাখে, আমিও তেমনই আমার কুমারী-ধর্ম্ম দিয়ে আমার সেই ভালবাসাটিকে আগলে রেখেছিলুম— আমার স্বামীর হাতে অক্ষুণ্ণ সেই পাত্রটিকে তুলে দেবার জন্য। আজ আর সময় নেই, আমি তোমার হাতে সে রত্ন তুলে দিচ্ছি। সন্ন্যাসী, শোনো আমি তোমায় ভালবাসি।'

"আমার মনের অবস্থাটা একবার তোমরা কল্পনা করে দেখ। বাক্‌পটুতার জন্য তো তোমাদের কাছে কত প্রশংসাই না পেয়েছি। কিন্তু সেই মুমূর্ষু দু-দিনের পরিচিতির প্রেম গ্রহণ করার মত ভাষা আমি খুঁজে পেলুম না। স্তম্ভিত হয়ে তার পাশে বসে রইলুম।"

"ললিতা আবার বলতে আরম্ভ করলে— 'সন্ন্যাসী, এ দিকে ফের, আমার দিকে চাও।"

"আমি তার দিকে চাইলুম। সে বল্লে, "তুমি? তুমি আমায় ভালবাস?"

"আমি কি বলব। তাকে ভালবাসার কোনও কল্পনা তখনও পর্য্যন্ত স্বপ্নেও আমার মনের মধ্যে উঁকি দেয়নি। কিন্তু তার জীবন-মরণের মাঝে সেই ক্ষীণ ব্যবধানটুকু প্রত্যাখ্যানের লজ্জা আর দুঃখে ভরিয়ে দেবার মত সত্যনিষ্ঠা আমার নেই। বলে ফেল্লুম— 'বাসি ললিতা, বাসি। তুমি কি বুঝতে পার না?'

"বলেই মনে হলো, মিথ্যা কথা বলতে শেখা আমার সার্থক হয়েছে। মিথ্যার অতখানি সদ্ব্যবহার করবার অবসর বোধ হয়, জীবনে আর পাব না।

"ললিতা আমার কথা শুনে বল্লে,— 'বুঝতে পারি। সেই জন্যই ত তোমাকে ভালবেসেছি।'

"আমি বল্লুম, 'ললিতা, গত জন্মে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

ছিল।' সে-বার বোধ হয়, আমি তোমাকে এমনি করে ফাঁকি দিয়েছিলুম, এ জন্মে তুমি আমায় ফাঁকি দিলে।'

"ললিতা একটু হেসে বল্লে, 'শোধবোধ হয়ে গেল। এবার যখন মিশব, তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না। যাবার আগে'—

"ললিতা আর বলতে পারলে না। আমি নীচু হয়ে তার জ্বরতপ্ত অধরে তার কুমারী জীবনে প্রথম প্রেমের চুম্বন এঁকে দিলুম।

"ললিতা জিজ্ঞাসা কল্লে— 'তোমার নাম কি সন্ন্যাসী?'

"আশ্চর্য্য। এত দিন সে আমার নাম পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেনি। আমাকে সন্ন্যাসী বলেই ডাক্‌ত। আমি বল্লুম— আমার নাম দীনবন্ধু।"

"সে বললে, 'না না, ও নাম ভাল না। ও আবার কি নাম!"

"বল্লুম,' তা হলে তুমি আমার একটি নাম দাও।"

"ললিতা আবার সেই ম্লান হাসি হেসে বললে— 'সেই বেশ। তোমার নাম তরুণ! কেমন?"

"আমার হাসি পেল, বল্লুম,' তোমার যে নাম ইচ্ছা, সেই নাম ধরেই আমায় ডেকো।"

"সে বললে, দূর, তোমার নাম বুঝি আমায় ধরতে আছে?"

"একটু চুপ করে সে আবার বললে— ওগো, তোমার পায়ের ধূলো আমার মাথায় একটু দাও না।"

"তাই আমি দিলুম। একটু হাঁপিয়ে গিয়ে সে বললে— ওগো আর এক বার— ওগো আর একবার।"

"আবার তার তৃষিত অধর চুম্বনে ভরিয়ে দিতে হলো। চুমুতে তার যেন সাধ মিটছিল না। সে আমার হাত একখানা চেপে ধরে রইল। সেই অবস্থাতে আমাদের প্রথম প্রেমের বাসর-রাত্রি অবসান হলো।

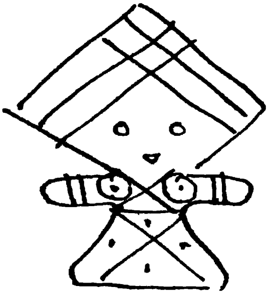
"পরদিন সন্ধ্যার সময় ললিতা ইহলোক থেকে বিদায় নিলে।"

দীনবন্ধুর কাহিনী শুনিয়া আমরা নীরব রহিলাম। মহেন্দ্র দাদা জিজ্ঞাসা করিল,— "গেরুয়া ছাড়লে কোথায়?"

দীনবন্ধু বলিল, "শ্মশানঘাটে স্নান করে নূতন কাপড় পরবার সময় গঙ্গার জলে গেরুয়া ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।"

মোমের পুতুল

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



ইউনুস একেবারে কবিপ্রকৃতির। সে অনেক গুণে গুণী। সে শৈশবে ছড়া কবিতা যা শুনতো, তাই মুখস্থ করে সুরে সুরে বলতে পারতো, কৈশোর থেকেই সে নিজেই পদ্য রচনা করতে আরম্ভ করে। শৈশবে সে সুন্দর গান মুগ্ধ হয়ে শুনতো এবং একবার দুইবার শুনেই সেই গানের কথা ও সুর আয়ত্ত করে পাখীর মত সর্ব্বক্ষণই গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতো— গান গাওয়াই ছিল তার খেলার অনুসঙ্গী কর্ম্ম। তার খেলাতেও সে শিল্প-স্বভাবের পরিচয় দিত— সে মাটি দিয়ে সুন্দর পুতুল গড়তো, আর কাগজ-পেন্‌সিল হাতের কাছে পেলেই স্বাভাবিক অশিক্ষিত-পটুতায় সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকত। শিমের পাতার রসে সবুজ রং ; জবাফুলের রসে লাল রং, হলুদবাটা গুলে হল্‌দে রং, অপরাজিতার ফুল রগড়ে নীল রং করত। শিউলী ফুলের বোঁটা, কৃষ্ণকলি ফুল, লটকন্নার বীজ প্রভৃতি থেকেও যে বিভিন্ন আভার রং পাওয়া যায়, তা সে শৈশবেই আবিষ্কার করেছিল ; আর আবিষ্কার করেছিল যে চুণে-হলুদে অথবা চুণে-খয়েরে মিশালে একটি ভিন্ন প্রকৃতির লোহিতাভ রং উৎপন্ন হয়, হলুদে-নীলে মিশালে সবুজ হয়, লালে-হলুদে মিশালে কমলা রং পাওয়া, এও তার জানতে বাকী ছিল না। সে সাদা কাগজের উপর কেবলমাত্র কালী দিয়ে দোয়েল পাখীর যে ছবি আঁকত, তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখে লোক চমৎকৃত হত। পুতুল গড়া আর ছবি আঁকার ঝোঁকের জন্য সে নিষ্ঠাবান শাস্ত্রবিশ্বাসী পিতার কাছে কত তিরস্কার প্রহার সহ্য করেছে, তবু তার স্বভাবজ ঝোঁক দূর হয়নি, বরং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝোঁক আর নিপুণতা বেড়েই চলেছিল।

ইউনুস গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর ঘুড়ী তৈরী করত, সে কাঁচা কলাপাতা, নারিকেল পাতা আর তাল-পাতা দিয়ে লম্বা ভেঁপু বানিয়ে তার সঙ্গীদের তাক লাগিয়ে দিত, সে কৃষ্ণকলি ফুলে আর কলমী শাকের ডাঁটার নলে বাঁশী বানিয়ে তার চেয়ে বয়সে ছোট ছেলেমেয়েদের খুশী করে তুলত। তার মনটা সর্ব্বদাই খুঁজত— কোন্ সামান্য উপকরণ থেকে কি সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করে তুলবে।

একবার মহরমের মেলায় গিয়ে ইউনুস একটা বাঁশী কিনে আনলে। আট দশ দিন সেই বাঁশীটার ছিদ্রমুখে ফু দিয়ে দিয়ে সে প্যাঁপোঁ করে বেড়াল। কিন্তু তার পর ক্রমে ক্রমে সেই বাঁশীর কণ্ঠ থেকে যে সুর ও সঙ্গীত বাহির করতে লাগল, তা শুনে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। সবাই বলাবলি করত, ছেলেটা বাঁচলে ওস্তাদ হবে।

ইউনুস ধনীর পুত্র। তার পিতার বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, অল্প জমিদারী-তালুকও আছে। পুত্রের মন এত বিভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও আকৃষ্ট হতে দেখে তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন যে, ইউনুসের লেখাপড়া শিক্ষায় বিশেষ ব্যঘাত ঘটবে। কিন্তু ইউনুস লেখাপড়া আরম্ভ করেই অসাধারণ মেধার ও মনোযোগের পরিচয় দিয়ে পিতাকে ও শিক্ষকদিগকে চমৎকৃত করে দিলে। সে যখন যে কাজ করে, তখন তাতেই তন্ময় হয়ে নির্বিষ্ট হয়ে যায়, যে কাজে সে হাত দেয়, তাকেই সে সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করে। তাই তার হাতের লেখাও মুক্তার মত সুন্দর হয়ে উঠল।

ইউনুস বি. এ. পাশ করে ইংরাজীতে এম. এ. পড়বে বলে ইউনিভারসিটিতে ভর্ত্তি হয়েছে। এর মধ্যেই সে আট-দশটা ভাষা শিখেছে— সেই সেই মূল ভাষাতে সেই সব ভাষার কবিদের কাব্যের রসাস্বাদন করবে বলে। ফার্সী আর সংস্কৃত, ফ্রেঞ্চ আর জার্মান তার কাছে সমাদর লাভ করে। সে এখন নিজেও কবিতা লিখে প্রকৃত কবি বলে সুখ্যাতি অর্জন করেছে, সে নিজের রচিত গজল গেয়ে বড় বড় মজলীস মাতিয়ে তোলে, বেহালা, এসরাজ, সেতার আর সুরবাহারের তারে তারে তার হাতের আঙ্গুল অবলীলায় সমান খেলে এবং সে নিজের মনের দরদ দিয়ে যন্ত্রের বুক থেকে সঙ্গীত বাজিয়ে তোলে। তার আঁকা ছবি আর গড়া মূর্ত্তি সিমলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ আর কলকাতার শিল্প প্রদর্শনীতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদক আর প্রশংসাপত্র পেয়েছে, সে ছবি আর মূর্ত্তি বেচে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জনও করেছে। লোকের চেহারা আকার আর মূর্ত্তি গড়ার জন্যও সে ডাক পাচ্ছে, দুই-একটা বায়নাও সে নিতে আরম্ভ করেছে। আর্টিষ্টিক ফটোগ্রাফীতেও সে আর্য্য চৌধুরীর প্রতিস্পর্দ্ধী।

ইউনুসকে দেখলেই মনে হয়, সে গুণী শিল্পী বটে। তার বর্ণ গৌর, চেহারা দীর্ঘ, ঋজু সুশ্রী। তার মাথায় লম্বা কুঞ্চিত বাবরী চুল, তার বেশ নির্মল সুসঙ্গত সুরুচির পরিচায়ক। তাকে দেখলেই তার চেহারা ছবিটা মনের উপর ছাপ রেখে যায়, সাধারণের সামান্যতার মধ্যে সে হারিয়ে যায় না।

ইউনিভার্সিটিতে তেতালায় ইউনুসদের ক্লাস। ইউনুস সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলায় উঠে না, সে লিফটে চড়ে উঠা-নাম করে। একদিন সে তেতলায় লিফ্‌টের সুড়ঙ্গের মুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লিফ্‌ট আসবার প্রতীক্ষা করছে। লিফ্‌ট চৌতলে দাঁড়িয়ে যাত্রী গ্রহণ করছে। এখনই নেমে আসবে। একতলা থেকে উর্দ্ধগামী যাত্রীরা লিফ্‌টের ডাক-ঘন্টার চাবী টিপে লিফ্‌ট-চালককে আহ্বান-সঙ্কেত করলে। ইলেক্‌ট্রিক ঘন্টা কর্‌রয়্ করে বেজে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই লিফটের দরজা বন্ধ করার ঝনাৎ ও লিফ্‌ট নামার সোঁ সোঁ শব্দ ইউনুস শুনতে পেল। ইউনুস দরজার লোহার রেলিং ছেড়ে দরজার সামনের দিকে একটু পেছু হঠে দাঁড়াল। লিফ্‌ট এসে দরজার সামনে থামল। ইউনুস লিফ্‌টের খাঁচার মধ্যে দৃষ্টিপাত করবামাত্র প্রথমেই তার নজরে পড়লো একটি মেয়ে ছাত্রী, তার পরে সে দেখতে পেলে, খাঁচার মধ্যে দুই

জন অধ্যাপক ও এক জন ছাত্রও আছেন। ইউনুস খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করে ছাত্রীটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল— একবারে মেয়েটির মুখোমুখি। মেয়েটি যে ফর্সা বা সুন্দরী, তা নয়, কিন্তু তার মুখে ধী আর হ্রী মিশে তাকে এমন একটি অনিবর্বচনীয় শ্রী দান করেছে যে, তাকে দেখবামাত্রই ইউনুসের কবি-চিত্র প্রশংসায় পূর্ণ হয়ে বলে উঠলো— "বাঃ!"

লিফ্‌ট যে তখন দোতলা পেরিয়ে একতলায় পৌঁছে গেছে, তা ইউনুস জানতেই পারেনি। মেয়েটি লিফট থেকে নেমে চলে যেতে ইউনুসের জ্ঞানোদয় হলো, সকল লোক নেমে গেল ; নতুন লোক উঠচে দেখেও সে বুঝতে পারেনি যে, সে একবারে একতলায় এসে ঠেকেছে। হঠাৎ সে খাঁচার বাইরে তাকিয়ে একতলায় ঘরে চিহ্ন দেখে চেতনা লাভ করল ও তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো।

মেয়েটির মূর্ত্তি প্রথম দর্শনেই ইউনুসের মনে এমন গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে গেল যে, সমস্ত দিন শুধু তার রূপই ধ্যান করলে। পরদিন থেকে ইউনুসের চেষ্টা হল— লিফটে বা চলাফেরার পথে কোথাও একবার মেয়েটিকে দেখে মনটাকে খুশী করে নেওয়া।

ইউনুস মেয়েটির অনুসরণ করে ও অনুসন্ধান করে শীঘ্রই জেনে নিলে, মেয়েটি বাংলা ভাষায় এম. এ. পড়ে, তার নাম শুচি চট্টোপাধ্যায়। ইউনুসের মনে হল, শুচি যদি ইংরাজীতে এম. এ. পড়ত, তাহলে বেশ ভাল হত, তারা একসঙ্গে পড়ত এবং রোজ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে হতে হয়ত বা কোনদিন আলাপ করার সুযোগও জুটে যেত। কিন্তু শুচি পাঠের বিষয় পরিবর্তন করবে, এমন কোন সম্ভাবনা ত থাকবার কথা নয়, বরং সে ত বিষয় পরিবর্ত্তন করে বাঙ্গলা পড়তে পারে। কিন্তু এই ইচ্ছা তার মনে দিনের দিন যতই প্রবল হতে লাগল, ততই তার লজ্জা হতে লাগল যে, তার বন্ধুরা ও অচেনা শিক্ষক-ছাত্ররা কি ভাববে। তাকে যে লোক লোভী লোলুপ ভাববে, এই লজ্জাতেই সে মনের বাসনা দমন করে রাখলে এবং যতই আগ্রহ প্রবল হতে লাগল, ততই লজ্জা বৰ্দ্ধিত হয়ে তার আত্মসম্বরণ করে থাকায় সাহায্য করতে লাগল।

ইউনুসের মন শুচির দিকে অনুরাগে যত আকৃষ্ট হতে লাগল, সে তত শুচির সাক্ষাৎ পরিহার কবে চলতে লাগল, তাই সদাই ভয় হয়, পাছে তার কোন আচরণে তার অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে সে শুচির বিরক্তি উৎপাদন করে ফেলে, শুচির বিরক্তিভাজন হবার ভয়ে তার প্রীতিভাজন হবার চেষ্টা করতে সাহস পেত না। সে মনে ভাবত, পুরাকালের বীররা যে মেয়েকে ভালবাসত, তাকে হরণ করে আনত কেমন করে, তা ত বুঝতে পারি না, জোর জবরদস্তি করলে প্রেম, প্রণয়, প্রীতি ত ভয়ে ও বিরাগে পরিণত হয়ে যাবার কথা।

ইউনুস আজকাল লিফ্‌টে চড়া ছেড়ে দিয়েছে, সে সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলা চৌতলায় উঠা নামা করে। একদিন সে সিঁড়িতে সিঁড়িতে লঘু ক্ষিপ্র পদক্ষেপ তরতরিয়ে নীচে নেমে আসছে, সিঁড়ির বাঁক ফিরেই সে নিজের গতিবেগ সংবরণ করে পাশ কাটিয়ে মুখ নামিয়ে নীচে চলে গেল। সে নীচে গিয়ে দেখলে, সে-দিন লিফ্‌ট অচল হয়ে গেছে, সিঁড়িই আজ

সকলের অবলম্বন। ইউনুসের মনটা একসঙ্গে খুশী ও ভীত হয়ে উঠল— হয়ত বা আবার সিঁড়িতে উঠা-নামা করতে শুচির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে।

এক দিন ইউনুস বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে দেখলে, শিরাজী মৌরাজী সাহেবের ক্লাসে শুচি রয়েছে। শিরাজ দেশের মৌলবীর ক্লাশে বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ে! এই অসাধারণ দৃশ্য দেখে ইউনুসের মন আনন্দ, বিস্ময় ও কৌতূহলে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

ইউনুস খুব সাবধানে সন্ধান নিয়ে জানলে, শুচির পিতা সমরেশ চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন, সেখানে থাকতে শুচি বাল্য ও কৈশোরে উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষা বলতে পড়তে লিখতে শিখেছিল। তারপর সমরেশবাবু লক্ষ্ণৌ ছেড়ে বাঙ্গলায় চলে আসেন, এখানে এসে শুচি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিখে ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি. এ. পরীক্ষা পাশ করেছে। এখন সে বাঙ্গলায় এম. এ. পড়ছে, এবং বাঙ্গালার মূলস্বরূপ পালি ও ফার্সী অনুসঙ্গিস্বরূপ উর্দ্দু ভাষা পড়ছে।

বহু ভাষাভিজ্ঞ ইউনুসের মন বহুভাষাভিজ্ঞা শুচির প্রতি প্রীতি ও সম্ভ্রমে অধিকতর আকৃষ্ট হলো। তার কেবলই মনে হতে লাগলো, এমনই একটি সহধর্ম্মিণী যদি পাওয়া যায় ত বেশ হয়। তা হলে দুজনে মিলে বিশ্ব-সাহিত্যের সুধা-রস আস্বাদ করে আনন্দে জীবন যাপন করা যায়। জীবন মধুময় হয়ে উঠে। কিন্তু, তাদের মিলনের পথে মস্ত বড় একটা কিন্তু দুর্লংঘ্য বাধা হয় আছে— সে মুসলমান ও শুচি হিন্দু!

আর্ট একজিবিশন হবে। ইউনুসের ছবি মূর্ত্তি ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হবে বলে গৃহীত হয়েছে। এক্জিবিশন খোলার দিন ইউনুস গিয়েছে। সে একাকী দেওয়ালের গায়ে গায়ে ঝোলানো ছবি দেখে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একখানা ছবির নীচে সে চিত্রকারিণীর নাম দেখলে শুচি চট্টোপাধ্যায়। সে চমকে উঠলো। শুচি তা হলে ছবি আঁকতেও পারে। ছবিটা বেশী কিছু নয়, কালো মেঘে আচ্ছন্ন আকাশাংশের পটভূমিকার উপর একটা বাঁশ-ঝাড় আসন্ন বর্ষণের আশায় অপেক্ষা করছে এবং মরকত মণির ন্যায় স্নিগ্ধ-সবুজ বাঁশ গাছের ডগায় একটা নীলকণ্ঠ পাখী একখানা পাখা এক পা দিয়ে ছড়িয়ে রেখে ঘাড় গুঁজে গা চুলকাচ্ছে! এই ছবিটির কাছে ইউনুস আটকে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে এই ছবিখানাকে দেখলে। বাঁশগাছের নয়নরঞ্জন, সবুজ, মেঘের অঞ্জন আর নীলকণ্ঠের নীলাভা ইউনুসের মনকে রঞ্জিত করে তুলতে লাগল। যখন অপর কয়েক জন ইংরাজ সাহেব মেম দর্শক সেই ছবিখানির কাছে এলো, তখন ইউনুসের হুঁস হলো। সে তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করে সরে চলে গেল এবং এক্জিবিশনের সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে বললে, "৯৯ নম্বর ছবিখানা আমি কিন্‌লাম, ওঠা আর কাউকে বিক্রী করবেন না।"

সেক্রেটারী বললে— "না. খাতায় আপনার নামে বিক্রী লিখে রাখছি, আর ছবির গায়েও টিকিট লাগিয়ে দিচ্ছি Sold to......"

ইউনুস তাড়াতাড়ি বললে, কাকে বিক্রী করা হলো, না-ই লিখলেন? কেবল জানিয়ে দিন যে, বিক্রী হয়ে গেছে।"

সেক্রেটারী স্বীকৃত হয়ে বললে— "আচ্ছা"।

এক্জিবিশন শেষ হয়ে গেলে ইউনুস শুচির ছবিখানি ৫০ টাকা দিয়ে কিনে এনে নিজের শয্যার শিয়রে টাঙিয়ে রেখে দিল।

মেদিনীপুরে বন্যা হয়েছে। বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য বীণাপাণি সম্মিলনীর মহিলারা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজা অভিনয় করবেন। এই সংবাদে শহরময় হুলস্থুল পড়ে গেছে। বইখানার মধ্যে কি আছে, না জেনেই শুচিবাইগ্রস্থ বাঙ্গলার অনেক খবরের কাগজে নিন্দা-গালাগালির ছড়াছড়ি হচ্ছে, সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সাহিত্য নগরের কোন কোন স্বাস্থ্যরক্ষক যে ধূলো উড়িয়েছেন, তাতে সাহিত্যের পদ্মাসনে দেবী সরস্বতীর দম বন্ধ হয়ে স্বাস্থ্যহানী ঘটবার উপক্রম হয়েছে। নটী নাম দেখেই যেমন এক দল লোক কবির ও অভিনয়কারিণী মহিলাদের রুচির নিন্দায় নগরবাসীর কান ঝালাপালা করে তুলেছে, তেমনই অপর দিকে একদল লোক ভদ্রমহিলাদের নটীর পূজা অভিনয় দেখবার জন্য কৌতুকে আগ্রহে মেতে উঠেছে। রুচিবাগীশের গালাগালি যত উচ্চ সপ্তকে উঠছে, কুরুচিগ্রস্তের আগ্রহ ততই বেড়ে চলেছে। এক হপ্তার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে গেল।

ইউনুস নটীর পূজা বইখানি পড়েছে। দু-চারটা গান সে অপরের কাছে শুনে বা স্বরলিপি দেখে গাইতে শিখেছে। তাই ইউনুস কেবল সাহিত্য-সৌন্দর্য্য ও কলাশিল্পের মাধুর্য্য উপভোগ করবার জন্য একখানি টিকিট কিনেছে।

অভিনয়ের রজনীতে রঙ্গশালার যবিনিকা উন্মোচিত হলো। ইউনুস সবিস্ময়ে আনন্দে দেখল, নটী সেজেছে শুচি! ভিক্ষুণী শ্রীমতীর মর্ম্ম নিজের অন্তরে উপলব্ধি করে শুচির পবিত্রভাবদ্যোতক সাবলীল ললিত নৃত্য অতীন্দ্রিয় মধুর সুরের সঙ্গীত সকল দর্শক শ্রোতাকে মুগ্ধ করে দিল, ইউনুস শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, অনুরাগে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেল। শুচির নৃত্য দেখে তার মনে হলো, এ ত মানুষের অঙ্গভঙ্গী মাত্র নয়, এ যেন সুকবির পদ্য-বন্ধের অনবদ্য ছন্দ, শুচির সঙ্গীত শুনে তার মনে হল, এ যেন পাখীর কণ্ঠের কাকলীর ও ঝঙ্কারের সঙ্গে ওস্তাদের হাতে-বাঁধা সপ্ততন্ত্রী বীণার মূর্চ্ছনার সম্মিলনে অতীন্দ্রিয় মাধুর্য্যবর্ষণ। শ্রীমতীরূপিণী শুচির মুখের মাধুরী, শান্তশ্রী ও ভক্তিতন্ময়তা তাকে অতি অতীত ঐতিহাসিক যুগে উপনীত করে কেবলমাত্র অবাস্তব কল্পনায় পরিণত করেছে। ইউনুসের কেবলই মনে হতে লাগল এই ত তার উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী সমধর্মিণী— রূপে, রসে, লীলার তার জীবনকে সুধাস্বাদ দিতে সমর্থ।

অভিনয় সাঙ্গ হল। ইউনুস স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বাসায় ফিরে গেল, সমস্ত রাত্রি তার চোখের সামনে শুচির তনুতরঙ্গ আর মর্মের মধ্যে স্বরলহরী খেলে বেড়াতে লাগল।

এইদিন থেকে শুচি আর ইউনুসের কাছে মানবীমাত্র রইল না, সে রসামৃত মূর্ত্তি ভাবমাধুর্য্যময়ী অর্দ্ধেক মানবী ও অর্দ্ধেক কল্পনা হয়ে উঠল। সৌন্দর্য্যরূপা লক্ষ্মী ও ভাবরূপা সরস্বতী একত্র রূপ ধরে তার মানস-সরোবরে আনন্দে বিকশিত প্রেমপদ্মের উপর অধিষ্ঠিত হল, কবিশিল্পী ইউনুসের মানস-সরসীর রস-হিল্লোল শুচির চরণ-নিয়ে থই-থই করতে লাগল।

শুচি যতই ইউনুসের চিত্র অনুরাগ-রঞ্জিত করে তুলতে লাগল, তার ততই ভয় হতে লাগল যে শুচির হিন্দু পিতা হয়ত কন্যাকে মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করতে চাইবেন না। সে মুসলমান, বিধর্ম্মী হওয়া ছাড়া সে ত দেশের কোনও যুবকের চেয়ে কোনও বিষয়ে হীন নয়, সে সুরুপ, সুদর্শন, সুচরিত্র, কবিত্বে আর শিল্পকলায় নাম-করা, লেখাপড়ার উত্তম এবং ধনী। এত গুণ-সমাবেশ কি কেবল ধর্ম্মের নাম ভেদে অগ্রাহ্য হয়ে যাবে?

ইউনুসের এক একবার মনে হতে লাগল, শুচির সঙ্গে সে যদি কোনও সুযোগে পরিচয় ও আলাপ করতে পারে, তা হলে শুচি হয়ত বা তার রূপ, গুণ আর প্রেমের প্রগাঢ়তাও শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের পরিচয় পেয়ে তার প্রতি অনুরক্ত ও করুণা-পরবশ হতে পারে।

এই সম্ভাবনা মনে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনুস আত্মসংশোধন ও আত্মোন্নতি করতে মনোনিবেশ করলে। তার চরিত্র, আচরণ, বাক্য সংযত ও শুচি-তর হয়ে উঠতে লাগল, তার কবিতা ও চিত্র হৃদয়াবেগে সুন্দরতর হয়ে উঠল, সে লেখাপড়ায় অবহিত চিত্ত হল। ইউনুস সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে নিখুঁৎ করে শুচির গ্রহণযোগ্য করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হল।

কিন্তু কিছুতেই সাহস করে ইউনুস শুচির সঙ্গে পরিচয় করতে পারছিল না। পরিচয় করবার সামান্যই সুযোগ তার কাছে আসে, কিন্তু যে অল্প ক্ষীণ সুযোগ জোটে, তাও সে তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করতে পারে না, দ্বিধারিত হয়ে ইতস্ততঃ করতে করতে সেই সুযোগ সে হারিয়ে ফেলে। সে শুচির সঙ্গে আলাপের উপক্রম করলেই তার মনে হয়— যদি শুচি ভাগ্যক্রমে আমাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে, তার পিতা মাতার আপত্তি আমাদের দুজনের মিলনের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ইচ্ছা অপূর্ত্তির বেদনায় শুচির মন ত ক্লিষ্ট হবে। যাতে শুচি কস্ট পেতে পারে, এমন কায ত আমি নিজে নিজের সুখ ত তুচ্ছ, জীবন রক্ষার জন্যও করতে পারব না।

এই সঙ্কল্প যখন ইউনুসের চিত্তে দৃঢ় মুদ্রিত হয়ে গেল, তখন সে স্থির করলে, আগে সে শুচির পিতাব সম্মতি নিতে চেষ্টা করবে এবং তাঁর সম্মতি পেলে পরে শুচির পাণিপ্রার্থনা করবে।

ইউনুস সন্ধান নিয়ে জানলে, শুচির পিতা সমরেশবাবু ব্রাহ্ম। এই সংবাদ জেনে ইউনুসের চিত্ত আশান্বিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল, যাক্‌, তা হলে শুচিকে মুসলমানের হাতে সম্প্রদান করতে শুচির পিতার আপত্তি হবে না।

ইউনুস খাঁটি বাঙ্গালীর বেশে সজ্জিত হয়ে সমরেশবাবুর সঙ্গে একাই দেখা করতে গেল। সমরেশবাবু বিকেলবেলা তাঁর বাইরের ঘরে বসে উপনিষদ পড়ছিলেন, মুখ তুলে

ইউনুসের দিকে তাকালেন। ইউনুস যুক্ত হস্তে উপর মস্তক নত করে সমরেশবাবুকে নমস্কার করলে। তার মাথার লম্বা লম্বা চুল মুখের দিকে ঝুলে পড়লো, সে মাথা তুলে চুল সরিয়ে দিয়ে স্মিত, অপ্রভিত মুখে সমরেশবাবুর সম্ভাষণের প্রতীক্ষায় দাঁড়াল। সমরেশবাবু হাতের বইখানা বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রেখে স্নিগ্ধ স্বরে ডাকলেন— বাবা, এসো—কাকে খুঁজছ।

ইউনুস সঙ্কোচের সহিত ধীর স্বরে বললে— আমি আপনার কাছেই একটু কার্যের জন্য এসেছি।

সমরেশবাবু স্নেহকোমল স্বরে বললেন— এসো, বোসো।

ইউনুস এমন সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে একবার ভড়কে গেল : সমরেশবাবুর অসম্মতির ভয় ও নিজের বিবাহের প্রস্তাব করার লজ্জা ইউনুসের সঞ্চিত সাহসটুকু লুপ্ত করে ফেললে। সে শুষ্ক মুখ লাল করে মাথা হেঁট করে বসে রইল। তাব অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো, সে কোনমতে উঠে পালাতে পাবলে বাঁচতো। ক্ষণকাল নীরবে নতনেত্রে বসে থেকে তার যেই মনে হল, সমরেশ বাবু উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন, তখন সে মরিয়া হয়ে মুখ তুলে স্খলিত বচনে বললে, আমি আপনাব কন্যার বিবাহের সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব এনেছিলাম।

সমরেশবাবু কৌতূহলে উৎসুক চোখ প্রশান্ত, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি বললেন ও! তা আমার মেয়ে ত এখন এম. এ. পড়ছে।

ইউনুস আবার মাথা নত করে বলল— কিন্তু কোনও মোটামুটি রকমের সৎপাত্র তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে যদি প্রার্থনা করে?

সমরেশবাবু চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন— পাত্রটির পরিচয় জানতে পারি কি?

ইউনুস একবার মুখ তুলে সমরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নত করে বলতে লাগল, সে ইংরাজীতে এম. এ. পড়ে। অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছে, পাঁচ-সাতটা ভাষার সঙ্গে তার অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে, কবি, চিত্রকার, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞ বলে তার একটু নাম-ডাকও আছে, লোক তাকে সুশীল সচ্চরিত্রও বলে, তাদের জমিদারী আর ব্যবসায়ে মিলে বাৎসরিক আয় সম্ভব আশী হাজির টাকা হবে।

সমরেশবাবু প্রফুল্ল হয়ে বললেন, এ ত বাস্তবিকই সৎপাত্র।

ইউনুস সমরেশবাবুর কথয় আশান্বিত ও উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগল, এক ইউনিভাসিটিতে আপনার কন্যার সঙ্গে সে পড়ে, তারপর নটীর পূজায় তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে—

সমরেশবাবু ইউনুসকে কথা সমাপ্ত না করতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— তা হলে সেই ছেলেটির সঙ্গে আমার মেয়ের পরিচয় আছে?

ইউনুস বললে— 'না। আপনার সম্মতি না নিয়ে সে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করতে সাহস করেনি।'

সমরেশবাবু খুশী হয়ে ঈষৎ হাস্য করে বললেন— বাবা, সেই সৎপাত্র কি তুমিই

ইউনুসের মুখ লজ্জায়, আনন্দে লাল হয়ে উঠলো। সে নতমুখেই চুপ করে রইল

সমরেশবাবু বলতে লাগলেন, কবি চিত্রকর বলে তোমার সুখ্যাতি যদি দেশে জান হয়ে থাকে, তা হলে ত তোমার নাম বললেই আমি চিনতে পারব।

ইউনুস শঙ্কাকুল দৃষ্টি তুলে সমরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললে— আমা নাম ইউনুস আমিল চৌধুরী।

উড়ো মেঘ সূর্য্যের তলা দিয়ে ভেসে গেলে দিবালোক যেমন ক্ষণকালের জন্য ম্লা হয়ে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সমরেশবাবুর মুখের উপর দিয়ে তেমনই একটা ছায়া ভে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রফুল্ল হয়ে বললেন, তুমি ইউনুস! তোমার মত সৎপাত্রের হাত কন্যা সম্প্রদান করতে পারলে ত সুখের হতো—কিন্তু—

ইউনুস সমরেশবাবুর বাক্য-সমাপ্তিতে দ্বিধা ও সঙ্কোচ দেখে বললেন— কিন্তু আ মুসলমান, আপনি ব্রাহ্ম, আপনার কাছে ত কোনও ধর্ম্মমতই ঘৃণা নয়?

সমরেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন— না না, ধর্ম্ম কখনও ঘৃণ্য হতে পারে? ত ভিন্ন সমাজের রুচি, আচার, আচরণ ভিন্ন হয়, তাতে আবাল্যের সংস্কারে বাধা লাগে এব সেটা পূর্ণমিলনেরও বাধা হয়। তা ছাড়া মুসলমানের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিলে আমাদে হিন্দু আত্মীয়-স্বজনরা ক্ষুব্ধ হবে, আমাদের নিন্দা করবে।

ইউনুস ক্ষণকাল চুপ করে বসে থেকে চট করে উঠে দাঁড়াল এবং পূর্ব্বের ন্যায় অ বিনীত ভাবে নমস্কার করে বললে— এই আমার কার্ড রইল, যদি ভেবে-চিন্তে আমাক কোন খবর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, জানাবেন।

ইউনুস সমরেশবাবুর সামনে সসম্ভ্রমে একখানা নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড রেখে দি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ইউনুস দরজার কাছে যেতেই একখানা ট্যাক্সি গাড়ী এসে গতি মন্দ করলে এবং এ জন কালো বেঁটে মোটা লোক রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে ইউনুসকে জিজ্ঞাসা করলে হ্যাঁ মশাই, এটা কি সমরেশবাবুর বাড়ী?

ইউনুস মাথা নেড়ে বলল— হ্যাঁ।

— তিনি বাড়ীতে আছেন?

— আছেন।

ট্যাক্সি থামলেই সেই লোকটি ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে ইউনুসকে বললেন আপ একটু কষ্ট করে তাঁকে আমার এই কার্ডখানা দিতে পাবেন?

ইউনুস তার সামনে অগ্রসর করে ধরা কার্ডের উপর দেখল লেখা হয়েছে— বাঁশীমোহ বন্দ্যোপাধ্যায়, হার্ডওয়ার অ্যাণ্ড টিম্বার মার্চ্যান্ট, ঢাকা।

ইউনুস কার্ড না নিয়ে বললে আমি এ বাড়ীর লোক নই, সমরেশবাবু এপাশের ঘরে একলা আছেন, আপনি যান।

ইউনুস দরজা ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ল এবং বাঁশীমোহন সমরেশবাবুর সদর দরজা পার হয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকল।

ইউনুস বাঁশীমোহনের পরিত্যাক্ত ট্যাক্সিখানায় চড়ে বসে বললে— ময়দানে চল, ময়দানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাওয়াও। তারপর সে গাড়ীর উপর এলিয়ে পড়ে চিন্তার ও বিফলতার বেদনাব মধ্যে তলিয়ে গেল।

ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের মধ্যে আজকাল আলোচনার বিষয একটিমাত্র— সেটি হচ্ছে নটীব পূজার অভিনয়ে শুচির নৃত্য-গীত।

ইউনুস ক্লাসে গিয়ে বসেছে। তখনও অধ্যাপক ঘরে আসেননি। ছেলেরা শুচির কথা আলোচনা করছে। ইউনুসের সেই আলোচনা শুনতে ইচ্ছাও কবছে, আবার পবিত্র পদার্থকে যতখানি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম নিয়ে স্পর্শ করতে হয়, তার অভাবের সম্ভাবনায় সে সেই দিকে ভাল করে কান দিতেও পারছিল না। হঠাৎ তাব কাণে এক জনের এই কথাটা এসে আঘাত করে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলে— শেষকালে একটা বাঁশীমোহনের সঙ্গে শুচিস্মিতার বিয়ে হতে চল্‌লো! আহা রে! বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা!

— আচ্ছা, ঐ বেঁশেটা কে রে?

— ঢাকাই বাঙ্গাল! লোহা-লক্কড় আর কাঠ-কাঠবাব কারবার আছে। টাকার কুমীর! টাকার জোরেই এমন খাসা মেয়েটাকে বাগিয়েছে! নইলে চেহারায় ও হোঁদল-কুৎকুৎ, আর বিদ্যায় ত গডাঢর চণ্ডর!

— ওকে আমি খুব জানি। ও আমাদের সঙ্গে পড়তো। আই. এ, পাস করতে না পেরে দ্যাশে গিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বেশ দু'পয়সা করেছে।

লোকটার cheek আছে! সটান গিয়ে মেয়ের বাপকে বললে— আপনার মেয়ের নাচ-গান আমার মন মুগ্ধ করেছে, আমি তাকে বিয়ে করব। বাপ অমনি রাজী।

কিন্তু শুচি কেমন করে রাজী হলো? ঘেন্না করলে না যে unidiomatic চেহারা?

— সবর্বদোষো হরেৎ টাকা। বুঝলে হে?

— আমরা এত লোক ছিলাম, কাউকে বেছে নিয়ে স্বয়ংবরা হলেও এর চেয়ে ভাল হত।

— বিয়ে হয়ে গেলে পরে স্বয়ংবরা হবে।

— কবে বিয়ে?

— চৌদ্দদিনের নোটিশ দিয়ে তবে ত ব্রাহ্ম বিয়ে হবে। ২৮শে এপ্রিল বিয়ের দিন স্থির হয়েছে।

ইউনুস আর শুনতে পারলে না। তার সর্ব্বাঙ্গ ঝিমঝিম করতে লাগল, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। সে তাড়াতাড়ি বই নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

একজন সহপাঠী জিজ্ঞাসা করলে— আপনি চলে যাচ্ছেন?

তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার সে জিজ্ঞাসা করলে— আপনার অসুখ হয়েছে?

ইউনুস স্পষ্ট করে "হ্যাঁ" বলে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

*　　　*　　　*　　　*

শুচির বিয়ে হয়ে গেছে। সে তার স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় এসেছে। বাঁশীমোহনের বাড়ী ফরাসগঞ্জে।

শুচি কলকাতা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউনুসও লেখা-পড়া আর কলকাতা দুই-ই ছেড়েছে, সে-ও শুচিকে অনুগমন করে ঢাকায় এসে উপস্থিত হয়েছে। ফরাসগঞ্জে বাঁশীমোহনের বাড়ীর ঠিক সামনে, রাস্তার ওপারে একখানা বাড়ী সে ভাড়া নিয়েছে। সেই বাড়ীতে যে লোক ছিল, তাকে গিয়ে সে বললে, আমি স্বপ্ন দেখেছি, এই বাড়ীতে না থাকলে আমি দু' দিনেই বুক ফেটে মরে যাব, অতএব আমাকে এই বাড়ী হয় ভাড়া দিন, নয় বিক্রী করুন, আপনার যত টাকা চাই, আমি তাই দেব, দ্বিরুক্তি করব না। আমাকে বিশ্বাস না হয়, আমি প্রত্যেক মাসের টাকা আপনাকে আগাম গুণে দেব।

বাড়ীওয়ালা মনে করলে লোকটা পাগল। সে ইউনুসকে ভাগিয়ে দেবার জন্য বললে— এ বাড়ী আমি এক লাখ টাকা পেলে বিক্রী করতে পারি, আর মাসে পাঁচ শো টাকা পেলে ভাড়া দিতে পারি।

ইউনুস খুশী হয়ে বললে— আপনার অনুগ্রহ যে এত সহজে পাব, তা মনে করিনি। আমি এই বাড়িটি কিনবো, যত দিন না বাড়ী বিক্রীর লেখাপড়া শেষ হয় কেনা-বেচা চুকে যাচ্ছে, তত দিন আমি আপনাকে ভাড়া দেব। আপনি দয়া করে শীগগির বাড়ীটা আমাকে ছেড়ে দেবেন, আজ যদি পারেন ত কালকের জন্যে দেরী করবেন না। বুঝছেন ত স্বপ্নাদেশ।

এই বলে ইউনুস পকেট থেকে মানি-ব্যাগ বার করে পাঁচশো টাকার নোট গুণে দিতে লাগল।

বাড়ীওয়ালা ত অবাক্। যে বাড়ীটার ভাড়া পঞ্চাশ টাকাও হবে না, তার জন্য অনায়াসে পাঁচ পাঁচশো গুনে দিচ্ছে! লোকটা নিশ্চয় বদ্ধ পাগল!

বাড়ীওয়ালা ইউনুসকে বললে— দেখুন, পৈতৃক ভিটেটা বিক্রী করতে মন সরে না। আপনি যদি বেশী দিন থাকেন. তাহলে ভাড়া কিছু কম-সম করে আপনাকে বাড়ী ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করি।

ইউনুস বললে— এ বাড়ী আমার চাই, আর যত দিন আমি বেঁচে থাকব, তত দিন এ বাড়ী থেকে নড়বো না। শুনলেন ত আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একজন ফকীর আমাকে বলছে যে, এই বাড়ীতে আমি না থাকলে দু'দিনে বুক ফেটে মরে যাব। নইলে আমি কলকাতায় এম. এ. পড়তাম, আপনার বাড়ীর খবর আমি জানব কেমন করে বলুন?

বাড়ীওয়ালার লোভের সঙ্গে ভয়ও হলো— স্বপ্ন আর দৈবাদেশের ব্যাপার, বেশী ঠকালে যদি কিছু হানি হয়,— তাই সে বললে— তাহ'লে আপনি মাসে তিন শো টাকা করেই ভাড়া দেবেন, কিন্তু ভাড়াটা আগাম দিতে হবে।

ইউনুস আনন্দিত হয়ে বললে— আপনার মত নির্লোভ ভদ্রলোক আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। আপনার কাছে আমি চির-কেনা হয়ে রইলাম। আমার জীবন-মরণের ব্যাপার, আপনি হাজার টাকা চাইলেও আমাকে দিতে হত, দেবার সঙ্গতি যখন ভগবান দিয়েছেন—

পরদিন থেকে ইউনুস সেই বাড়ীতে বাস করতে লাগল। সে সমস্ত দিন জানালার কাছে বসে থাকে, আর সামনের খোলা জানালাগুলোব দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায়— যদি কোথাও কোনও ফাঁকে শুচিকে চলতে-ফিরতে দেখতে পায়। সে জানলায় ক্যামেরা পেতে বসে থাকে আর শুচির দেখা পেলেই ক্যামেরার চকিত দৃষ্টি সেই দিকে পেতে ক্যামেরার বুকের ভিতর শুচির ছবি তুলে নেয়। কোনও দিন বা সে জানলার কাছে ছবি-আঁকার কাঠামো ইজেল পেতে বসে, শুচিকে দেখে তুলি দিয়ে রং বুলিয়ে বুলিযে তার ছবি আঁকে। এমনই করে শুচির নানা অবস্থার ছবি তার অবস্থানের নানা দিক থেকে তুলে তুলে ইউনুস তার বাক্স-তোরঙ্গ বোঝাই করে ফেলার ঐকান্তিক সাধনায় নিমগ্ন হয়ে গেল। তার ভারী ইচ্ছা করে, শুচির ছবিগুলি দেওয়ালময় টানিযে রাখে, আর যখন যে দিকে চোখ ফিরায়, শুচির চেহারাই তার চোখের ভিতর দিয়ে বুকেব মধ্যে ফুটে উঠে। কিন্তু সে তাব ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারে না, পাছে তার একমাত্র চাকরাণী আসিয়ার মা তার ছবি দেখে লোকের কাছে গল্প করে বেড়ায়, পাছে লোক শুচির চরিত্রে দোষারোপ করে, এই তাব মহৎ ভয়। ইউনুস যখন ফটো তোলে কিংবা ছবি আঁকে, তখন সে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে, যাতে আসিয়ার মা তার ত্রি-সীমানায় না আসতে পারে। ইউনুস শুচির ছবি আর দূর থেকে তার আবছায়া মূর্ত্তি দেখে দেখে একটি মূর্ত্তি গঠন করছে, সে মৃন্ময়ী মূর্ত্তির গায়ে ভিজা কাপড় জড়িয়ে রেখে দেয় ; আসিয়াব মা বুঝতে পারে না যে, সেটা কার মূর্ত্তি। কিন্তু ইউনুস আসিয়ার মার কাছে থেকে শুচির প্রতি তার অনুরাগ লুকিয়ে রাখলেও শুচির কাছ থেকে তা গোপন করতে পারেনি। শুচিকে দেখতে পেলেই ইউনুসের মুখ চোখ উজ্জ্বল প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, তার সবর্ব-শরীরে আনন্দোল্লাসের হিল্লোল খেলতে থাকে, এ সংবাদটা শুচির দৃষ্টিতে অনেকবারই ধরা পড়েছে।

একদিন শুচি তার স্বামীকে বললে— সামনের বাড়ীর ঐ লোকটা রাত-দিন আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

বাঁশীমোহন খুশী হয়ে হেসে বললে— ও যদি না দেখত, তা হলে ওকে ডেকে বলতাম—

বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-চকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গানানং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোহাসি।।

লোকটার সৌন্দর্য্য-বোধ আছে বলতে হবে।

শুচি স্বামীর হিংসাশূন্য অনাবিল প্রীতির পরিচয় পেয়ে সুখী হয়ে বললেন— লোকটাকে আমি এর আগে কোথাও যেন দেখেছি মনে হয়।

বাঁশীমাহন বলল— হয় ত ও বেচারাও নটীর পূজা দেখতে গিয়েছিল আর নটীর নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু আমি আর কাউকে তোমার পাণিগ্রহণ হবার অবসর না দিয়ে সবার আগে তোমাকে প্রার্থনা করেছিলাম এবং সেই জন্যই মহাজনবাক্য সার্থক করতে পেরেছি— উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।

শুচি সুখী হয়ে হেসে বললে— তোমার সেই ঐকান্তিক আগ্রহ দেখেই ত তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল, আমার যদি কিছু গুণ থেকে থাকে, তবে তার যথার্থ সমাদর তুমিই প্রথম করেছিলে বাবার কাছে আমাকে পাবার প্রার্থনা করে। তোমার অবাধ আগ্রহই তো আমার মনোহরণ করেছে।

তখন শুচি শুনতে পেলে, ইউনুস তার বাঁশীতে বড় করুণ সুরে কানাড়া রাগিণী আলাপ করছে।

*　　　*　　　*　　　*

বছরখানের পরে। ইউনুস রোজ বিবাহ-সভায় যাবার মত বেশ-বিন্যাশ করে বাদামতলী ষ্টীমারঘাটে যাতায়াত করে। স্টীমার অফিসে খোঁজ করে, তার নামে কোন মাল এসেছে কি না। তখনও আসেনি শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে আসে, আবার পরদিন যায়।

দিন দশেক হাঁটাহাটির পর এক দিন ইউনুস গাড়ীর মাথায় লম্বা একটা প্যাক-বাক্স চাপিয়ে প্রফুল্ল মুখে বাসায় ফিরে এলো ; বাক্সের গায়ে ফ্রান্সের আর সমুদ্রযাত্রার লেবেল আঁটা। পাঁড়া-প্রতিবেশী অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল, ফ্রান্স থেকে এর আবার কি এলো ? ইউনুস কারও সঙ্গে এ পর্য্যন্ত আলাপ করেনি, কাজেই সকলের কৌতূহল মনেই চাপা রইল।

শুচি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল— সামনের বাড়ীর ঐ মুসলমান লোকটির কি সব জিনিস এলো ফ্রান্স থেকে?

বাঁশীমোহন বললে, শুনেছি, লোকটা আর্টিষ্ট, ছবি আঁকে, মূর্ত্তি গড়ে, তারই কিছু সরঞ্জাম আনলে বোধ হয়।

শুচি কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করলে— আর্টিষ্ট? ওর নাম কি?

বাঁশীমোহন বললে— শুনেছি, ইউসুফ না কি অমনি একটা।

শুচি জিজ্ঞাসা করলে, ইউনুস না ত?

বাঁশীমোহন বললে— কে জানে ইউনুস কি ইউসুফ।

শুচি বললে, কিন্তু যে বাক্সটা এল, সেটা ঠিক কফিনের মত দেখতে। আর্টিষ্টের সরঞ্জামের বাক্স নয়।

বাঁশীমোহন হেসে বললে— তা হলে মিঞা সাহেব নিজেব কফিন নিজেই আগে থাকতে জোগাড় করে রাখলেন ; হঠাৎ রাত-বিরেতে যদি কফিনের দরকার হয়, তা হলে কোথায় খুঁজতে যাবে তাই একটা কফিন এনে রেখে দিলে।

শুচি স্বামীর রঙ্গভরা, রসিকতার কথা শুনে হাসতে লাগল ; সে আর কিছু বললে না। শুচির এবং অপর লোকেব কৌতূহল ঐখানেই ক্ষান্ত হয়ে গেল।

কিন্তু আসিয়ার মা দেখলে, তার মনিবের ঘরের দবজা সে দিন থেকে অধিকক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকে. সে দরজায় কান পেতে শোনে, তাব মনিব কাব সঙ্গে কথা বলে, হাসে। এতে আসিয়ার মার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, তার সন্দেহ হতে লাগল, তার মনিব পাগল হয়ে গেল না কি?

সেইদিন থেকে আসিয়াব মা মনিবের ঘরের দবজায় আড়ি পেতে বেড়াতে লাগল। দবজার ফাঁকে-ফুটোয় চোখ পেতে সে ঘরেব ভিতব দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই সে দেখতে পায না, বন্ধ-দরজার কপাটের উপর আবাব ঐ পর্দা টাঙ্গানো থাকে।

আসিয়ার মা পাড়া-প্রতিবেশীব কাছে দুঃখ জানিয়ে বেড়ায যে, তাব মনিব ক্রমশঃ ক্ষেপে উঠেছে, শেষে বদ্ধ পাগল না হয়ে ওঠে।

পাড়ার লোক আসিয়ার মার কথায় সহজেই প্রত্যয় করে, পাগল নইলে আব-ত্রিশ টাকার বাড়ীর জন্যে তিনশো টাকা ভাড়া দেয়?

একদিন আসিয়ার মা দরজায় ফাঁকে চোখ দিয়েই চমকে উঠল! সে দিন কপাটের উপর পর্দা টেনে দেওয়া হয়নি, সে দেখতে পেলে ইউনুসেব সামনে সামনের বাড়ীর বাবুর বৌ বসে আছে, আর ইউনুস তার পায়েব কাছে মাটিতে বসে তার মুখের দিকে চেয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, আর একবার হাসছে। আসিয়ার মার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল! বাঁশীবাবুর জরুর সঙ্গে ইউনুসেব আস্‌নাই! ইউনুসের বুকের পাটা তো কম না! ধনে-প্রাণে মজতে বসেছে! তাই ত ভাবি যে, দরজা বন্ধ করে রাত-দিন সে করে কি? কিন্তু বাঁশীবাবুর জরু আসে কোনদিক দিয়ে? এক দিনও ত তার আসা-যাওয়া চোখে পড়েনি! পুরুষের ছদ্মবেশে আসে? কিন্তু ইউনুসের কাছে ত কোন লোকই আসতে সে দেখতে পায় না।

আসিয়ার মা মহা সমস্যায় পড়ে গেল। দুশ্চিন্তায় আহার নিদ্রা বন্ধ হল। সে সতর্ক

হয়ে রইল, শুচি কোন্ ফাঁকে আসে, তা হাতে-নাতে ধরে ফেলতে হবে। আসিয়ার মা সতর্ক পাহারা দিয়েও বাড়ীতে কারও আসা-যাওয়া ধরতে পারল না। অথচ প্রত্যহই সে মনিবের ঘরের দরজায় কান পেতে শোনে, সে কার সঙ্গে কথা বলছে।

তখন আসিয়ার মা এক জন ছুতোরের কাছ থেকে একটা গিম্‌লেট চেয়ে এনে দরজায় একটা বড় ফুটো করলে এবং সেই ফুটোটায় একটা কর্কের ছিপি এঁটে রেখে দিল।

ইউনুস ঘরে দরজা বন্ধ করলেই আসিয়ার মা দরজার ফুটোর ছিপি খুলে সেইখানে এক চোখ লাগিয়ে দেখে. ইউনুস শুচির পায়ের তলায় বসে হেসে হেসে অনর্গল কথা বলছে।

আসিয়ার মা যখন দু'চার দিন পাহারা দিয়েও ইউনুসের ঘরে শুচির আসা বা যাওয়া কিছুই ধরতে পারলে না, তখন সে স্থির করলে, এর পর ইউনুসের ঘরে শুচিকে দেখলেই সে দরজা খুলিয়ে তবে ছাড়বে।

এই অবসরের জন্য আসিয়ার মাকে অধিক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হল না। সে দেখলে, ইউনুস গিয়ে ঘরে দরজা দিলে। একটু পরেই সে ফুটো দিয়ে দেখলে, ইউনুসের গা ঘেঁসে শুচি বসে আছে, আর ইউনুস এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে?

আসিয়ার মা দেখতে দেখতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলে,— সাহেব, একবার কেওয়াড়া খোলেন ত।

চাকরাণীর ডাক শুনেই ইউনুস চমকে উঠল এবং লাফিয়ে শুচির পাশ থেকে উঠে পড়ে দরজার উপর একটা লম্বা পর্দা টেনে দিলে।

আসিয়ার মা আবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলে, মিঞা সাহেব, জলদি কেওড়া খোলেন, জরুরী কাম আছে।

মিনিট খানেক পরে ইউনুস দরজা খুলে দিল, আসিয়ার মা ঘরে ঢুকে দেখলে, কেউ কোথাও নেই, যে একখানি গদী-মোড়া বড় দামী চেয়ারে শুচি রোজ এসে বসে, সেই চেয়ারখানা শূন্য পড়ে আছে। আর সেই চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, চাকা-ওলা পায়া দেওয়া একটা সরু লম্বা আলমারী, তার কাঠের কপাটে বিচিত্র লতাপাতার নক্সা কাটা।

শুচি ঘরের কোথাও লুকিয়েছে মনে করে আসিয়ার মা চারদিকে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

ইউনুসের চোখে-মুখে বিরক্তি। সে রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলে— কি কাম আছে তোমার? আমার কাজের সময় তুমি খবরদার আমাকে ডাকাডাকি করবে না, বলে রাখছি।

আসিয়ার মা ইউনুসের খাটের তলায়, আলমারীর পাশে, ইজেলের পিছনে উঁকি মেরে মেরে দেখতে দেখতে বললে— একটা চায়ের বাটি কোথায় আছে, তাই খুঁজছি।

ইউনুস বিরক্ত স্বরে বললে— এখন কি চা খাবার সময় যে, বাটি খুঁজতে এসেছ?

আসিয়ার মা হাঁটু গেড়ে হুমড়ি খেয়ে একটা দেরাজের তলা উঁকি মারছিল, ইউনুসের ধমক খেয়ে সে উঠে দাঁড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে বলে কিন্তু সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল— জানালা দিয়ে দেখলে, সামনের বাড়ীতে জানালার কাছে শুচি দাঁড়িয়ে আছে

ইউনুস আসিয়ার মার বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করে জানালার বাইরে তাকাতেই তার মুখের বিরক্তি ও দৃষ্টির কঠোরতা তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল, সেখানে ফুটে উঠলো শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম, লজ্জা ও আনন্দ! আসিয়ার মা যে ঘরে এসে তাকে বিরক্ত করেছে, সে কথা সে ভুলে শুচির দিকে চেয়ে রইল।

আসিয়ার মা মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

সেইদিন পাড়াময় রটে গেল যে, শুচি মাটির তলে কোন সুড়ঙ্গ দিয়ে ইউনুসের ঘরে আনাগোনা করে। সকলেই ফিস-ফিস করে এই কথাই আলোচনা করে, আর পরস্পর বলাবলি করে— বড় লোকের বাড়ীর কেচ্ছা, ও নিয়ে আমাদের আলোচনা না করাই ভাল, শেষে বাঁশীবাবু শুনতে পেলে আমরাই কোন বিপদে পড়ব।

কাজেই বাঁশীমোহনের শুনতে বিলম্ব হল না।

সে বাড়ী গিয়ে হাসিমুখে শুচিকে বললে— ওগো নটী, শুনেছ? লোক বলাবলি করছে তুমি না কি রোজ মাটির তলায় তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে সামনের বাড়ীর ইউনুস সাহেবের কাছে অভিসারে যাও, ইউনুসের চাকরাণী আসিয়ার মা নিজের চোখে দেখেছে।

শুচি হেসে বললে— আমার তা হলে বিদ্যাসুন্দরের উল্টো পালা— সুন্দরের মন্দিরে সুড়ঙ্গ দিয়ে বিদ্যার অভিসার।

বাঁশীমোহন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে— কিন্তু আসিয়ার মা তো গাঁজা খায় না বোধ হয়, তবে তার এমন অসম্ভব কল্পনা মাথায় ঢুকলো কেমন করে?

শুচি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে— ইউনুস সাহেব তার ঘরে দেওয়ালময় বড় বড় লম্ব আয়না টাঙ্গিয়েছে, হয়তো তাতে আমার ছায়াপাত দেখে আসিয়ার মার এইরূপ ভ্রম হয়েছে

বাঁশীমোহন হেসে বললে— ইউনুস সাহেব প্রকৃত আর্টিষ্ট তা হলে, কায়া না পেয়ে ছায়া ধরবার ফাঁদ পেতেছে। লোকটা যে আমার পছন্দকে এমন করে তারিফ করছে, তার জন্য তাকে এক দিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিতে ইচ্ছা করছে! দেখছ, আমি কেমন জহুরী!— কি রত্ন বেছে নিয়েছি। ন রত্নন্ অন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ!

আনন্দে ও লজ্জায় শুচির মুখ লোহিতাভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

শুচির একটি কন্যা হয়েছে। শুচির পিতা সমরেশবাবু নাতনীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি করতে ঢাকায় এসেছেন।

শ্রাবণ মাস। সন্ধ্যাবেলা। মুসলধার বর্ষণ হচ্ছে। পথের ধারের ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বেলে সমরেশবাবু নাতনীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন, তাঁর দু'পাশে বসে, শুচি আর বাঁশীমোহন।

সমরেশবাবু নাতনীর মুখের দিকে স্নেহ-বিগলিত দৃষ্টি তাকিয়ে স্মিতমুখে বললেন শুচি, তোমার মেয়ের একটা ছবি আমাকে দিও বাছা, আমি এই বুড়ো বয়সে আমার এই অতি নবীনা প্রণয়িণীব বিরহ কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তাতে আবার বর্ষাকাল, আমি বিরহী যক্ষের মত ছবি আঁকতেও জানি না যে, ধাতুবাগ দিয়ে বসে বসে ছবি এঁকে মনটাকে সান্ত্বনা দেব!

শুচি পিতার মমতাভরা রসিকতায সুখী হয়ে হেসে বললে— আমাদের সামনের বাড়ীতে একজন আর্টিষ্ট থাকে, সে একদিন খুকীর ছবি তুলেছে—

বাঁশীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন ইউনুস খুকীর ছবি তুললে কেমন করে?

শুচি বললে— ঝি খুকীকে ঠেলা-গাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছিল, ইউনুস ঝিকে দাঁড় করিযে খুকীর সামনে পিছনে এ-পাশে ও-পাশে দাঁড়িয়ে নানান্ দিক্ থেকে অনেকগুলো ছবি তুললে, আমি দেখলাম।

বাঁশীমোহন বললে— তা হলে তার কাছ থেকে খুকীর ফটোগ্রাফের দুইখানা প্রিন্ট চেয়ে নিলেই হবে।

সমরেশবাবু হেসে বললেন— ফোটোগ্রাফে আমার বিরহ বেদনা ত দূর হবে না। শুচি, তুমি তোমার নতুন মায়ের ছবি নিজে এঁকে আমাকে উপহার দেবে। যে রং দিয়ে সে আমার চিত্তপটকে রাঙ্গিয়েছে, সেই রং তোমাকে চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

শুচি সুখের আবেশে লজ্জিত হয়ে বললে— আমি ত ছবি আঁকা এক রকম ছেড়েই দিয়েছি—

সমরেশবাবু বললেন— ছেড়ে দিয়েছ আবার ধর। এবার পূজোর সময় কলকাতায় একটা বড় আর্ট এক্‌জিবিশন হবে, তার জন্যেই একখানি ছবি খুব ভাল করে এঁকে ফেল, এখনও সময় আছে।

শুচি কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললে— আমাদের ছবি দিয়ে কি হবে? ইউনুসের সঙ্গে ত পারবার যো নেই।

সমরেশবাবুর প্রফুল্ল মুখ অকস্মাৎ গম্ভীব হয়ে উঠল, তিনি ঈষৎ বিষণ্ণ স্বরে বললেন— গেল শীতকালের কোনও একজিবিশনেই সে ছবি দেয়নি।

শুচি বললে— হ্যাঁ, ইউনুসের ছবি, বা লেখাও ত আর কোনও কাগজে দেখতে পাওয়া যায় না। অত বড় নাম-ডাক হয়েছিল, সে হঠাৎ কোথায় ডুব মারল?

বাঁশীমোহন বললে— মারা-টারা গেল না কি?

সমরেশবাবু গম্ভীর বিষণ্ণ স্বরে বললেন— কি জানি! অবনীন্দ্র ঠাকুর আর যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী সে দিন দুঃখ করে বলছিলেন— অমন প্রতিভাবান্ আর্টিষ্ট কোথায় যে গেল, কেউ তার খোঁজও দিতে পারে না।

সমরেশবাবুর মনেব মধ্যে একটা সন্দেহ অনেক দিন থেকেই কাঁটার মত খচখচ করছিল যে, হয় ত শুচিকে প্রার্থনা করে না পেয়েই ইউনুসের সমস্ত শক্তি ও সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি সেই সন্দেহ কন্যা ও জামাতার কাছে প্রকাশ করতে পারলেন না, ইউনুস যে শুচিকে যাচ্ঞা করেছিল, সে কথাও যেমন তিনি আর কারও কাছে প্রকাশ করেননি, তেমনই এ কথাও তিনি গোপন রাখলেন। কিন্তু তার মন বিষাদাচ্ছন্ন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন।

যে আলাপ আনন্দ ও রসিকতা দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, তার উপরে একটি শোকের ছায়া এসে পড়ল। পিতার বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যে সমবেদনা অনুভব করে শুচি বললে— সত্যি, ইউনুস এমন অসাধারণ প্রতিভার আভাস দিতে না দিতেই কোথায যে গেল!

সমরেশবাবু আর কোনও কথা বললেন না। ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ক্ষণকাল আর কেউ কোনও কথা বলতে পারল না।

ঘরের মধ্যে আলাপ থেমে গেলে শুনতে পেলে, সামনের বাড়ী থেকে উঁচু মিঠা গলার গান ঝড়-বৃষ্টির মাতামাতির সঙ্গে বড় করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করে ফিরছে—

আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে
হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি যোড়হাতে!
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,
রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুৎঘাতে।
দ্বার খোল হে দ্বার খোল!
ওগো কর দয়া দেহ দেখা দুঃখরাতে!

ইউনুসের ঘরের ভিতর দিকে কপাটের সামনে পর্দ্দা দিতে যে দিন ইউনুসের মনে থাকে না, সেই দিনই তার কৌতূহল-বিহলা চাকরাণী আসিয়ার মা ফুটার উপর চোখ রেখে দেখে, ইউনুস শুচির সঙ্গে আলাপ করছে। আসিয়ার মার সাড়া পেলেই ইউনুস চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি কপাটের উপর পর্দ্দা টেনে দেয়। আসিয়ার মাব এই চাক্ষুস প্রত্যক্ষ এখন কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না, শুচি আর বাঁশীমোহন শুনে শুধু হাসে।

একদিন আসিয়ার মা ফুটোর উপর দৃষ্টি পেতেই চমকে উঠল সে দেখলে, ইউনুস শুচির মেয়েকে দুই হাতে মুখের কাছে তুলে চুমু খেলে আর তারপর শুচির কোলে তাকে ফিরিয়ে দিলে, আবার খুকীকে শুচির কোল থেকে তুলে নিয়ে চুমু খেলে, আবার শুচির কোলে ফিরিয়ে দিলে, বারংবার সে এই রকম করছে। শুচি চুপ করে বসে মৃদু মৃদু হাসছে।

এই অনাচারের দৃশ্য আসিয়ার মার আর সহ্য হল না, সে নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে গিয়ে এক ছুটে বাঁশীমোহনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন বাঁশীমোহন তাঁর বাড়ীর বাহিরের বৈঠকখানায শুচির কোলে খুকীর একখানি ছবির দিকে দাঁড়িয়ে প্রশংসমান স্নেহবিগলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আসিয়ার মা রুদ্ধশ্বাসে এসেই বাঁশীমোহনকে বললে— বাবু আমার সঙ্গে আসুন, আপনার বিবির পিরীত নিজের চোখে একবার দেখুন।

স্ত্রী চরিত্র দোষারোপের কথা শুনে বাঁশীমোহনের মুখের উপর দিয়ে ঈষৎ ঈর্ষ্যার ছায়ার পিছনে পিছনে আসিয়ার মার স্পর্দ্ধায় বিরক্তি ও ক্রোধের ছায়া ভেসে গেল, তারপর মুখে কৌতুকের স্মিতহাসি ফুটে উঠল, সে কৌতূহলের আকর্ষণে নীরবে আসিয়ার মার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

শুচি বৈঠকখানার পাশের ঘরেই তার বাবার কাছে বসে ছিল। সে আসিয়ার মারকথা শুনেই চম্‌কে উঠে পিতার মুখের দিকে তাকালো— বাবা যদি এই কথা শুনে থাকেন, তবে তিনি না জানি কি ভাববেন। শুচি দেখলে, আশঙ্কা তার সত্য, তার পিতার উৎকণ্ঠাকুল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছেন। শুচির দৃষ্টি সম্মিলিত হতেই সমরেশবাবু ব্যগ্র ও উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন— এ মেয়েলোকটি এসে বাঁশীমোহনকে কি বললে?

পিতার প্রশ্ন শুনেই শুচির মুখ লজ্জায় অপ্রতিভ হয়ে গেল। সে দৃষ্টি নত করে মৃদুস্বরে বললে ঐ মেয়ে লোকটা রটিয়ে বেড়ায় যে, আমি সুড়ঙ্গ দিয়ে সামনে বাড়ীতে যাই। সমরেশ বাবু কৌতুকমিশ্র উদ্বেগের সহিত বললেন— সামনের বাড়ীতে কে একজন আর্টিষ্ট থাকে বলছিলে না? বাঁশীমোহন একলা তার বাড়ীতে গেল, কার্য ভাল করলে না, ঝগড়া গণ্ডোগোল করবে না কি?

শুচি পিতার উদ্বেগে উদ্বিগ্ন হয়ে বললে বাবা, চল না, আমরাও যাই। তাহ'লে আজ সকলের সকল সন্দেহ ঘুচে সমস্যা মিটে যাবে।

সমরেশবাবু মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করে বললেন— আচ্ছা চল।

বাঁশীমোহন নিঃশব্দে ইউনুসের ঘরের সামনে গিয়ে আসিয়ার মার নির্দ্দেশমত ছিদ্রপথে দৃষ্টি প্রেরণ করেই চমকে উঠল, তার ললাটে ভ্রুকুটি দেখা দিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে তার মুখের কঠোরতা শিথিল হয়ে এল, ললাট প্রশস্ত ও দৃষ্টি প্রশান্ত হল, ধীরে ধীরে তার মুখে বিস্মিত প্রশংসাভরা শ্রদ্ধান্বিত মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বাঁশীমোহন কপাটের ফুটো থেকে চোখ তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দরজা ঠেললে।

পশ্চাতে লোকসমাগমের শব্দ শুনে বাঁশীমোহন পিছন ফিরেই দেখলে, পিতার সঙ্গে শঙ্কিত মুখে শুচি আসছে। শুচিকে আসতে দেখে আসিয়ার মার দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হল— এ কি ভুতুড়ে কাণ্ড! এই একটু আগে যে ছিল ঘরে, সে এলো বাহিরে। এরা কি ভেল্কি জানে?

বাঁশীমোহন স্ত্রী ও শ্বশুরকে আসতে দেখে লজ্জিত হাস্যে অপ্রতিভ ভাবে বললে-- আপনারাও এসেছেন?

ঘরের দরজায় ধাক্কা ও বাহিরে কণ্ঠস্বর শুনে ইউনুস বিরক্ত হয়ে মনে করলে, আসিয়ার মা'টাই বিরক্ত করতে এসেছে। সে আসিয়ার মাকে ধমকে তাড়িয়ে দেবার জন্য দরজা খুলে একটু ফাঁক করলে এবং সেই ফাঁকে নিজের শরীরকে আড়ালে রেখে মুখ একটু বাহির করেই স্তম্ভিত অবাক হয়ে গেল— তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার নিরন্তর আরাধনার ধন শুচি। শুচিকে এত নিকটে দেখবামাত্র ইউনুসের সর্ব্বশরীর শিথিল হয়ে এল, হাত অবশ হয়ে পড়ল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা তার হস্ত-মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ খুলে গেল। সকলে বিস্ময়ে দেখলে, ইউনুসের ঘরে সিংহাসন তুল্য বহুমূল্য চৌকীর উপর শুচি তার মেয়েকে কোলে করে বসে মৃদু মৃদু হাসছে।

শুচি আর সমরেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বাঁশীমোহন বললে— "মোমের পুতুল"!

বিস্ময়ের প্রথম আবেশ উপশমিত হলে সমরেশবাবু মোমের পুতুলের দিক থেকে ফিরেই বলে উঠলেন— এই ত ইউনুস।

ইউনুসের একান্ত একলা গোপন প্রেম অত্যন্ত নির্দ্দয়, নির্লজ্জ রকমের শুচির সামনে ধরা পড়ে যাওয়ার দুঃসহ লজ্জা ঢেকে ফেলবার জন্য সে দুই হাতে মুখ ঢেকে মাটির উপর বসে পড়লো, সে নিজেকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে ধূলার মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে পারলে যেন পরিত্রাণ পায়।

ইউনুসের অবস্থা দেখে শুচির চক্ষুও সজল হয়ে উঠল।

বাঁশীমোহন ইউনুসের কাঁধে হাত রেখে বললে— আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু। আমার স্ত্রী আপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন। আপনার যখন ইচ্ছা হবে, আমাদের বাড়ীতে আপনি আস্‌বেন।

ইউনুস কোন কথা বলতে পারল না, সে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

সমরেশবাবু ব্যথিত স্বরে বললে— এখন আমরা চলে যাই এসো। ওঁকে একলা থাকতে দাও।

শুচি ছল-ছল চোখে আর একবার ইউনুসের দিকে করুণা-ভরা দৃষ্টিপাত করে পিতা ও স্বামীর সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেল।

শুচিরা বাড়ীতে এসে সবাই গম্ভীর হয়ে রইল— বিভিন্ন ভাবে তাদের তিনজনের চিত্তই এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, কেউ আর কথা বলতে পারছিল না।

গভীর রাত্রিতে শুচি শয্যায় জেগে শুয়ে আছে। সে শুনতে পেলে, ইউনুস কান্না-ঢালা করুণা স্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে নিশীথ নিস্তব্ধতাকে ব্যথিত করে গাইছে—

"হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈলে বাহির।"

শুচির চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে তার বালিস ভিজিতে দিতে লাগল। ব্যথিত অবসন্ন চিত্তে সে যে কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে জানতেও পারেনি।

সকালে তার ঘুম ভাঙতেই শুচি ধড়মড় করে উঠে বস্‌লো। দেখলে, তার এক পাশে খুকী ও এক পাশে স্বামী তখনও ঘুমোচ্ছে। সে সন্তর্পণে অবনত হয়ে খুকীকে চুম্বন করলে ও স্বামীকে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। তারপর সে ধীরে ধীরে জান্‌লার কাছে গিয়ে ইউনুসের বাড়ীর দিকে একবার দেখলে, কিন্তু প্রতিদিনের মত আজ ইউনুস প্রত্যুষ থেকেই তার জান্‌লায় শুচির দর্শনপ্রাপ্তির আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে নেই। শুচির মনে হল— আহা, বেচারা বড় লজ্জা পেয়েছে।

শুচি পিতার, স্বামীর ও কন্যার পরিচর্যার আয়োজন করতে চলে গেল।

শুচি পিতার ও স্বামীর জন্য চায়ের জল ও খুকীর জন্য দুধ গরম করে নিয়ে অপেক্ষা করছে। সমরেশবাবু তার পাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, দাসী খুকীকে আনতে গেছে। বাঁশীমোহন বেড়াতে গেছে, ফিরবার সময় হয়েছে।

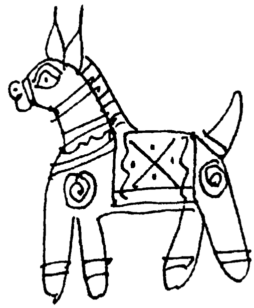
তখনই বাঁশীমোহন ঘরে এসে প্রবেশ করতে করতে ব্যথিত সুরে বললে— ইউনুস সমস্ত জিনিস-পত্তর ফেলে রেখে কাল রাত্তিতে কোথায় চলে গেছে— সঙ্গে নিয়ে গেছে কেবল দুটি "মোমের পুতুল!"

উচ্ছ্বাসিত অশ্রু গোপন করবার জন্য শুচি তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।



আমার শিকারোক্তি

শিবরাম চক্রবর্ত্তী



"তখন আমি করলাম কি, কোটের হাতায় মুড়ে আমার বাঁ হাতখানা তার গলার ভেতর পুরে দিলাম। কাজটা মোটেই সোজা নয়— মজার তো নয়ই। ধারালো দাঁতের কথা ভাবো একবার! .....এদিকে সে যখন আমার বাঁ হাতখানা চিবুতে থাকলো, অকাতরেই— বলতে কি, আমি ডান হাত দিয়ে তার পাঁজরায়, আমার ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করে দিয়েছি। ভালুকটা একবার একটা হেঁচকি তুললো, বেশ ডাকসাইটে হেঁচকি। তুলেই ব্যস্— আমার পায়ের তলায় ঢলে পড়লো— যাকে বলে, পতন আর মৃত্যু।.....সেই ভালুকটার চামড়া এখনো আমরা বাড়ীতে টাঙিয়ে রেখেছি।" এতটা বলে বক্তা থামলেন।

পুরীর সমুদ্র-তটে এক হোটেলের একটা কাম্‌রায় বসে আমাদের গুল্‌তানি চলছিল। সামনের বড়ো জানলাটা খোলা, তার ভিতর দিয়ে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি উঁকি মারছে। তার ওপারে হৈমন্তিক সমুদ্রের রোমন্থন। আর এদিকে, সমুদ্র-পুরীতে তটস্থ হয়ে আমরা শুনছিলাম।

সন্ধ্যে হব হব। আবহাওয়াটা এম্‌নিই যে সহজেই জমে ওঠে, সৌহার্দ গাঢ় হয়। তার ওপরে আরেক যোগাযোগ— একটু আশ্চর্যই বলতে হবে, আসরে সকলেই এক একটি শিকারী। তাঁদের বিবৃতি থেকেই ক্রমে ক্রমে সেটা বিস্তৃত হতে লাগলো।

ভালুক-শিকারীর একটু আগে আরেকজন সুরু করেছিলেন। শুক্‌নো আম্‌শির মতো চেহারা। মনে হয় যেন বহুৎ দিন ধরে রোদে টাঙিয়ে রেখে তাঁকে শুকোনো হয়েছে। রৌদ্রপক্ক সেই ভদ্রলোক বুনো গণ্ডার শিকারের একটা গল্প আমাদের শোনালেন। মারি তো গণ্ডার, কথায় বলে। গণ্ডারটার আবার ভাণ্ডার লুঠ করার দিকে ঝোঁক ছিল। এক গেরস্তর গোয়ালে থেকে তার সযত্ন-পলিত গোরুদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ব্যাটা—

"কতগুলি গোরু?" আমি জিজ্ঞেস করেছি।

"তা এক গণ্ডার কম না।"

"গণ্ডারে গণ্ডারে ধূল পরিমাণ।" আমি বল্‌লাম। শুভঙ্করী কষে।

".........জোচ্চোরটা গোরুদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের দিকে কেটে পড়ছে, এমন সময়...."

এমন সময়ে সেই অবশ্য-শিকার্য কাণ্ডটা ঘটলো। তিনিই ঘটালেন। তাঁর ঘনঘটা শেষ হতে না হতেই আরেকজন সুরু করলেন। ইনিও বায়ুপরিবর্ত্তনকারীদের একজন। দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট দেহ। পুরীর জল-হাওয়া এঁর শ্রীঅঙ্গের বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারবে বলে বোধ হয়

না। একবার নদীতে চান করতে গিয়ে তার তলদেশ থেকে আধমণের বেশি ঘুমন্ত এক কাছিমাকে কি করে তিনি টেনে তুলে এনেছিলেন তার কাহিনী।

এম্‌নি চলছিলো— এক জনের পর আরেক জনের আরম্ভ— বর্ণনা আর আড়ম্বর আর অবশেষে আড়ং ধোলাই। একটার পর একটা ধারাবাহিক শিকারের পালা। প্রত্যেক ঘটনাটাই নির্জলা সত্যি— প্রত্যেকেই দিব্যি গেলে জানাচ্ছিলেন, এমন কি, যিনি জলের তলা থেকে কচ্ছপ আমদানি করেছিলেন তিনিও। কিন্তু সবাইকে টেক্কা মারলো আমাদের ভালুক-শিকারীর কেচ্ছা। ভূয়োদর্শী এক ভালুককে এক হাতে একলা কাবু করা চাট্টিখানি কথা নয়।

আমরা হাঁ করে শুনছিলাম।

"অবাক্ কাণ্ড তো!" অজান্তেই কখন মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে।

"আপনার বুঝি বিশ্বেস হচ্ছে না?" ভালুকওয়ালা ফোঁস্ করে উঠলেন।

"না না, বিশ্বাস হবে না কেন? বিশ্বাস খুবই হচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু ঈর্ষাও হচ্ছে, বলতে কি!" আমি বল্লাম।

"চাই সাহস—!" আম্‌শিপানা চেহারা জানালেন, "সাহস আসে নিয়মিত ব্যায়াম করলে নিয়মিত ব্যায়ামে যদি ব্যারাম না আসে তাহলে সাহস আসতে বাধ্য। সাহস আব মাস্‌ল্— দুই এক সঙ্গে আসবে। আর বাড়তে থাকবে— সাথে সাথেই।"

এই বলে তিনি শীর্ণ বক্ষস্থলে নিজের জীর্ণ হাতটা রাখলেন।— "আর ব্যায়ামের সের হচ্ছে বারবেল্ ভাঁজা। সেও কিছু কম শিকার নয়।"

"আমি অস্বীকার করি না।" সবিনয়ে জানালাম।

"শিকার করাও একটা মস্ত ব্যায়াম।" সেই কূর্ম-কীর্তিধ্বজ বল্লেন ঃ "আপনি কখনো শিকার-টিকার করেছেন?"

"শিকার—না—ব্যায়াম? কোনোটাই নিয়মিত করবার সুযোগ পাইনি। তবে একবার—"

"বনবিড়াল-টিড়াল বোধ হয়?" ভালুক-শিকারী চোখ মট্‌কালেন।

"না না, বনবেড়ালের সঙ্গে আমি পেরে উঠ্‌বো— কী বলেন? বেড়াল, আরশোলা নেংটি ইঁদুর— এরা ভারী মারাত্মক। ওদের ত্রিসীমানায় আমি নেই—"

"তাহলে কী? মাছি-টাছি?"

"মাছি নয়, মাছও না। মাত্র একটা বাঘ।"

পালে যেন বাঘ পড়লো। এ ওর চাওয়া-চাওয়ি করলো, বুঝি বা, একটু বক্র দৃষ্টিতেই 'বা—ঘ!' ভালুকধারীর বিস্ময় বাগ মানে না।

"কি করে বাঘালেন?" বল্লেন কুর্মবীর।— "আপনার নিশানা খুব ভালো বলতে হয়।"

"আমার নিশানা?" আমি একটু আম্‌তা আম্‌তা করি : "কিন্তু আমি তো বাঘটাবে গুলী করিনি। বন্দুকই ছিলো না আমার কাছে।" আমার নিশানা অবনত করতে হোলো।

"তাহলে বাঘটাকে মারলেন কিসে?" আম্‌শী ভদ্রলোককে বেশ রাগতই দেখা গেল।

"বাঘটাকে মেরেছি আমি বল্লাম কখন্? মোটেই মারিনি। বাঘ মারবো— আমি! আপনারা পাগল হয়েছেন! সে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। মারতে গেলে শুনেছি ওরা ভারি ক্ষেপে যায়, এমন কি উল্‌টে মেরে বসে— মারবার আগেই। না, মশাই, না। ওসব হঠকারিতায় আমি নেই। বাঘটাকে আমি জ্যান্ত পাক্‌ড়েছিলাম।"

"ও। একটা ব্যাঘ্র-শিশু! তাই বলুন!" কূর্ম অবতার স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন।

"না মশাই, শিশু নয়, আস্ত বাঘ। আসামের জঙ্গলে পাক্‌ড়েছিলাম। আমি তখন কলকাতার এক সাপ্তাহিক পত্রে সম্পাদকতা করতাম— সেই সূত্রেই!"

"কী সূত্র বল্লেন?"

"খুব মজবুত সূত্র। কাগজটা ছিলো এক দেশমান্য নেতার। তিনি সভায়-টভায় বক্তৃতা করতেন, আর আমি তার বৃত্তান্ত ফলাও করে আমার কাগজে ছাপতাম—"

"দেশনেতা রাখুন, আপনার বাঘের কথা শুনি—"

"অতো ব্যগ্র হচ্ছেন কেন? ক্রমেই সে কথা আস্‌ছে—"

"ক্রমে নয়, আগে। কি করে পাক্‌ড়ালেন বাঘটাকে— সে-রহস্য দয়া করে একটু ফাঁস্ করবেন কি?" আসল কথায় আসবার ওঁদের ব্যগ্রতা!

"কেন করব না? আপত্তি কিসের? এমন কিছু বাহাদুরির কাজ নয়। গল্প লেখার চেয়ে সোজা— এমন কি, সম্পাদকতা করার চেয়েও। আরে মশাই, যদি সম্ভব হোতো তাহলে আমি এই লেখকগিরির পেশা ছেড়ে দিয়ে বাঘ ধরার নেশাতেই ভিড়ে যেতাম। কাজটা যেমন সোজা তেমনি মজার। কিন্তু দুঃখ এই, কলকাতার আশে-পাশে বাঘ মেলে না—"

ঢোঁক গিলে আমি বলতে শুরু করি : "কিন্তু সে যাই হোক, আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারব। আমার বাঘ শিকার এমন কিছু কাণ্ড নয়। তেমন রোমাঞ্চকর ব্যাপারও না। আপনারা হয় তো ভাবছেন, আমার একখানা হাত বা পা অযাচিত তার মুখের সামনে ধরে দিয়েছিলাম— মোটেই তা নয়।"

"দিলেও বাঘ তা মুখে তুলতে চাইতো কি না সন্দেহ! ওই তো রোগা রোগা হাত-পা।" ভালুককুমারের তরফ থেকে বাধা এলো। —"আর যাই হোক, বাঘেদের রুচি বলে একটা বোধ আছে।"

"ঠিক। ওঁর মতো অতো চর্বি নেই আমার। বাঘ এগুলি চর্বিত চর্বণ করতে, রাজি

হোতো বলে আমিও মনে করি না। তাছাড়া, এই মুষ্টিমেয় হাত-পা বেহাত হতে দিতে আমার নিজের দিকেও আপত্তি আছে। কাজেই ওসব হাতাহাতির কাণ্ডে না গিয়ে— যখন আপনারা শুনতেই চাচ্ছেন নেহাৎ তখন খোলসা করেই বলি.....

"ঘটনাটা এই। আসামে গিয়ে আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলাম। লোকে প্রেমে পড়ে আসামী হয়। আদালতে দাঁড়ায়— আর আমি আসামী হয়ে প্রেমে পড়লাম......তা, ঐ একই কথা। আসামের মেয়ে নয়, বাঙালী মেয়ে— কিন্তু আসামী চেহারা। এ রকম কম্বিনেশন্ যদি কোথাও দেখে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন তাদের প্রেমে না পড়া কদ্দুর কষ্টকর ব্যাপার। অবশ্যি, পড়াটাও কিছু কষ্টের নয়। মানে, তাদের ছোঁয়াচটাই হচ্ছে মারাত্মক। তাহলেও.......যাক্, যে কথা বলছিলাম। নারীদের ব্যাপারে তখনো আমি খুব আনাড়ি। ঠিক এখনকার মতই। কিন্তু হলে কি হবে মশাই, মেয়েটি ছিলো অদ্ভুত— যেমন দেখতে তেমনি শুনতে। সারা শিলঙে অমন মেয়ে আর একটাও ছিলো না। আর সারা শহরটা যেন তার ওপরেই হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছিল।

"বিশেষ করে একটি ছোকরার ঝোঁক যেন একটু বেশি রকমেরই দেখা গেল। ছোকরা আবার শিকারী। বাঘ-টাগের পিছু পিছু দৌড়োনোই ছিলো তার বাতিক। তা দৌড়োক্, আমার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু দেখা গেল, সেও আমার মত সেই একমাত্র মেয়েটির পিছনে রয়েছে..."

"তার শিকাবের ধরণটা কি রকম? আপনাব মতই না কি", শ্রোতাদের একজন জিজ্ঞেস করলো।

"না। সেই সেকেলে ধরণের। সেই সনাতন কাল থেকে বাঘ শিকাবের যে সমবায় পদ্ধতি আছে তাই। সবাই মিলে তোড়জোড় করে বাঘ মারা। এক দল লোক আগে গিয়ে জঙ্গলে মাচা বেঁধে আসে, গর্ত খুঁড়ে রাখে,— তাড়িয়ে তাকে সেই অধঃপতনের মুখে ঠেলে নিয়ে আসে। সেই সময়ে মাচায় বসা শিকারী বাঘটাকে গুলী করে। কিম্বা বাঘটা নিজেই গর্তে পড়ে হাত-পা ভেঙে মাবা পড়ে। সেই আধমরা অবস্থাতেও তাকে বন্দুক দিয়ে মারা যায়,— মানে, ঠিক বন্দুক দিয়ে নয়, গুলী দিয়েই।

"তবে বাঘ এক এক সময়ে ভুল করে আসে। ভুলক্রমে গর্তের মধ্যে না পড়ে ঘাড়ে এসে পড়ে। তখন আর উপায় কি, বন্দুক দিয়েই মারতে হয়। বন্দুক, গুলী—কিল্ ঘুষি— যা—পাওয়া যায়। অবশ্যি কাছে এলে, বাঘ এ সবের মারামারি গ্রাহ্যই করে না। উলটে বিরক্ত হয়ে দূরে থাকতেই তার মতলব গুলিয়ে দেওয়া হয়।

"চল্‌তি কায়দা হচ্ছে এই। পদ্ধতিটা যেমন সাবেক তেমনি অমানুষিক। আমার মতে মোটেই ভদ্রজনোচিত নয়। এক দল লোক মিলে চার ধার থেকে চড়াও হয়ে একটা অসহায় বাঘকে ফাঁদে ফেলা বা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে টেনে এনে মায়াজালে জড়িত করা—তাকে শিকার না বলে শিকারের জালিয়াতি বল্লেই ভালো হয়।

অবশ্যি, জালে আগাপাশতলা জড়িয়ে পড়লে আখেরে বাঘটার ভালোই হয়। তাকে আর না মেরে—বেঁধে-ছেঁদে প্যাক্ করে পত্রপাঠ চিড়িয়াখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এবং ভেবে দেখলে আসামের জঙ্গলের চেয়ে আমাদেব আলিপুর জায়গা মন্দ নয়। ড্যাম্পো নেই, মশা নেই, কালাজ্বর হবার ভয় কম, তাছাড়া নিখরচায় খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত। কিন্তু জানোয়ারের মাথায় কি এ সব তত্ত্ব সহজে ঢোকে? হাড়-জংলী। বুঝতে পারছেন!

"হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম। ......শিলং শুদ্ধু সবাই আমরা মেয়েটার পিছু পিছু ঘুরতে লাগলাম। না, না— দল বেঁধে নয়। ফাঁক মতো। যে যার নিজের ফাঁক তালে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে সকলেই খসে পড়লো। রয়ে গেল মোট দু'জন! সেই বাঘশিকারী আর আমি।

"সেই বাঘমারির চালচলনে, বল্‌তে কি, আমি বেশ ক্ষুণ্ণই হয়েছিলাম। বাঘ-টাগেব দিকেই ছোকরার বেশী ঝোঁক বলে শুনেছিলাম। কিন্তু তাদেব পিছনে না লেগে মেয়েটির আশে-পাশে তাকে ঘুর-ঘুর করতে দেখা যেত।

"ছোকরা না কি দেখতে সুশ্রী ছিল। কাউকে কাউকে একথা বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তো তার চেহারার ভেতর শ্রী ছাঁদ কিছুই পাইনি। নানান্ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকিয়েছি—কিন্তু অতো তাক্ করেও আকৃষ্ট হবার মতো কিছুই আমার নজরে পড়েনি। কাঁধের কাছটা ভযঙ্কর রকম চওড়া, চোয়াড়েদের যেমন হয়ে থাকে। ফর্সা রঙ, এতো ফর্সা যে পান্‌সে বলে মনে হবে। তার ওপর গাল দু'টো গোলাপী— হুবহু মেয়েলি টাইপেব--- যার-পর-নাই খারাপ। আর বড়ো কালো কালো বিচ্ছিরি চোখ! দেখলেই গা কেমন কেমন করে। অর্থাৎ সমস্ত মিলিয়ে যদ্দূর নোংরা হতে হয। কিন্তু আর সবার মতে সেইগুলিই ছিলো না কি তার বড়ো রকমের গুণ। এছাড়াও সে গুণ-গুণ করে গান গাইতে পারতো।

"আর আমার গুণের মধ্যে ছিল আমার সাংবাদিকসুলভ সর্বজ্ঞতা। সেই কাল্‌চার যার চারা নেই— যার আজ চাড় সব চেয়ে বেশি। আমার কৃষ্টি আর আমার দৃষ্টিভঙ্গী। এছাড়াও আমার গল্প লেখবার এবং তার চেয়েও আরো, গল্প করবার ক্ষমতা। ঠিকমতো জায়গায় যুতসই কথাটা বসাতে আমি মজবুত ছিলাম। কথার প্যাঁচে মারা আর মার প্যাঁচের কথায় আমার বাহাদুরি ছিলো অবিসংবাদিত। তাছাড়া, সংবাদিত বিষয়েও আমার জোড়া মিলত না। নিউটনের আপেল পড়ার ব্যাপারে আমি আলোচনা চালাতে পারতাম। জ্ঞান-সমুদ্রের উপকূলে উপল কুড়োতে গিয়ে কি ভাবে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন এবং কেবল নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়েই ঝুড়ি বোঝাই করেছেন তা আমার অজানা ছিল না। আইনষ্টাইন্ যে আইনজীবি নন্ তাও আমার জানা ছিল। কি করে সমুদ্রের মোহনায় পলি পড়ে ব-দ্বীপ গজায় তার রহস্য ব্যক্ত করে শ্রোতাদের থ' করে দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত ছিল না। একস্ রে, অমিট্ রে এবং প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধেও বেশ দু' কথা আমি সবাইকে শুনিয়ে দিতে পারতাম।

"এবং এই ভাবেই আমাদের দু'জনের রেষারেষি চলছিল। নিজের নিজের ধারায়। তার গালের আপেলের বিরুদ্ধে আমার নিউটনী আপেল, তার মোহময় চোখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার মোহনাময় ব-দ্বীপ। সে গুন্ গুন্ করে গান শুনিয়ে যাবার পরেই আমি দেশনেতার গরম বক্তৃতা গনগনে একখানা ছেড়ে দিলাম। তার গুঞ্জনের পরেই আমার গঞ্জনা। এই ভাবেই চলছিল। মোটের উপর, দু'জনের কেউই কাউকে আমরা টেক্কা দিতে পারছিলাম না। আর মেয়েটিও, আমাদেব কার ওপরে যে তার টান, হাব-ভাবে তার বিন্দু-বিসর্গও জানান্ দিত না।

"চলছিল এমনি। এমন সময়ে আরেক ব্যক্তি এসে হানা দিলো। তার উপস্থিতিতে চিরন্তন ত্রয়ীর আমাদের চল্তি ত্রিভুজ চ্যাপ্টা হয়ে চার কোণা হয়ে দাঁড়ালো। এই অভিব্যক্তিটি এক বাঘ।

"প্রকাণ্ড এক বাঘ। কোথ্ থেকে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের সহরতলীতে এসে হাজির হোলো কেউ বলতে পারে না, কিন্তু তার জ্বালায মশাই, গোরু-বাছুর নিয়ে কারু ঘর করা দায় হোলো। মাঝে মাঝে সে শহরের এলাকাতেও টহল দিতে আসত। হাওয়া খেতেই বোধ হয়, কিন্তু হাওয়া ছাড়া অন্যান্য খাবারেও তার অরুচি ছিল না। একবার এক মনোহরী দোকানের সব কিছু সাফ্ করে নিয়ে গেল। আরেক বার এক গ্রামোফোনের দোকান ফাঁক করলো। একবাব এক সন্দেশওলাকে সাবাড় করলো— তার সন্দেশ সমেত। সন্দেশের দোকানীকে পরে অবশ্যি পাওযা গেছ্ল— একটু বেহুঁস অবস্থায়— বেপাড়ার মদের দোকানে। এক জনের লাউড-স্পীকার বাঘের কী দরকার-- হ্যাঁ, মশাই? ও-জিনিস বাঘা বাঘা নেতার বক্তৃতায লাগলেও বাঘের ওতে কী প্রয়োজন? ওদের পার্টস্ অব্ স্পীচ তো এমনিই খুব জোরালো বলে শোনা যায।

"বাঘের দুর্ব্যবহার দিনকে দিন বাড়তেই লাগলো। এক দিন সকালে শহরের একটি স্মার্ট মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না--- সেই সঙ্গে কলেজী এক ছোকরাও— নিঃসন্দেহ সেই বাঘেব কাণ্ড। ক্রমে সেখানকার যত কিছু ক্রাইম্ আর কেলেঙ্কারি-- যার কিনারা হোতো না— সবই অবশেষে সেই বাঘে গিয়ে বর্তাতে লাগলো। সেই অঞ্চলের চোর, ডাকাত, দালাল আর ঘটক--- এদেব সকলের কর্তব্যের গুরু ভার— সেই বাঘ একলা নিজের ঘাড়ে একাধাবে বহন করছিল। কি রকম ভয়ঙ্কর বাঘ ভাবুন একবার!

"বাঘ-শিকারী আমার সবিকটিও তার খর্পর থেকে বেহাই পাযনি, তাব গোড়ালির খানিকটা সেই বাঘের থাবার মধ্যে চলে গেছ্ল, সেই সঙ্গে, তার নতুন গগল্সের চশমাটাও। যৎসামান্য ওই দু'টি জিনিস হাতিয়েই সে অমন কীর্তিমান্ একটা লোককে কেন ছেড়ে দিল তা বুঝতে

আমি অক্ষম। তাহলেও এই নিয়ে তাকে ঠাট্টা করবার সুযোগ আমি ছাড়লাম না। তাকে বেশ এক হাত নিলাম। মেয়েটির সামনেই তাকে যদ্দুর পারি খেলো করে দিলাম।

"ফলে আমাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে গেল। রাগের মাথায় আমি বলে বসলাম, আমি হলে কখনই বাঘকে আমার গোড়ালি গছিয়ে পালিয়ে আসতাম না। গোড়াতেই তাকে পাকড়ে আনতাম। এমন কি দরকার হলে, যদিও আমি অহিংস-নীতির ভক্ত, বাঘটাকে মেরে ফেলাও আমার কাছে কিছু শক্ত ছিল না।

"বাস্তবিক, ভেবে দেখলে, জনৈক বুদ্ধিজীবি বাঙালী সাংবাদিকের পক্ষে এ কাজ এমন কি কঠিন? প্রত্যহ কতো রাজা উজীরকেই তো আমরা মারছি— বলে, ব্রিটিশ-সিংহকেই ঘায়েল্ করে দিলাম! একটা বাঘ মারব, তার এমন কি। নেহাৎ ছেলেখেলা বই তো না!

"আমার এই কথার পরে যা হবার তাই হোলো। মেয়েটি বলে বসলো, আমাদের দু'জনের যে বাঘটাকে মেরে শিলঙের সবাইকে বাঁচাতে পারবে, বুঝতে হবে সেই তাকে সত্যিকারের ভালোবাসে। আর সে তার গলাতেই মালা দেবে।

"তার এই কথায় আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম। চাঁদ এবং বাঘ। ঠিক করলাম সেই রাত্রেই বাঘটাকে পাক্ড়াতে হবে। দেরি করলে পাছে আর কেউ শিকার করে ফ্যালে বা বাঘটা নিজেই আত্মহত্যা করে বসে— এমন দাঁওটা ফস্কে যায়— সেই ভয়ে আর এক মুহূর্তে সময় নষ্ট করা আমি সমচীন বোধ করলাম না। তক্ষুনি চলে গেলাম— আহা! আপনাকে ঠাকুর ডাকছে যে! রান্না-ঘরে আপনার জলখাবার দেয়া হয়েছে, শুনছেন না?"

"চুলোয় যাক্ খাবার।" জবাব দিলেন ভালুক-শিকারী ঃ "পরে খাব'খন। বাঘের কী হলো শুনি?"

"হ্যাঁ। আমার পাল্লাদার তো লোক-লস্কর জোটাতে বেরিয়ে পড়লো! তক্ষুনি সেই গর্ত খোঁড়া, ফাঁদ পাতা, জালাঞ্জলি,— সেই সব সেকেলে কায়দা-কানুন! তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। আর আমি সোজা চলে গেলাম মাংসের দোকানে— সদ্যনিহত আস্ত একটা পাঁঠার যোগাড় করতে। তার পরে গেলাম এক দাবাইখানায়। সেখানকার ডাক্তারের সঙ্গে কন্সাল্ট করে ঘুমের ওষুধ যোগাড় করলাম। এক পাউণ্ড লুমিনল, এক পাউণ্ড ভারনল, আর এক পাউণ্ড ব্রোমুরাল কিনে সমস্ত সেই পাঁঠায় কুক্ষিগত করে জঙ্গল আর শহরতলীর সঙ্গমস্থলে গেলাম। নদীর ধারে বাঘটার জলখাবার জায়গায় রেখে দিয়ে এলাম পাঁঠাটাকে। তারপর বাসায় ফিরে আমার সাংবাদিকতা নিয়ে পড়লাম। নেতৃবরের সেদিনকার বক্তৃতার রিপোর্ট লেখা তখনো বাকী ছিল।"

"নেতা রাখুন, বাঘের কী হোলো বলুন আগে?" হাঁ হাঁ করে উঠলো সবাই।

"বলছি তো। ভোর না হতেই একটা ঠেলা-গাড়ী নিয়ে সেই সঙ্গমস্থলে আমি গেলাম।

বাঘের জলযোগের জায়গায় গিয়ে দেখি, অপূর্ব দৃশ্য! ছাগলটার শুধু হাড় ক'খানাই পড়ে আছে, আর তার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন আমাদের ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল! গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। রাত্রে যারা চৌকি দেয় তেমন কোনো পাহারাওলাও এমন ঘুম বুঝি কখনো ঘুমোয়নি। দেখে আমার যা আনন্দ হোলো তা বুঝতেই পারছেন। তখুনি আমি জানোয়ারটার হাত-পা-মুখ— আগাপাশতলা বেঁধে ফেললাম।...."

"বেঁধে ফেল্‌লেন?" সবাই হাঁ।

"হ্যাঁ, বেঁধেই তো ফেল্‌ব।" আমিও অবাক্ না হয়ে পারি না, "কেন্, বাঁধবো না কেন?"

"বাঁধবার সময় বাঘটা হঠাৎ জেগে উঠ্‌লো না?"

"সত্যি বলতে, এক-আধটু যে নড়ে চড়েনি, তা নয়। হাই তুলবার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু তক্ষুনি আমার পকেটে যে মোটা খাতা ছিলো— যাতে নেতাদের বক্তৃতার নোট নিতাম— তাই দিয়ে তার মাথায় বেশ এক ঘা বসিয়ে দিয়েছি। আর যেমন চোট্ খাওয়া অমনি ঠাণ্ডা।"

"নোট-বইয়ের ঘা খেয়ে?"

'হবে না? বই ভর্তি ছিলো কী? তার পাতায় পাতায় উদ্দীপনাময়ী গরমাগরম যতো বাণী। একবার কারো মাথায় ঢুক্‌লে আব রক্ষে আছে? তা সে বাঘই হোক আর বাঙালীই হোক্। মানুষই হোক্ আর মেষই হোক্। আর যেই না সেই দেশাত্মবোধের ধাক্কা লাগা, অমনি সে আবার অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে।....."

"যাক্ গে। তার পর?"

"তার পর আর কি? তাকে বেশ করে বেঁধে-ছেঁদে আমার ঠেলায় টেনে তুললাম। তুলে রওনা দিলাম— শহরের দিকে।"

"আপনার ভয় করলো না?" গণ্ডাররাজ জিজ্ঞেস করলেন।

"কেন, ভয় কিসের?"

"বাঃ, জলজ্যান্ত একটা বাঘ পশ্চাতে রেখে ঠেলাগাড়ী টেনে নিয়ে ঘাবড়ালেন না একটুও? হাজার হোক, নিশ্চয়ই সে আপনার সেই অহিংস নেতাটির মতো নয়।"

"কিন্তু সে যে তখন ঘুমিয়ে একেবারে ন্যাতা।"

"সারা রাস্তা?"

"বিলকুল। মাঝে মাঝে অবশ্যি সে জেগে উঠতে চেয়েছে, একটুখানি চেতনার মতো দেখা দিয়েছে হয়তো বা, তক্ষুনি তার মাথায় আমার নোট—বইয়ের এক ঘা। আর তার

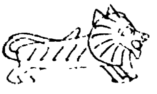
পরেই আবার এইভাবে তো টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে শহরে ফিরলাম। ফিরলাম প্রিয়া-নিবাসে। তার সামনে তাকে ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম।"

"ল্যাজ্ ধরে? বলেন কি মশাই?" ভালুক-শিকারী অবিশ্বাসের হাসি হাসলো।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাজটা শিষ্টজনোচিত নয়, তা মানি, কিন্তু ল্যাজ্ ছাড়া তার ধরবার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে।"

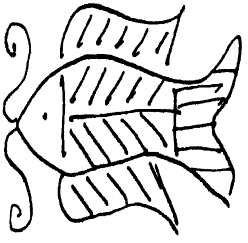
"যাক্ গে! তারপর কী হোলো?"

"আমার প্রতিদ্বন্দ্বীটির যেন মাথা কাটা গেল। বিনা বাক্য ব্যয়ে সে সরে পড়লো সেখান থেকে। আর—আর—"



পথবর্তী

সৌমেন চন্দ



ঘরে আর কেই নেই।

মালতী জিনিসটা এপিঠ-ওপিঠ করে বললে, 'আহা, এটা কী দিয়ে তৈরি বলুন তো?'

সুব্রত ঢালটি পরীক্ষা করে বললে, 'নিশ্চয় লোহা।'

মালতী খিল খিল করে হেসে উঠল, হাসতে হাসতে বললে, 'মোটেই নয়, তার দধার-কাছ দিয়েও নয়। এটা গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি। দেখতে ঠিক লোহার মতো মনে হয়, না?'

সুব্রত বিস্ময়ের স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, কিন্তু এ দিয়ে গুলি ফেরানো যায়?'

— 'হুঁ, খুব যায়। গণ্ডারের চামড়া যে খুব শক্ত এটা জানেন না?'

— 'জানি।'

— 'তার চেয়েও শক্ত এটা। জলে ভিজিয়ে রোদে শুকিয়েছে, একেবারে লোহার মতো হয়ে গেছে। এ গুলো আগে আরও অনেক ছিল, হাতে হাতে কতগুলো নিখোঁজ হয়ে গেছে, এখন এই কয়টি মাত্র আছে।' মালতী ঢালটি আবার নেড়েচেড়ে বললে, 'মনে করুন এর মধ্যে কত গুলি এসে লেগেছে, কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে এটা।'

সুব্রত বললে, 'অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রাণ বাঁচানোর কোনো অর্থই হয়তো নেই মালতী। ধরো, এখন যারা আত্মরক্ষা করে এটা দিয়ে অথচ নীতি তাদের ভালো নয়, হয়তো পাজি, অত্যাচারী— তখন সেই আত্মরক্ষার পক্ষে কী অর্থ হতে পারে? মানে তখন ওর কোনো মুল্যই নেই?'

— 'একেবারে ভুল!' মালতী হাত নেড়ে বললে, জীবন রক্ষা, তা শত্রু-মিত্র যারই হোক, বা যে কোনো রকমের হোক— শেষপর্যন্ত জীবনের রক্ষাই। সুকৃতি-দুষ্কিতির মূল্য, সেটা মানুষের দাবি, তারই নিজস্ব ব্যাপার তাতে এই ঢালের কী এসে যাবে। এর যা মূল্য আছে, আছেই। তেমনি মানুষের বেলায়ও।'

মালতী মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে কথা বলে বটে! সুব্রত এতে একটুও আশ্চর্য হল না এবং হেসে বললে, 'তুমি ভুল করছ। যে একটা খারাপ কাজ কবছে তাকে জেনে শুনে সহায়তা করলে প্রশ্রয় দেওয়া হয় জান?'

— 'হুঁ। তাতে আমার কী এসে-যাবে?'

— 'এসে-যাবে এই যে, তুমিও তার ফল ভোগ করবে। কারণ, একটা পাপকে প্রশ্রয় দিয়েছ।'

মালতী হাঁ করে তার দিকে কতক্ষণ চেয়ে মুখ ফিরিয় নিল, কিছু বলল না।

বেশি রাত না হলেও চারদিক প্রায় নিস্তব্ধ।

এমন সময় ব্রজকিশোরবাবুর ডাক শোনা গেল। মালতী ব্যস্ত হয়ে বললে, 'আপনাকে বাবা ডাকছেন, চলুন।'

একটা বড়ো ঘর। পুরোনো আসবাবপত্রে ভরা। দেওয়ালে বড়ো বড়ো ছবি, সোনালি কাজ করা ফ্রেম দিয়ে আঁটা। বেশির ভাগই রবি বর্মার— আর কয়েকটি বিদেশি চিত্রকরের আঁকা। ছাদের সাথে যুক্ত কয়েকটি অকর্মণ্য ঝাড়। ঘরের আলোটা— তেলের প্রদীপটা দেওয়ালের গায়ে। মেঝেটা আয়নার মতো চকচক করে। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একপাশে প্রকাণ্ড, পুরানো দিনের খাট— তাতে খুব পুরু বিছানা— ধবধবে চাদর। সেখানে একটা মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ব্রজকিশোরবাবু বসেছিলেন। তাঁর মাথায় চুল বেশি নেই, খুব ছোটো ছোটো করে কাটা, মুখটা বড়ো, বড়ো একজোড়া গোঁফ, শরীরের চামড়া ঢিলে হলেও খুব বলিষ্ঠ। গায়ের রঙ খুব ফরসা।

তিনি চোখ বুজে বসেছিলেন। সুব্রত যে এসেছে টের পাননি।

সুব্রত বললে, 'আমাকে ডেকেছিলেন?'

ব্রজকিশোরবাবু চোখ মেলে বললেন, 'হ্যাঁ। একা বসে আছি তাই মনে হল সুব্রতকে ডেকে না-হয় কতক্ষণ গল্প করি। কোনো কাজ ছিল?'

— 'না, কাজ আবার কী? এখানে এসেও যদি কাজ থাকে তাহলে তো মুশকিল।'

ব্রজকিশোরবাবু হেসে বললেন, 'কেন, ধরো চিঠিপত্র লেখা, পড়াশুনো করা। ও কী—বস।'

সুব্রত বিছানায় একপাশে বসল।

ব্রজকিশোর বললেন, 'পুজো আসছে অথচ এখন মনেই হচ্ছে না পুজো বলে কিছু আছে! এমনি দিনকাল। মানুষ কী করবে? আগে খাবার, তারপর তো কাজকর্ম!'

সুব্রতও আশ্চর্য হল কথা শুনে। প্রাচীন— বিশেষত যাঁরা ধর্মপ্রাণ তাঁদের মুখে এমন কথা বড়ো শোনা যায় না।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, 'মানুষের এইসব হৃদয়বৃত্তির মূলে, এটা তো জান, অনেক শ্রদ্ধা-ইচ্ছা থাকে, কাজেই যখন এগুলোও কোনো অনিবার্য কারণে বন্ধ হয়ে যায় তখন ওপর থেকে কোনো অভিশাপের ভয় নেই— কী বল? অথচ অনেকে এটা বোঝে না। আর এ তো সহজ কথা, যেখানে আমারই বিস্তর প্রয়োজন, অথচ সেই সব অনুষ্ঠান আমাকে বাধ্য হয়ে বন্ধ করতে হল সেখানে তো আমার নিজেরই ক্ষতি। এই বলেও একশ্রেণীর লোকদের বোঝানো যায় না। ওরই তো এই দোষ। কত বলি....'

সুব্রত বললে, 'প্রত্যেক মেয়েরই এই দোষ।'

— 'ঠিক বলেছ। এটা যেন তাদের বদ্ধমূল সংস্কার। যদিও আমার কিছু আসে যায় না তাতে। তবে কালের প্রভাবে মানুষের জীবন-পদ্ধতি অমনভাবে বদলে যাওয়ায় আমাদের অভ্যস্ত চোখেও ওসব ঠেকে। বিশেষত আমার স্বভাবটাই হচ্ছে তাই। যা নতুন কিছু মঙ্গল আনবে তাকে অবহেলা করি না, বরং প্রসন্ন মনে গ্রহণ করি। বিশ্বাস কর?'

— হ্যাঁ। কিন্তু অনেক সময় তখনকার অবস্থানুসারে সব নতুনকেই মঙ্গল বলে মনে হয় না।'

— 'তা ঠিক'— ব্রজকিশোরবাবু বাইরের দিকে চাইলেন। এই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে যেন কোনো দূরাতীতে তিনি চলে গেলেন। বললেন, 'তা ঠিক। নইলে মাইকেল যা লিখেছেন তা দিয়ে জীবিতকালে তিনি এতটুকু খ্যাতি বা প্রশংসা পাননি— এবং অনেক কটুক্তি সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু পরে— মরবার পর মানুষ তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধায় স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি। অথচ বেঁচে থাকতে খুব কম লোকই তাঁকে বুঝল। আমরা তাঁর কাব্য পড়েছি ছোটোবেলায়। ইস— সে কী ভালোই না লেগেছে। ওই যে কী বলে—

রুশিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী—
চমৎকার না।'

— 'হ্যাঁ।'

ব্রজকিশোরবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কাব্যের কথায় এসে পড়ল কবির কথা। আমার বাবা, জান, তিনি কবি ছিলেন— অনেক কবিতা লিখেছিলেন। লোককে কত গান বেঁধে দিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রায় সব লেখাই আমার কাছে আছে। একদিন দেখো তুমি। তোমাদের যারা লেখে-টেখে তাদের অনেকেই এই গুণটি বংশানুক্রমিক পায় শুনি— কিন্তু আমার বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখলে, না?'

তিনি সুব্রতর মুখের দিকে তাকালেন।

ব্রজকিশোরবাবুকে যারা ভালো জানে, তারা কখনই কথার শেষে তাঁর 'না'-র প্রয়োগ দেখে বিস্মিত হয় না কারণ এটা জানা, তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে 'না' উক্তি কোনো মতামতের অপেক্ষা না রাখলেও সর্বদা প্রযুক্ত হবে।

সুব্রত বললে, 'ওটা যে বংশানুক্রমিক সম্পত্তি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা সত্যি নয়। তাই আপনি যে ব্যতিক্রম হবেন, তাতে—'

— 'তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, এই তো?' ব্রজকিশোরবাবু হাসতে লাগলেন। বললেন, 'ঠিকই, ওটা কখনোই সত্যি নয়, নইলে রামের ছেলে রামই হত। আমার বাবা যা করেছেন তা তোমাদের কাছে রূপকথায় মতো মনে হবে। সে এক বিস্ময়কর ইতিহাস!

যুগ অনেক রকম হয়, আমাদের সময়ের সাথে তোমাদের সময়ের মিল নেই। তোমরা যা পেয়েছ আবার আমরা তা পাইনি। এ যেন বিকেলের মেঘ, ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে রঙ। কিন্তু আমার—'

সুব্রত সাগ্রহে বললে, 'বলুন'।

ব্রজকিশোরবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'রাতারাতি অনেক লোক মেরে আমার তা লুকিয়ে চাপা দেবার কাহিনী শুনেছ?'

সুব্রত শিউরে উঠল।

— 'আজকাল একে বলে বর্বরতা, কিন্তু তখনকার দিনে কী বলত জান? আভিজাত্য, সম্মান।' ব্রজকিশোরবাবু এক বিকট হাসি হেসে বললেন, 'তোমাকে আগেই বলেছি সময়ের সাথে সব কিছু বদলাচ্ছে। একদিন যা নিজের হাতে করতে পেরেছি আজ তা ভাবতেও পারিনে— না, না, পারব না কেন, খুব পারি। জান, মানুষের দৈহিক আবরণের ভিতর একটা পশু লুকিয়ে আছে। হিংস্রতা আর কাকে বলে!'

বিস্ময়ে তাঁর বলিষ্ঠ দেহের দিকে সুব্রত চেয়ে রইল।

— 'হিংস্র আর কাকে বলে! পদ্মাপারের মানুষ আমরা। সয়েছি ওর চিরক্ষুধার রাগকে। সব বুকে পেতে নিয়েছি। তারপর দিনের পর দিন ওর রাগকে হজম করে একদিন আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেলাম, আমার চারদিকে কেবল রক্ত আর রক্ত। ওরে বাবা, সে কী লাল রক্ত!' ব্রজকিশোর তাঁর চেহারার এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন, 'তখনও বাবা ছিলেন বেঁচে। জিজ্ঞেস করলাম এগুলো কী? উত্তর এল, কাশিমপুরের দাম্ভিক জমিদারের লাঠিয়ালদের মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে— তাইতেই এত লাল— কিন্তু ও কিছু নয় ব্রজ। কালই এই রক্তরাঙা পথে উড়বে ধুলো, ধূসর বর্ণের— রোজকার মতো বাইরে মেঠো বাতাস— সেই সঙ্গে যদি চাও শুনতে পাবে বৈরাগীদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মেশানো গান। কিন্তু পদ্মার গর্জন নয়— কে আর কী করবে বল?'

সুব্রত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেবল বললে, 'তারপর?'

— 'তারপর যা কথা তাই! তোমাকে একদিন দেখাব একটা জিনিস—'

এমন সময় মালতী ঘরে ঢুকে সুব্রতর কাছে এসে বললে, 'আপনাকে মা ডাকছে।'

ব্রজকিশোরবাবু একটু উষ্ণ হয়ে বললেন, 'একটা আলাপ করছি দেখতে পাচ্ছ— আবার ডাকাডাকি! কেন, আর কি সময় নেই?'

— 'খাবার যে তৈরি!'

— 'ও, সুব্রত তুমি খাওনি?'

সুব্রত নীরবে হাসল।

ব্রজকিশোরবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'যাও, একটু পরে আসবে বলো গে।'

মালতী চলে গেল।

— 'কত কাহিনী আছে। সে সব বলতে গেলে সময়কে পাওয়া যাবে না খুঁজে— নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে অতীতের কোঠায়। তুমি অনুভব করবে— তার চেয়ে অনেক বেশি অনুভব করব আমি। সুব্রত, আজ তোমার সাথে বসে আমি গল্প করছি, কিন্তু পনেরো বছর আগে কী এমনিই ছিলাম? আমি যদিও বদলিয়ে যাইনি কিন্তু আমার চারিদিকের আবহাওয়া বদলিয়েছে।'

— 'আপনার পাওনা আমরা কী করে কেড়ে নিতে পারি?'

ব্রজকিশোর হেসে বললেন, 'তা কেমন করে বিশ্বাস করি বলো? আর আমাদের মনের কথা তোমরা কী বুঝতে পারবে? কখনও না।'

— 'আমাদের মনের কথাও আপনারা বুঝতে পারেন না।'

— 'তা কেমন করে পারব হে? তোমাদের সঙ্গে আমরা দৌড়তে কি পারি?' ব্রজকিশোরবাবু আবার খুব হাসতে লাগলেন। হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তারপর কী বলছিলাম? পুনেরো বছর আগের ব্রজকিশোর রায়চৌধুরীর কথা না?'

সুব্রত দেখতে পেল, অদূরে উপবিষ্ট ওই মানুষটির মনের দুঃখে চোখ এখন নিজের বিগত আত্ম-ইতিহাসের পাতায়— যেখানে মহিমা-উজ্জ্বল পূর্বপুরুষের ছায়া ; হয়তো নিষ্ঠুর বর্তমান তাঁকে দিচ্ছে ব্যথা, অপমান।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, 'সেই পদ্মার কথা না? কী জান, শহরের এই ইটের স্তূপের আড়ালে বসেও আমি যেন পদ্মার ডাক মাঝে মাঝে শুনি, আমাকে সে ডাকে। তাই এক সময় ইচ্ছে হয় সব ফেলে চলে যাই আবার সেখানে। নিজেকে খাপ খাইয়ে নিই, সেখানে গিয়ে নিজেকে অনুভব করি। এখানে বিষাক্ত বাতাস, আমার শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। সব সময় মনে হয় রায়চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে— এ যে একটা সাদা কঙ্কাল!'

— 'তবে আবার সেখানে ফিরে যান না কেন?' ব্রজকিশোরবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সাতবার আমাদের বাড়ি পদ্মা নিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি চারবার। বাড়িতে সে কত মহল, কত ঘর-দুয়ার! শুনে আশ্চর্য হবে, এক ঘরে বন্দুকের আওয়াজ করলে অন্যদিকের আর-একটি ঘরে কিছুই শোনা যেত না। এত ঘর যে অচেনা কাউকে ছেড়ে দিলে বার হতে কষ্ট হত। কিন্তু তাতে পদ্মার কী আসে যায়? এবং বড়োর উপর লোভ তার বেশি। অনেক দিনের পরিশ্রমে তৈরি ঐশ্বর্যকে তাই একরাতে টেনে নিলে। সেই রাতটি আমার এখনও মনে আছে।'

— 'তবু তো পদ্মাকে ভালোবাসেন?'

— 'নিশ্চয়। ধ্বংস করতে যার পরিতৃপ্তি— ধ্বংস হতেও যে তার এতটুকু ভয় নেই। জন্ম হতে যার সঙ্গে দিন কাটিয়েছি, যাকে ভেবেছি স্বভাবমিলের বন্ধু— তার দেওয়া ক্ষতি

সহ্য করতে পারব না এমন অহংকার আমার নেই। কিন্তু এই দ্যাখো, তুমি যে খেতে যাবে এটা ভুলেই গেছি। যাও—' এই বলে ব্রজকিশোরবাবু চুপ করলেন।

সুব্রত ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় এল। সেখানে গভীর অন্ধকার, নিস্তব্ধতা। চৌধুরীদের মস্ত প্রতাপ সমৃদ্ধি যেন ওই সীমাবদ্ধ অন্ধকার! সুব্রতর হাসি পেল, কিন্তু হাসতে কষ্ট হল।

সেই অন্ধকার হেঁটেই গেল। একটি ঘরে আলো জ্বলছে। সে সেখানে গিয়ে দেখতে পেল, ঘরে কেউ নেই। গলা বেশি উঁচু না করেই সে ডাকল—

— 'মাসিমা— মাসিমা—'

— 'এসো'।

স্বর লক্ষ করে সুব্রত খাবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। লীলাবতী তার অপেক্ষায় বসে আছেন। কাছেই মালতী।

— 'আপনি আমার জন্য অনেকক্ষণ বসে রয়েছেন!'

লীলাবতী কোনো উত্তর না-দিয়ে একটু হেসে বসতে বললেন।

পিঁড়িতে বসে সুব্রত বললে, 'অল্প দেবেন। আমার কিন্তু খিদে নেই।'

রাত বেশি হচ্ছে বলে লীলাবতী পঞ্চুর মাকে বিদায় করে দিয়েছেন। বাড়ির মধ্যে ওই একটিমাত্র ঝি। তিনটি প্রাণীর সংসারে এর চেয়ে বেশি লীলাবতী চান না। তাছাড়া রান্না করা আর খাওয়ানো তাঁর বিশেষ কাজ, নিষ্ঠার তৃপ্তি। সুব্রত তাঁর বাপের বাড়ির গাঁয়ের অতি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়— হয়তো বা আত্মীয়তার চেয়ে ঘনিষ্ঠতাতেই সেখানে সম্পর্কের সৃষ্টি— এক বোনের ছেলে। এখন বিদেশে থাকে। অনেক বছর পর এসেছে। বড়ো হয়ে এই প্রথম তার লীলাবতীর সাথে ভালো করে পরিচয়।

এখানে আসবার পর কয়েকটা দিন কেটেছে।

মালতী বললে, 'সে কী! খোট্টার দেশে ডালরুটি খেয়ে খেয়ে মুখ ফিরিয়ে এখন নিজের দেশে বসে খিদে বরং বাড়বে যে!'

সুব্রত মুখ তুলে হেসে বললে, 'না মালতী। সেখানে বদহজম হয়ে গেছে। তাতে যে খিদে একেবারেই থাকে না।'

— 'তাই হবে।'

লীলাবতী এবার মালতীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তুই আবার ওর কথায় সায় দিয়ে বসলি? ওর না-খাওয়ার অজুহাতকে প্রশ্রয় দেয়া হল না?'

মালতী অপ্রতিভ হল।

সুব্রত বললে, 'অজুহাতে মোটেই নয়। বিশ্বাস করুন মাসিমা আজ আমার সত্যি খিদে নেই।'

— 'আচ্ছা সে কথা পরে হবে।'

— 'পরে হবে মানে? ব্যাপারটা যে এখনেরই!' সুব্রত হেসে উঠল।

লীলাবতীও হেসে বললেন, 'সুব্রত, ছোটোবেলায় তোমাকে দেখেছি যে উলটো?'

— 'দেখুন মাসিমা, ছোটোবেলা এমন একটি বয়স যার গায়ের রঙ আর কোনো কালের রঙ-এর সাথে মেলে না। শুনেছি তখন কেবল নদীর দিকে ছুটে যেতাম। কিন্তু এখন জল দেখেই ভয় হয়, সাঁতার জানিনে! একেবারে উলটো।'

— 'কী বল? তাহলে একেবারে খোট্টাই হয়ে গেছ দেখছি।'

— 'কতকটা বটে।'

লীলাবতী একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'তাহলে জলপথে বেড়ানো তোমার পক্ষে ভালো নয়।'

— 'তা বটে।'

এরপর কতক্ষণ চুপচাপ। সুব্রত মুখ নিচু করে নিঃশব্দে খেতে লাগল।

মালতী হঠাৎ বললে, 'ও কথা সব সময় সত্যি নয় মা। আমি এমন অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি যেখানে খুব ভালো সাঁতার জেনেও জলে পড়ে মরেছে। তোমার কি মনে নেই মা— সেই—'

— 'তা জানি। কিন্তু সেটা হল অদৃষ্টের কথা। সাঁতার জানলে একটা আশা অন্তত থাকে তো?'

মালতী কোনো উত্তর না দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে চেয়ে রইল। তার এমন হয়, মাঝে মাঝেই হয়, পূর্ণ উদ্যমে একটা আলোচনায় যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত আর টিকে থাকতে পারে না, ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে নিজেও বুঝতে পারে তার এটা স্বভাবের দুর্বলতা এবং এটা খুব বেশি দিনের অর্জিত নয়— সুব্রত আসার পর থেকেই। অথচ আলোচনার মাঝে ভেঙে পড়ায় সুব্রতর সাথে যে কী সম্পর্ক সেটাও বিবেচ্য এবং এটা যেন একটা মিষ্টি স্বপ্ন। মালতী দেখে, এই স্বপ্নের রাত সবে শুরু হয়েছে। মালতী একটা কোমল প্রার্থনায় উল্লসিত হয়ে ওঠে ; হে ঈশ্বর, এই রাতের উত্তরীয়কে মেলে দাও অশেষের দেহে।

তার আকস্মিক অন্যমনস্কতার কারণ যদি কেউ খোঁজে তবে এখানেই হয়তো একটু আলোর রেখা পাওয়া যেতে পারে, হয়তো পারে না ; কারণ এখনও মালতী স্থির নিশ্চিত নয়, সে কোনো ভিন্ন পথে চলেছে কি না, সে পথে তার একা চলায় সেই রাতটির সান্নিধ্য আছে তো!

কীসের সেই স্বপ্ন?

মালতীর অন্যমনস্কতা বেড়ে চলে। অথচ কোথায় গিয়ে শেষ হবে তার স্থিরতা নেই। চাইবার নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে দৃষ্টির ক্লান্তি আসবে— তার অক্লান্ত অন্যমনস্কতায় চোখের কার্যক্ষমতা শতগুণ বেড়ে যাবার কথা, এ ব্যাপারটা ভাববার এবং কাজে লাগাবার অবসর

তার আছে। তাই দু-পক্ষের গাম্ভীর্যনিবিড় নিস্তব্ধতায় মালতী তার স্বপ্নের পথ দিয়ে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছালো যা সুব্রতও গভীরভাবে চেয়েছে।

সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

খাওয়ার পর শোবার ঘরে ঢুকবার সময় সুব্রত দেখল অন্ধকার বারান্দায় যে মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, সে মালতী।

সুব্রত কিছুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে বললে, 'তুমি?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'আচ্ছা মালতী, একটা কাজ করবে?'

— 'বলুন।'

— 'আমার একটা অভ্যাস— ঘুমুবার আগে বই না-পড়লে বা কাছে বসে কেউ গল্প না-করলে ঘুম হয় না। আপাতত বই যখন নেই তখন তুমি একটু গল্প করবে?'

এছাড়া আর উপায় নেই তবু নির্লিপ্তভাবে মালতী বললে, 'আচ্ছা'।

সুব্রত তার হাত ধরল— যদিও হাত ধরার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এবং দুজনে একসাথে ঘরে ঢুকল। সুব্রত ঘুমুবার চেষ্টা না করে বসল একটা চেয়ারে, মালতী তার বিছানায়।

আগের সহজতা যদি ফিরিয়ে আনা যেত তবে মালতী যে কাউকে মনে প্রাণে আশীর্বাদ করত। সুব্রত বললে, 'ছুটি ফুরিয়ে এল। এখন না-যাওযাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না।'

এইবার মালতীর চমকে ওঠা অস্বাভাবিক নয়, সে বললে, 'কী বললেন?'

— 'বোধ হয় পরশু চলে যাব। এখানে অনেকদিন রইলাম। জীবনে একটা পরিবর্তন হল। কয়েকটি আপনার মানুষকে চিনতে পারলাম, তাদের ভালো লাগল। এখন পশ্চিম মরুভূমিতে ফিরে গিয়ে নিজের মনের সাথে বোঝাপড়া হয়তো আর হবে না— ঠিক সেখানেই মুশকিল। উপায় যদি থাকত তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম।'

হঠাৎ এ কথার কী মানে মালতী তা বোঝে। তাই অভ্যাসমতো অনির্দেশ তাকাতে লাগল— দেখল, ওপরের দিকে, ফোটোতে, মেঝেতে, চারদিকে। তারপর যখন তার এই অভ্যাসের সাময়িক সমাপ্তি হল সুব্রতর সাথে দৃষ্টিবিনিময়ে, তখন সে একপলকে হেসে বললে, 'ঠিক নিয়ে যাবেন তো? তাহলে বাবাকে বলি?'

— 'বলো।'

— 'সেখানে কিছু দেখাবার আছে?'

— 'অনেক কিছু। কিন্তু তুমি কি সেসব দেখবে?'

যেন সেখানে তারা ইতিমধ্যে চলে গেছে এভাবে সুব্রত বললে।

— 'না।' — স্পষ্ট এই বলে মালতী তার কাপড়ের আঁচল এমনি পাকাতে লাগল। সুব্রত তার হাতের দিকে চেয়ে রইল। সুন্দর, নিটোল, ফরসা, অনেকগুলো চুড়িতে আঙুলগুলো সুরু, শীর্ণ— কথার সঙ্গে এঁকে-বেঁকে নড়ছে।

সে বললে, 'ভারী সুন্দর তো! দেখি তোমার হাতখানা।'

মালতীর চোখে বিস্ময় নেমে এল। ধীরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষণেক পরে সে অনুভ করল : একটি আলোর রেখা যেন তার হাতের লোমকূপ দিয়ে প্রবেশ করে শরীরে অণু-পরমাণুতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

এখন বোধ হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রীকে আক্রমণ করেছে, নইলে শ্বাস ফেলতে ক হয় কেন? সে স্তব্ধ হয়ে তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সুব্রত বললে, 'তুমি খেয়েছ? যাও—'

বিছানার উপর হাতদুটো আরও ছড়িয়ে আরও চেপে বসে মালতী বললে, 'মা'র স খাব—আপনার এখন ঘুম আসবে না আমি জানি।'

— 'সেটা তো তোমারই আগে জানবার কথা।'

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে মালতী হেসে বললে, 'বারে, আপনি আবার তা জানলে কেমন করে?'

সুব্রত সে কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে বললে, 'মালত আমার সত্যি বড়ো ঘুম পাচ্ছে। তুমি এনে দেবে তাতে একটা স্বপ্ন?

হে মালতী—

স্বপ্নাঞ্চল মেলে ধরো আমার চোখেতে!'

মালতীর দু-চোখ কী এক স্নিগ্ধতায় নিবিড় হয়ে উঠল। সে একটু ঝুঁকে পড়ল।

কোনো এক অলিখিত কাব্য টুকরো টুকরো হয়ে সেই ঘরের বাতাসে শূন্যতায় গভীরভা মিশে গেল।

আলোর রেখাগুলো যেন কাঁপতে লাগল।

—'মালতী— ও মালতী—'

লীলাবতী এসে ভয়ানক চমকে উঠলেন। মালতী তার রেশমের মতো হালকা, মসৃ খোলা চুলগুলো খোঁপায় ঠিক করতে করতে মা-র কাছে এসে মুখ নিচু করে দাঁড়াল।

বাইরের দুরন্ত বাতাস ঘরে এসেও মাতামাতি করছে। সুব্রত একটা নিদ্রাহীন বাই অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হল : ব্রজকিশোরবাবুর মতো সেও যেন আ কোন্ এক পদ্মার প্রবল কল্লোচ্ছ্বাস শুনতে পাচ্ছে।

যখন সে জাগল তখন একটু বেলা হয়ে গেছে। অনেকখানি রোদ ছড়িয়ে পড়ছে বিছানায় সে ব্রজকিশোরবাবুর উঁচুগলায় স্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে পাচ্ছে।

লীলাবতী গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু চিরকালই ঠিক এমনি ছিলেন কি না তা অজ্ঞাত আজ কতদিন হয় কে জানে— আশ্চর্য ব্যাপার— স্বামীর সঙ্গে তাঁর এতটুকু কথা পর্য হয় না। ছোট চৌধুরী পরিবারে এ নিয়ে কোনো অসুবিধে বড়ো দেখা যায়নি। এবং এ সহজ যে, যে কেউ প্রথম এলে তার চোখে এটা ধরা পড়বে না, যে পর্যন্ত-না কেউ বলে

এমনিও দেখা যায়, লীলাবতীর আত্মমর্যাদাবোধ বড়ো প্রখর। বোধ হয় তাতে কোনোদিন কোনো আঘাত লেগেছিল এবং সেইজন্য তিনি তাঁর নিজের স্বামীকেও সইতে পারেননি।

কিন্তু এতদিন সাংসারিক সব কিছু অভাব-অভিযোগ, ত্রুটি একা নিজের মনেই বিচার করে সফল হয়েও আজ সত্যি জটিলতায় পড়ে পথ হারিয়ে ফেললেন, তারপর সারারাত ভেবে কোনো কুলকিনারাই পেলেন না।

এখন অনেক বেলা হয়েছে। লীলাবতী কাজের ফাঁকে কেবল ভাবতে লাগলেন এরকম মানসিক দ্বন্দ্বে সারাজীবনে আর পড়েননি।

শেষে একটা উপায় স্থির হল।

তখন দুপুরবেলা। বাইরে রৌদ্র খাঁ-খাঁ করছে। চারদিকে অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

লীলাবতী যেভাবে সাধারণত থাকেন সেভাবেই ঘোমটা দিয়ে ব্রজকিশোরবাবুর ঘরে ঢুকলেন। কতদিন পর এই প্রথম তাঁর এ ঘরে আসা এবং কথা বলা!

কিন্তু ব্রজকিশোরবাবু আশ্চর্য হলেন না। যেন সব সময়েই কথাবার্তা হয় এমনভাবে অথচ গাম্ভীর্য বজার রেখে বললেন, 'কোনো কথা আছে?'

— 'হ্যাঁ।' লীলাবতীর কোনো ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না, তিনি সহজভাবেই বললেন, 'মালতীর বিয়ের তো কিছুই করা হচ্ছে না?'

— 'পেলে তো হবে।'

— 'আমি বলি সুব্রতর সঙ্গে—'

ব্রজকিশোরবাবুর চোখদুটি বড়ো হয়ে উঠল।— 'কী বললে? নলহটির চৌধুরীদের মেয়ের বিয়ে হবে একটা সামান্য...তোমার আত্মীয় বলে জাত খোয়াতে যাব? অর্থ-অসামর্থ্যের সুযোগ নিচ্ছ? মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দিলেও তা হবে না, কক্ষণও না, মরে গেলেও না। অতিথিকে আদর-যত্ন করা মানেই কী তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়া?'

— 'দেয়ার কারণ ঘটেছে বলেই বলছি।'

ব্রজকিশোরবাবু প্রথমে একটু আহত হয়ে পরে আবার কঠিন স্বরে বললেন, 'যা ইচ্ছে ঘটুক, তুমিই একমাত্র সেটা জান, লোকের মধ্যে রটে গেলে তুমিই সেজন্য দায়ী থাকবে। কিন্তু তাও যদি হয় তবু ওর সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না, দেব না জেনো। রায়চৌধুরী বংশের এমন অপমান হলে পূর্বপুরুষেরা অভিশাপ দেবেন। আমি ঠিক জানি তাঁদের মৃত আত্মা শান্তি পাবে না।'

লীলাবতী সেখানে আর এক মুহূর্ত না-থেকে নিজের ঘরে এসে দরজা দিলেন। মেয়ের কথা মনে করে আজ অনেকদিন পরে এই প্রথম তাঁর দু-চোখ ছাপিয়ে কান্না এল।

পরদিন।'

সুব্রত ঠিকই চলে যাচ্ছিল। জিনিসপত্র সঙ্গে তেমন কিছু নেই। যা আছে, গোছ গাছ করা হয়েছে।

বারোটায় গাড়ি।

লীলাবতীর কদাচিৎ সাক্ষাৎ মিলেছে। আর মালতীর তো একেবারেই নয়। খাওয়া-দাওয়ার পর সে ব্রজকিশোরবাবুর ঘরে এল।

তিনি বললেন, 'এখনও তো সময় আছে। বসো।'

সুব্রত বসল।

— 'আমার ইচ্ছে তুমি পুজো পর্যন্ত থাকো।'

— 'সে তো অনেক দেরি?'

— 'তা হোক না। বাঙালির ছেলে পুজো না দেখতে পারলে তার চেয়ে দুর্ভাগ্য কী আছে? তাছাড়া আমরা তোমার পর নই। তুমি থাকলে কত আনন্দ হত! পূর্বপুরুষেরা যা রাজসিকভাবে করছেন তাই কোনো রকমে চালিয়ে নিই আর কী! তখনকার দিনে যা হত তা শুনলে আশ্চর্য হবে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হবে না, এখন তো তার শতাংশের একাংশও নয়। আর একটা ব্যাপার শুনলে অবাক হবে— আমার বাবা এবং তাঁর পূর্বপুরুষেরা সকলে নিজেরাই দুর্গাপুজো করেছেন, কোনো বামুন পুরুত লাগেনি, আর এমন মন্ত্র জানতেন যা অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও জানেন না। অথচ আমি তাঁরই ছেলে। বংশানুক্রমিক গৌরব অর্জন না করার ধৃষ্টতা আমার আছে!'

আরও অনেক কিছু বললেন ব্রজকিশোরবাবু। কতক্ষণ পরে সুব্রত প্রণাম করে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল।

লীলাবতীকে পাওয়া গেল। কিন্তু কোনো রকমেই মালতীর দেখা পাওয়া গেল না।

সুব্রত স্টেশনে এল। টিকেট করে একটা নির্জন কামরা বেছে নিল। তারপর হুইসল দিয়ে গাড়ি ছাড়ল, শহরের সীমা ক্রমে বিলীন হয়ে গেল।

সুব্রত জানালায় মুখ রেখে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। দু-পাশে তখন মাঝে মাঝে জলচিহ্নাঙ্কিত খোলা মাঠ, ধূ ধূ করে। আরও দূরে একটানা গাছের সারি, মধ্যে উঁচু তালগাছ। মাঠ ভরা মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র ঝিম ঝিম করে।

সে এক টুকরো কাগজ নিয়ে লিখতে বসল। মালতীকে লিখতে লিখতে চোখে জল ভরে এল। সে কাগজটা তুলে জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে ছেড়ে দিল।

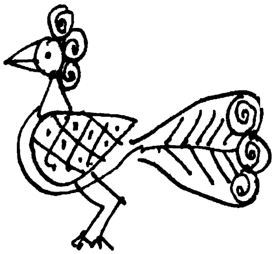
প্রবল বাতাসের বেগে সেই চিঠি পড়ল এক বাবলাগাছের ছায়ায়। প্রান্তর পার হয়ে সেখানে গভীর বনানী— অজস্র বুনো-ফুলের গন্ধ, তার মাদকতা, বাঁশঝাড়ে কিচকিচ আওয়াজ, পাখির ডাকে মুখরিত আকাশ, হিংস্র প্রাণীদের নির্ভর বিচরণ, আজ নির্জনতার গন্ধে ভরপুর।

গাড়ি চলে গেল।

আর মালতীকে লেখা সেই চিঠি বাবলাগাছের ছায়ায় বসে বুনোফুলের গন্ধ শুঁকতে লাগল।

একটি নেপথ্য নাটক

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়



খবরটা ভালো করে শোনার আগেই আমার ঘরের রমণীটির মুখখানা যা হল তা দেখলে কোনো ভদ্রলোকের আর খবর দেবার উৎসাহ বোধ করা উচিত নয়। বিশেষ করে ভালো খবর শোনাতে গেলেও যদি এই মুখ হয়। কিন্তু ঘরে তখন তার বড় জা'টিও ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সহৃদয়া। ছোট জায়ের নিস্পৃহ অবহেলা তুচ্ছ করেই আগ্রহ প্রকাশ করলেন, থামলে কেন, কি হল বলো না শুনি?

আমি প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক নই। অর্থাৎ, ঘরণীর মুখের প্রায় অপমানকর অভিব্যক্তি সহ 'হুঁঃ।' বচনের ঘায়ে পুরুষকার আহত হবার মত ভদ্রলোক নই। তা ছাড়া খবরটাও ফেল্‌না নয় যখন, ভ্রাতৃজায়ার আগ্রহটুকু অবলম্বন করেই উৎসাহের আঁচটা আর একবার উঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তার আগে তাঁর উদ্দেশে স্ত্রীটি ছোটখাট ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, শুনবে আবার কি, ছেড়া কাঁথায় শুয়ে এবারে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে বলোগে। শুনতে হয় নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসে শোনোগে, রাত জেগে আমাকে এখন এক গাদা খাতা শেষ করতে হবে—

বিরাগের যথার্থ হেতু আছে। তার ইস্কুলের ষান্মাসিক পরীক্ষার শ-চারেক খাতায় নম্বর বসাতে হবে। আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ছুটি শেষ। ইস্কুল খুললেই মেয়েরা নম্বর নম্বর করে মাথা খাবে। সংসারের ঝামেলায় গোটা ছুটিতে পঞ্চাশটা খাতাও দেখা হয়নি। কোনদিন হয়ও না। এ-ব্যাপারটায় বরাবরই সে আমার সাহায্য প্রত্যাশী। এবারেও যথারীতি কথা দিয়েছিলাম দেখে দেব। কিন্তু দেব দেব করে এ পর্যন্ত একটা খাতা ওলটানোরও ফুরসত হয়নি। ফলে ভালো খবর শোনারও ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা গেছে। বিছানায় খাতার গাদা ছড়িয়ে বসেছে।

কথা না বাড়িয়ে আমি পকেট থেকে লম্বা খামটা বার করলাম। তার ভিতরের বস্তুটি বার করতে গিয়ে খামের একটা ধার ছিঁড়ে গেল। একটানে আমি বাকিটুকুও ছিঁড়ে ফেললাম। খামের ভিতর থেকে যা বেরুল, আচমকা দুজনেই তারা মন্ত্রমুগ্ধ। করকরে নোট্‌ একতাড়া, সব একশ টাকার। কড়া কলপ-দেওয়া ইস্তিরি করা নতুন জামাকাপড়ের মত খড়খড়ে নতুন।

বউদিরই বাক্‌স্ফুরণ হল প্রথম, ও-মা সত্যিই তো রে! কত টাকা?

আড়াই হাজার। পরে আরো আড়াই হাজার পাব।

আর খবর শোনার ধৈর্য থাকল না। এক-গাল হেসে খবরটা দাদাকে অবিলম্বে শোনবার জন্যে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

অতঃপর স্ত্রীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি। কিন্তু তার বিস্ময়ের ঘোর একেবারে কাটেনি। নোটের তাড়া হাতে তুলে নিল। দেখল। আগোচরে নাকেও ঠেকালো একবার।

টাকার গন্ধই তো?

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলল। —বেশ যাও! ছড়ানো খাতাগুলো এক-হাত ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিল। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে বসতে পারি। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ বইটা নিলে?

বই না, ছোটগল্প। বাড়িয়ে দিতে হবে—

কোন্ গল্পটা?

হেসে বললাম, তোমার সেইটাই।

খুশি হবে জানতাম। শীলা ভারি খুশি। নাম শীলা বটে, কিন্তু আজকাল নামটা খুব মানায় না ওকে। সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারি না। আমার ওপর হামেশা তার রাগ-বিরাগের ঝাপটাটা খুব নিভৃতের ব্যাপার নয় এখন। তবু এই নামে এখন আর যে ওকে মানায় না এ-কথা এক আমার ছাড়া আর বোধহয় কারো মনে হয়নি। 'সেই গল্পটা' বলার পিছনে আর তার খুশির পিছনে একটা মানসিক যোগ আছে।

গোড়ায় গোড়ায় আমার সব লেখার প্রতি আগ্রহ ছিল। কি লিখছি, কি লিখব, কি লেখা উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা হত। কোন্ গল্পের পরিণতি কি হওয়া উচিত তাই নিয়ে আগে থাকতে মতামত ব্যক্ত করে বসে অনেক বিভ্রান্তও করত। উল্টো রাস্তায় গিয়ে অনেকবার মন কষাকষিও হয়েছে। কিন্তু সাংসারিক স্রোতের ধারায় পড়ে লেখাব ওজন টাকার ওজনে মাপতে মাপতে স্বাভাবিক আগ্রহটুকু এখন স্বাভাবিক নিস্পৃহতায় এসে ঠেকেছে। কিন্তু লিখতে বসলে বড় জোর জিজ্ঞাসা করে, কার জন্য লিখছ বা কত টাকা দেবে? উপন্যাস লিখতে বসেছি দেখলে তবু একটু খুশি হয়। এর পিছনে কিছুটা স্ফীত অঙ্কের আশ্বাস আছে। সংসাব নির্বাহের প্রয়োজনে এই আশ্বাসও না থাকলে সবই অন্ধকার, তা আমিও জানি। তবু কোনো আশ্বাসের কথা না ভেবেই আগে এক-একটা উপন্যসের জট ছাড়িয়ে লক্ষ্যের মোহনায় পৌঁছনোর চেষ্টার দুজনের অনেক বিনিদ্র রাত কেটেছে। সেই সব স্মৃতি কেন জানি আমার ভিতর থেকে মুছে যায়নি একেবারে।

কিন্তু আমি ওর দোষ দিই না একবারও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনির পরে সাহিত্যপ্রীতির ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। যত রাত বাড়ে ততো মেজাজ চড়ে। মেয়েটা তেমন দোষ না করেও ঝাঁঝালো কথা শোনে, সময়ে না ঘুমুলে অবুঝ ছেলেটার পিঠেও দু'চার ঘা পড়ে। তারপর নিজে গজগজ করতে করতে শোয়। কিন্তু রাতে গজগজানি বেশিক্ষণ শুনতে হয় না, অভিযোগের তালিকার মাঝামাঝি পৌঁছনোর আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

তার সব থেকে বেশি রাগ ইস্কুলটার ওপর। আমার লেখার অনিয়মিত রোজগারের সঙ্গে ওর স্কুলের নিয়মিত দেড়শ টাকা যুক্ত না করলে দু'হাতে কচুরি-পানা ঠেলেও সংসারতরীটি মাসের শেষের মাথায় টেনে নিয়ে যাওয়া শক্ত। আজ তিন বছর ধরে চাকরি ছাড়ার জন্য এক পায়ে প্রস্তুত সে। ওর দেড়শ টাকার জায়গায় আমার রোজগার আর একশটা টাকা বাড়লেই চাকরির মুখে ঝাঁটা মেরে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার রোজগার বাড়বে সে প্রত্যাশা আর বোধহয় করে না। অথচ আমার রোজগার আসলে সত্যিই কিছু বেড়েছে। সংসারের খরচ সেই তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে বলে বাড়তিটুকু তার চোখই পড়ে না। সে-কথা বলতে গেলে চোখে খোঁচা পড়বে। তাই এ-ব্যাপারে আমি প্রায় মৌনী।

তার অভিযোগ, ইস্কুলের হেডমিসট্রেস, অ্যাসিসট্যান্ট হেড মিসট্রেস, সিনিয়র টিচার, সেক্রেটারি সকলেই তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। চাকরি করছে বলে মাথা কিনেছে ভাবে। একধার, থেকে ওর ঘাড়ে ক্লাস চাপায় আর খাতা চাপায় আর উপদেশের ছলে কড়া কথা বলে। অভিযোগগুলো সত্যি কিনা আমি কখনো যাচাই করে দেখিনি। হতেও পারে সত্যি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, চাকরিটা চক্ষুশূল বলেই অভিযোগগুলো চার-গুণ সত্যি হয়ে সর্বদা ওর মাথায় ঘোরে। তাছাড়া ওপরওয়ালাকে বরদাস্ত করার ধাত নয় যার, ওপরওয়ালার সহজ কথাও সে বাঁকা শুনে থাকে। কিন্তু এইসব বিশ্লেষণ আমার একান্ত নিভৃতের।

এবারে 'সেই গল্পটা'র ইতিবৃত্ত বলি। লম্বা ছুটি-ছাটা এলে ঘরণীয় মেজাজ সর্বদাই অতটা সপ্তমে চড়ে থাকে না। তখন ইচ্ছেমত সংসার আর ছেলেমেয়ের দেখাশুনা করেও আমার সদ্য কোনো লেখা নিয়ে একটু-আধটু মাথা ঘামানোর অবকাশ পায়। সমাপিকা গল্পটা ওর গত ছুটিতে লেখা। গল্পটা লেখার সময়ে একটা তেরস্পর্শের যোগ হয়েছিল। অর্থাৎ শীলার অবকাশ ছিল, আমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল, আর সম্পাদকের গল্পটা অবিলম্বে হাতে পাওয়ার তাড়া ছিল। আমি লিখে উঠতে পারছিলাম না, শীলা আমার হয়ে কলম ধরেছে। আমি বলেছি, ও লিখেছে। ফলে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর মতান্তর ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত ওর মনমতই গল্পটা খাড়া করে তুলেছিলাম। শেষ হতে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বলেছিল, সত্যিই গল্পটা ভালো হয়েছে।

আমি যেমনই লিখে থাকি, গল্পটা ওর ভালো লেগেছিল। আমার নির্বাচিত সঙ্কলনে ও গল্পটার স্থান দিইনি দেখে মুখ বাঁকিয়ে বলেছে, ওকে জব্দ করার জন্যেই সঙ্কলনে এটা বাতিল করা হল।

কিন্তু গল্পটা সত্যিই এমন কিছু অভিনব নয়। লেখকের বা লেখক সঙ্গিনীর দরদটুকু ছেঁকে তফাত করে দিলে এমন কিছুই নয়। তবে দরদের ওজনটাও একেবারে ফেলনা নয় বটে। গল্পের বিষয়বস্তু দু'কথায় বলে নেওয়া দরকার। একটি সাধারণ ঘরের ছেলে একটি সাধারণ ঘরের রূপসী মেয়েকে ভালবাসত। দু'জনারই সংগ্রামী জীবন। ছেলেটি মরীচিকার

আশায় ক্রমশ বাঁকা পথে তলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এ যুগেও একটি শিক্ষিতা রূপসী মেয়ের অনেক শক্তি। সে সোজা রাস্তা ধরেই দৃপ্ত চরণে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুজনের মানসিক ব্যবধান বাড়ছে, বস্তুতন্ত্রীয় ফারাক বাড়ছে। উপসংহারে চূড়ান্ত স্খলনের এক বেদনাকরুণ মুহূর্তে মেয়েটি অনেক প্রলোভন তুচ্ছ করে ছেলেটিকে আবার সুস্থ জীবনের পথে টেনে তুলছে।

গল্পটা কেন শীলার এত পছন্দ হয়েছিল সেটা এবারে সহজ অনুমানসাপেক্ষ। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, তার অতটা আগ্রহে বোনা বলেই হয়ত আমারও নিতান্ত মন্দ লাগেনি। আরো দু'চারজন যখন প্রশংসা করেছিল গল্পটার, তখন এমনও মনে হয়েছিল নির্বাচিত সঙ্কলনে ওটা দিলেই হত। পরের সংস্করণে ওটা জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও আছে।

এই সমাপিকা গল্পটাই এক নামকরা চিত্র-প্রযোজকের মনে ধরেছে। তারই ফলে আমার নগদ আড়াই হাজার টাকা প্রাপ্তি, আর, ওটা ঠিকঠাক করে দিলে আরো আড়াই হাজারের প্রতিশ্রুতি।

একটা দিনের মধ্যে বাড়ির হাওয়া বদলে গেল। গল্পটা ভালো করে বাড়িয়ে দেবার জন্যে শীলা উঠতে-বসতে তাড়া দিতে লাগল। সংসার আর ইস্কুলের খাটুনির পরেও রাত জেগে শোনে কতটা কি করলাম। তর্ক করে, পরামর্শ দেয়, কোথায় অদল-বদল করা দরকার নির্ভয়ে আর নির্দ্বিধার তা ব্যক্ত করে। নিজের দিক থেকে এবারে আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি, আর পরিশ্রম সার্থক হল বলেও ভাবছি।

শীলার খেদ, অনেক আগেই চিত্রজগতের দিকে চোখ রেখে লেখা উচিত ছিল। তার আশা, এ ছবিটা ভালো হলে বছরে একটা করে অন্তত ছবির কন্ট্রাক্ট হবেই। আর তা হলেই সে অনায়াসে ইস্কুলের চাকরি ছাড়তে পারবে। এই লেখাটা শেষ হলে আর একটা ছবির প্লট ভাবার তাগিদ দিয়ে রেখেছে সে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপিকা লেখার কাজ শেষ হল। প্রযোজক শুনলেন। শুনে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হলেন। তারপর ছবির সুনিশ্চিত আর্থিক লাভের দিকে চোখ রেখে ছোটখাট একটা বক্তৃতা করে ফেললেন। ছবির গল্পে কোন্ ধরনের আবেগের প্রাধান্য থাকা দরকার, প্রথম প্রণয়-পর্বটি কতটা উষ্ণ-ঘন হওয়া অনিবার্য, নায়ক-নায়িকার আবেগ-মধুর সান্নিধ্যের উপযোগী কিছু সিচুয়েশনের অবতারণা, ইত্যাদি। তাঁর নির্দেশ, গল্পের এই ত্রুটিগুলো বেশ ভেবে চিন্তে সেরে দিতে হবে।

স্টুডিওতে প্রযোজকের ঘরে বসেই আবার দিনকতক ধরে মেরামত আর নতুন সংযোজনের কাজটি সম্পন্ন করতে হল। শুনে প্রযোজক বললেন, মোটামুটি হয়েছে, এখন এঁরা কি বলেন দেখি।

এঁরা অর্থাৎ, পরিচালক, আলোকশিল্পী, এডিটার প্রভৃতি। সকলকে নিয়ে প্রয়োজকের

ঘরে আবার একদিন শোনার আসর বসল। শোনাব পরে সকলেই ঠিক প্রযোজকেব মতই নির্বাক খানিকক্ষণ। আমি দুরু দুরু বক্ষে তাঁদের মতামতেব অপেক্ষায় বসে আছি:

পরিচালক নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, গল্প ভালোই তবে অনেক জোড়াতাপ্পি লাগবে এখনো। তাঁর মতে গল্পে বিস্ময়সৃষ্টির দিকে আমি আদৌ চোখ দিইনি। যা ঘটতে পাবে তাই শুধু ঘটছে, অপ্রস্তুত দর্শককে হকচকিয়ে দেবাব মত ঘটনা-সংযোজন দবকার। এছাড়া মাঝে মাঝে কমিক রিফিল না থাকলে গল্প দর্শকের বুকে চেপে বসবে। সেদিকে চোখ বেখে দুই একটা চরিত্র আমদানি করতে হবে। এছাড়া আভাসে-ইঙ্গিতে যা-কিছু বলা হয়েছে, সেগুলো স্পষ্ট করে সাধারণ দর্শকের বোধগম্য করে দিতে হবে—পয়সা তো তারাই দেয়।

প্রযোজক এবং আর সকলে একবাক্যে সমর্থন কবলেন তাঁকে। এরপর আলোকশিল্পী তাঁর ক্যামেরা স্কোপ প্রসঙ্গে কিছু পরামর্শ দিলেন, আর এডিটাব ছবির স্পিড প্রসঙ্গে। মাথাটা কি এক দুর্বোধ্য বাষ্পে ভরাট হয়ে উঠছিল। বাকি পাওনা আড়াই হাজার টাকার অঙ্কটাও কেমন ঘষা-মোছা লাগছে। যাই হোক, প্রযোজকের অফিস-ঘরে বসে আবাব পনেব বিশ দিনে একাগ্র পরিশ্রমেব পব অদল-বদল সংযোজন বিয়োজনেব ব্যাপারটা সম্পন্ন হল। কিন্তু কি যে দাঁড়াল, আমি সঠিক বলতে পাবব না। গভীর মনোনিবেশ সহকারে কর্মকর্তাবা শুনে মন্তব্য করলেন, চল্‌তে পারে—।

আমার বুক থেকে যেন পাহাড় নামল। কিন্তু না নামাই উচিত ছিল। এর দিন কয়েক পবে বাকি টাকাটা পাওয়ার আশাতে প্রযোজকের কাছে এসেছিলাম। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, এসেছেন খুব ভালো হয়েছে, আপনাকে খবব দেবার জন্যে এক্ষুনি লোক পাঠাব ভাবছিলাম। চলুন একবাব ঘুরে আসি—

কোথায়?

আসুন না—

প্রযোজকের গাড়িতে চেপে যে বাড়ীর গেটের সামনে এসে থামলাম, সেই বাড়িটা আমি চিনি না। কিন্তু গাড়িতে বসে শুনেছি কার সঙ্গে সাক্ষ্যৎকারের উদ্দেশ্যে চলেছি। শোনার পর থেকে মনে মনে আমি বিলক্ষণ বিচলিত। বহু নাম শোনা আর বহু ছবিতে দেখা যশস্বিনী চিত্রতারকার আবাসে এসেছি আমরা। সদ্য বর্তমানের ছবিটির ইনিই নায়িকা। উনি নিজেই নাকি আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাতের অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন। প্রযোজককে বলেছেন, আমার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া আছে।

খবর পেয়ে মহিলা এলেন। আমি যুক্ত করে বি-নত হলাম। প্রযোজক হেসে বললেন, আসামী হাজিব, আপনি বোঝাপড়া করে নিন।

আসামীর মুখ দেখে মহিলাটির হয়ত করুণা হল। বললেন, আগে একটু চা হোক কেমন?

আমি কৃতার্থ হয়ে বোকার মত মাথা নেড়ে বসলাম, অর্থাৎ চায়ের তৃষ্ণা আপাতত নেই জানালাম। মহিলা সরাসরি কাজের কথায় এলেন। বললেন, আপনার গল্প ভালো, কিন্তু

আপনার নায়িকার প্রতি আপনি সুবিচার করেননি। আগুনের ফুল্‌কির মত মেয়ে— তার কাজ আর সংলাপও তেমনি হওয়া দরকার। নায়কের প্রতিটি চাল-চলন তার চোখের ওপর থাকবে, নায়ককে সে লাগামের মুখে রাখবে, সংঘাত আরো জোরালো হবে— অথচ ভিতরে ভিতরে সে কাঁদবে। এ-ধরণের কিছু সিচুয়েশান ভাবুন, নইলে মেয়েটির আদর্শ তেমন উঁচু হয়ে উঠছে না।

প্রযোজকের সংপ্রশংস অভিব্যক্তি। ফেরার পথে গাড়িতে বসে বললেন, আপনার গল্প পছন্দ হয়েছে বলেই এতটা ইনটারেস্ট নিচ্ছে— ভালই তো হল, ওঁকে যত বেশি ছবিতে দেখানো যায়। যা বললেন ভেবে চিন্তে করে দিন।

করে দিলাম।

এরপর টাকার জন্য আবার দিন কয়েক প্রযোজকের স্টুডিও-অফিসে হানা দিয়েছি। কিন্তু ছবির প্রাথমিক কাজে তিনি এত ব্যস্ত যে আগমনের উদ্দেশ্যটা আমি বলে উঠতে পারছিলাম না। সর্বদাই পাত্র-মিত্র পরিবৃত হয়ে আছেন তিনি।

কিন্তু অদৃষ্টে তখনো কিছু বাকি ছিল জানতুম না।

সেদিন এসে দেখি ঘরে গুরুগম্ভীর মুখে ছবির নায়ক বসে। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজক তাঁর দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করলেন একটু। তারপর আমাকেই বললেন, ইনি তো আপনার এই গল্পে কাজ করতে চাইছেন না।

আমি হতভম্ব। এই নায়কটিও যশস্বী শিল্পী, হেলাফেলার লোক নন। কম্পিতবক্ষে আমি তাঁর পাশের খালি চেয়ারটাতে বসলাম। কিন্তু নায়কটি আর একদিকে ঘাড় ফিরিয়ে রইলেন।

আমি অপরাধীর মত প্রযোজককেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল....

নায়ক আমার দিকে ফিরলেন এবার। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে নির্লিপ্ত মুখে বললেন, লেখকদের গল্প বেশিরভাগই নায়িকাপ্রধান হয়, কিন্তু এতটাই যদি হবে, নায়ক চরিত্রের দরকার কি? শুধু নায়িকা নিয়েই গল্প হয় না?

আমি নির্বিরোধী মানুষ তবু একটা রুক্ষ জবাবই মুখে এসে যাচ্ছিল। কিন্তু এক-ঘর উৎসুক লোকের চোখের ঘায়ে জবাব মুখেই থেকে গেল।

নায়ক ধীরে সুস্থে বললেন, আপনার নায়িকার পাশে নায়কটি ডলপুতুলের মত হয়ে গেছে— তার স্কোপ বলতে কিছু নেই। সে অধঃপাতে যাক বা যেখানেই যাক, তার মধ্যে জ্বালা থাকবে, যাতনা থাকবে, পুরুষকার থাকবে। প্রতিষ্ঠা পেল না বলে একটা মেয়ের হাতের খেলনা হয়েও যে থাকতে রাজি নয় সে— এটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে আমার এতে এসে লাভ কি!

প্রযোজক তাড়াতাড়ি বললেন, সব হবে সব হবে, আপনি ভাবছেন কেন! আপনার রোল ছোট হলে তো আমার ছবি মার খাবে। আমার দিকে তাকালেন, এঁর দিকটা সত্যিই ভালো করে ভাবা হয়নি, সব শুনলেন তো, চরিত্রটা এবাবে বেশ করে ফুটিয়ে তুলুন।

তাও তুলেছি। সব মিলিয়ে কি করেছি আমাব ভাবার শক্তি নেই। বাকি আড়াহ হাজার টাকাও পেয়েছি। টাকাটা শীলার হাতে তুলে দিতে সে খুশিতে আটখানা। শিগগিরই ইস্কুলের চাকরিটা ছাড়া অসম্ভব হবে না ভাবছে সে। এবপর অন্য লেখা নিয়ে বসতে দেখলেও ভুরু কুঁচকেছে, বলেছে, ছবির আব একটা গল্পটল্প ভেবে রাখলে হত না।

ছবির কাজ যত শেষ হয়ে আসছে আমাব ততো মুখ শুকোচ্ছে। এদিকে আমার আপনজনেরা ছবির মালিকের প্রচারের ছটায় মন্ত্রমুগ্ধ। তাই আমার শুকনো মুখ কারো চোখে পড়েছে মনে হয় না। সারাক্ষণই কি এক অস্বস্তিকব যাতনা। অবশ্য সে-যাতনা যথাসাধ্য গোপন করতে চেষ্টা করেছি।

বাজার সরগবম করে একদিন ছবির মুক্তি ঘোষণা কবা হল। বাড়িতে একটা আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল। হলেব সামনে কত লম্বা লাইন হয়েছে আর কত মাথা গিসগিস কবছে তাব প্রত্যক্ষ বিবরণ শোনা যেতে লাগল। ছবির প্রশংসাও কানে আসতে লাগল। আমি যে চুপি চুপি ছবিটা একদিন দেখে এসেছি সে-কথা আব কাউকে বলা গেল না। শীলা আমার নিস্পৃহতা দেখে রীতিমত বিস্মিত। সেদিন দশ বছবের মেয়ে ইস্কুল থেকে ফিরে বলল, বাবা, আমাদের ক্লাসেব মেযেবা তোমার ছবি দেখতে চাইছে।

হঠাৎ একটা ধমক খেয়ে হকচকিযে গেল সে। তাব মা ঘরে থাকলে বিলক্ষণ অবাক হত। আদরেব মেয়েকে কখনো বকি না বলেই তাব রাগ। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে সে-ও হাসিমুখে বলল, কযেকজন টিচাব ধবেছে ছবি দেখাতে হবে— দুই একজন দেখেও এসেছে, খুব ভালো বলছিল। এবা পাশ-টাশ দেবে তো, নাকি?

আমি একটা দরকারি চিঠি লিখছিলাম, জবাব দেবার ফুরসত হয়নি।

আটদিনের দিন খবরের কাগজের সমালোচনা বেরুল। বাড়িতে আর একপ্রস্থ খুশির তরঙ্গ বয়ে গেল। কাগজওয়ালারা মোটামুটি প্রশংসাই করেছে ছবিটাব. বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র, সবল নারী সত্তার শক্তি-মাধুর্য, পুরুষেব আচ্ছন্ন পুরুষকার ইত্যাদিব অনেক গালভরা শব্দও চোখে পড়েছে। সমস্যাসঙ্কুল ছবিটিতে অনেক সুন্দর সুন্দব হাসির খোরাক আছে পড়ে শীলা অবাক। —এ গল্পে আবাব হাসি কোথা থেকে এলো?

তাব দিকে চেয়ে সেই প্রথম আমাব হাসি পেয়েছিল।

সেই সকালেই স্বয়ং প্রযোজক বাড়িতে এসে হাজির। তাঁর ধারণা ছবি 'হিট্' করবে। অবিলম্বে আর একটা গল্প লেখাব জন্য উৎসাহিত করে গেলেন তিনি। শুনে শীলা মুখ বাঁকালো। —গরীবেব কথা বাসি হলে ফলে, আমি যে ক'মাস ধরে তাগিদ দিচ্ছি কানেই যায় না!

ওর ধারণা, ও বলেছে বলেই কানে যাচ্ছে না, নইলে কানে যেত।

শীলা আর বউদি দলবলসহ ছবিটা দেখে এলো আরো এক সপ্তাহ বাদে। বাড়ির কর্ত্রী

সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে তারপর যেমন নিজে আহারে বসে, এই ছবিটা দেখার ব্যাপারেও তার তেমনি মনোভাব! সকলে দেখেশুনে তৃপ্ত হোক, তারপর নিজে দেখবে।

তারা ছবি দেখে ফেরার একটু আগে শীলার বোন আর ভগ্নিপতি এসে উপস্থিত। তারা দিনকতক আগেই ছবিটা দেখেছে। এরা ফিরতে সোৎসাহে ছবির আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বউদি বললেন, বেশ ছবি হয়েছে, আমার বাপু ভালই লেগেছে। ভালো কোথায় কার লেগেছে সেই বিশ্লেষণ চলতে লাগল। শীলা হাসিমুখে শুনছে, আর এক-এক বার আমার দিকে তাকাচ্ছে।

রাত্রি। ঘরের আলো নিবিয়ে আমি আগেই শুয়ে পড়েছিলাম। শীলা ওপাশে শয্যা নিল টের পেলাম। মাঝে ছেলে ঘুমিয়ে। অনেকক্ষণের একটানা নীরবতার পরে অন্ধকারে ছেলের গা ডিঙিয়ে একখানা হাত আমার বাহুতে ঠেকল।

ঘুমুলে?

না।

কি ভাবচ?

একটু থেমে বললাম, ছবির প্লট।

শীলার হাতটা আমার বাহুর ওপর থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল। একটু বাদে গালের নিচে হাত রেখে আধ-শোয়া হয়ে ছেলের ওপর দিয়েই এদিকে ঝুঁকল। আমার মুখ দেখতে চেষ্টা করছে হয়ত। দ্বিধা কাটিয়ে বলল, আমাদের যে-ভাবে চলছে চলে যাবে, টাকার জন্যে আর তোমাকে ও-সব লিখতে হবে না, বুঝলে?

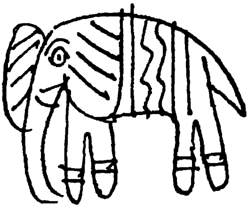
আবছা অন্ধকারে এবারে আমি তার মুখখানা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম। একবার ইচ্ছে হল আলোটা জ্বেলে দেখি। তা করিনি। অন্ধকারেই কতক্ষণ চেয়েছিলাম বলতে পারব না। হাল্‌কা নিশ্বাস ফেলে কতক্ষণ বাদে দুচোখ নিমীলিত করেছি, তাও না।

না। শীলাকে আমি সত্যি কথা বলিনি। আমি ছবির প্লট ভাবছিলাম না। কিছুই ভাবছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, আমার নিজস্ব যতিশূন্য পথে আমি এক নিঃসঙ্গ যাত্রী।

এখন মনে হল, তা নয়। সঙ্গিনী আছে।

অরণ্যে

শম্ভু মিত্র



সেদিন যাদবপুরের দিকে কোন এক কলোনীতে অভিনয়। কাজে কাজেই সুশান্তকে তাড়াতাড়ি আপিস থেকে পালাতে হবে। কিন্তু বাংলার নব-নাট্য আন্দোলনের বেশীর ভাগ শিল্পীর মতোই সেও একজন কনিষ্ঠ কেরাণী। তবে, সবকারী আপিসের। যার জন্যে পালানো বা ফাঁকি দেও.া তার পক্ষে একটু বেশী সহজ। কিন্তু এর চেয়েও সহজ হোত যদি সে শরৎ-এর মতো করপোবেশনে চাকরী করতো। কাল রাত্রে শরৎ তর্জনী তুলে গ্রামভারি চালে গোটা গোটা ক'বে তাকে বলেছে—

'ঠিক তিনটের সময়ে ক্লাব ঘরে চ'লে আসবে। ওখান থেকে রিকুইজিশনের পোট্‌লাগুলো নিয়ে ট্যাক্সি ধ'রে অমিতাদিকে তুলে একেবাবে সোজা স্টেজে যাবো। তিনটে মানে কিন্তু বড়ো কাঁটা বারোটার ঘরে। সেখানে থেকে একমিনিট হেলেছে কি আমি নিজেই ট্যাক্সি ডেকে রওনা দোব। মনে থাকে।'

শরৎ দত্তের কথা বলার ধরণটাই সুশান্তর খারাপ লাগে। সব সময়ে কর্তাত্তি। সেইজন্যেই সুশান্ত তাকে শরৎদা .বলে না, দরকার পড়লে শরৎবাবু ব'লে ডাকে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে দলের যিনি প্রধান,— যিনি একাধারে নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা ও সংঘেব সভাপতি, — সেই জলধিদা তো শরৎ বলতে প্রায় অজ্ঞান। আর তারও কারণ ঐ করপোরেশনের চাকরী। দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়েই দেখবে শরৎ জলধিদার বৌয়ের ফরমাস খেটে বেড়াচ্ছে। বড়বাজার থেকে সস্তায় ডাল এনে দিতে হবে, নতুন বাজার থেকে বাঁশের কোড় এনে দিতে হবে, ঢাকুরিয়া থেকে পুকুরের টাট্‌কা মাছ এনে দিতে হবে, সব শরৎ দত্ত করে। শবৎ-এর এক অদ্ভুত গুরুভক্তি আছে জলধিদা সম্পর্কে। জলধিদার তুচ্ছতম ইচ্ছাও তার কাছে এক অবশ্য-পালনীয় অনুশাসনের মতো।

কিন্তু সুশান্ত কিছুতেই মানতে রাজি নয় যে তার নিজের গুরুভক্তি কোনও অংশে শরৎ-এর ভক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট বা শীর্ণতর। তারা সবাই-ই তো বুকের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে নবনাট্য আন্দোলনের প্রবল জোয়ারকে ভগীরথের মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ব'লে জলধিদাকে মাথায় রেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। সেখানে হয়তো তারা শরৎ-এর মতো অতো সময় দিতে পারে না, কিন্তু সে তো কেবল তাদের করপোরেশনের চাকরী নয় ব'লে। কিন্তু অন্তরে? অন্তরে তার উদ্দীপনার কি এতটুকুও কমতি আছে? সে শিল্পী, তার নিজের অন্তর

দিয়েই তো তার কাজ? অতএব তাকে বিচার করতে গেলে তার অন্তর দিয়েই তো তাকে বিচার করতে হবে? সেখানে কি সে নিখাদ সোনা নয়? 'বুক দিয়ে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল, তারপর হবো ইতিহাস'— এ শপথবাণী এক এখনো সে তেমনি সততার সঙ্গে বারংবার উচ্চারণ করে না? তবে?—

কিন্তু চিন্তায় বাধা পড়লো। রামধারী এসে বললো— বড়োবাবু ডাক্‌তেসেন—।

বড়োবাবু মানে বিমলবাবু। অত্যন্ত রাসভারি লোক, যেমন মৃদ্যুভাষী, তেমনি বিচক্ষণ। তার কাছে ছুটি চাইতে গেলে নাকচের সম্ভাবনাই বেশী। অথচ এক্ষুনি যদি যাওয়ামাত্র নতুন কাজ গছিয়ে দিতে চান তো তখন বাধ্য হয়ে সুশান্তকে ছুটির কথা বলতেই হবে, কায়দা ক'রে কথাটা পাড়বার সুযোগই পাবে না।—

সুশান্তর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। নতুন যে ছোটসাহেব এসেছে দক্ষিণভারত থেকে সে একেবারে মোটেই দেখতে পারে না বড়োবাবুকে। কারণ যদিও সেই ছোটসাহেব একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাল্যবন্ধুর জামাই ব'লে এই আপিসের সবাই— এমন কি মারাঠী বড়োসাহেব পর্যন্ত তাকে একটু হেঁ হেঁ ক'রে এড়িয়ে চলেন তবু এই বড়োবাবু বিমলচন্দ্র বসুর ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষণ ঘটে না। বরঞ্চ তাঁর মৃদুভাষণে ছোট সাহেবের সর্বদা মনে হয় যে বিমলবাবু যেন তাঁর সহিষ্ণু প্রাইভেট টিউটারের মতো কথা বলেন। অসহ্য আস্পর্ধা এই ধুতিপরা সুপারের—

সুশান্ত বড়োবাবুর কাছে না গিয়ে চললো ছোটসাহেবের কামরায়, আগে ভাগে তার কাছ থেকে ছুটিটা আদায় ক'রে রাখতে। তাহ'লে আর বড়োবাবুর 'না' করবার ক্ষমতা থাকবে না।

একবার এই ছোটসাহেব সুশান্তকে স্টেশনে পাঠাতে চেয়েছিল তার এক আত্মীয়ের মালপত্রগুলো ছাড়িয়ে আনবার জন্যে। কিন্তু বড়োবাবু তাকে সে অপমানেব হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ মৃদ্যু ও গম্ভীর স্বরে ছোটসাহেবকে বলেছিলেন, যে সুশান্ত এই আপিসের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট, তাকে দিয়ে এই সব কাজ করালে আপিসের নীতিবোধের দিক থেকে খুব ক্ষতি হবে, এটা ঠিক নয়।

ছোটসাহেব এ অপমান ভোলেনি। তাই তার ঘরে গিয়ে হাত কচলে হেঁ হেঁ ক'রে সুশান্ত ছুটির আবেদনটা জানালো। এমনভাবে জানালো যেমন বড়োবাবুর বিরুদ্ধে তার অনেক অভিযোগ আছে, এবং ছোটসাহেব তাকে একটু সুবিধা দিলেই সে বড়োবাবুর বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারে।

ছোটসাহেব ইংরেজি মীডিয়ামের ফিরিঙ্গি ইস্কুলে পড়া লোক। তার তাই ভালো ক'রেই ধারণা আছে যে ইংরেজ যাওয়ার পরে এখন দেশকে চালনা কারবার ভার তার শ্রেণীর লোকদের ওপর, এবং সে কাজে ভেদনীতি যে শাসননীতির একটি অবশ্য স্মরণীয় মন্ত্র

তাও তিনি জানেন ও কিছুদিন থেকেই কেরাণীদের মধ্যে বড়োবাবুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করাও সুরু করেছেন।

সুশান্ত নাটকের দলের ছেলে, তাই মনের ভিতরটা বেশ একটু নাটুকে। সে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যখন ছোটসাহেবের কামরায় যাচ্ছিল তখন সে যেন মঞ্চের ওপর একটা চুক্‌লিখোরের চরিত্র অভিনয় করবার মনোভাব নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খরিদ্দার তো জিনিস যাচাই ক'রে কিনবে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় পাকে প্রকারে সুশান্তকে একটা খবর ব'লে দিতে হোল যে, সুধীন হচ্ছে বড়োবাবুর পেটোয়া লোক, তাই আজকাল সে রোজ দেরি ক'রে এসে বড়োবাবুর কাছে খাতাতে সই ক'রে যায়, তা লেট্‌মার্ক হয় না। এবং যতক্ষণ সে না আসে বড়োবাবুর খাতা পাঠান না।

বলেই কিন্তু সুশান্তর মনটা লজ্জায় ম'রে গেল। আপিসের সবাই জানে যে সুধীনের মায়ের কদিন আগে হঠাৎ এক পাশের অঙ্গ পক্ষাঘাতে প'ড়ে গেছে। তাই নিজে রেঁধে মাকে খাইয়ে ছোট ভাইকে বসিয়ে রেখে আসতে আসতে তার দেরি হয়ে যায়। — কিন্তু কী করবে সুশান্ত! ছোটসাহেব তার চেয়ে অনেক চালাক, আর তার সামনের ঘড়িটার সওয়া দুটো বেজে যাচ্ছে, আড়াইটার মধ্যে না বেরুলে তিনটের মধ্যে কিছুতেই পৌঁছুনো সম্ভব নয় ক্লাবঘরে। আর তিনটের মধ্যে না পৌঁছুলে শরৎ দত্ত জেনারেল মিটিঙে প্রমাণ ক'রে দেবে যে নাট্য আন্দোলন সম্পর্কেই সুশান্তর আগ্রহ কম, ওর উদ্দেশ্য কেবল দলের ঘাড়ে পা দিয়ে নিজের নাম করা। তখন? দলের আর সকলে তা তখন ভিজে বেড়ালের মতো চুপ ক'রে ব'সে থাকবে। আর সুশান্তর এতো যে 'সিনসিয়ারিটি' সব মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে। বাণুও তো তখন ভাববে যে সুশান্ত একটা 'অপরচুনিস্ট'।

কাজেই সুশান্ত নিজের চেয়ারে ফিরে আসতে আসতে নিজেকে বোঝাতে থাকলো যে,— ন্যায় অন্যায়ের সেই পুরোনো মানদণ্ড আর নেই, পৃথিবী একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে, মহত্তর ন্যায়ের জন্যে মানুষ যদি স্বল্পতর অন্যায় করে সেটা অন্যায় নয়, 'বুক দিয়ে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল তারপর হবো ইতিহাস—'

কিন্তু এইসমস্ত স্তোকবাক্য ভেদ ক'রে সুশান্তর মনের মধ্যে একটা স্বর কেবলি বলতে থাকে— কিন্তু এই কি জঞ্জাল সরানো, না জঞ্জাল জমানো?

ভুরু কুঁচকে সুশান্ত নিজের চেয়ারে এসে বসে। রামধারী আবার এসে বলে— 'এ সুসন্‌বাবু, কেতোবার বল্‌তেছে কি বড়োবাবু ডাক্‌তেসেন, কাঁহা কাঁহা ঘুম ফিরতেসে— তুরন্ত যাইয়ে। আপসিমে কাম করনা হ্যায়, না?'

সুশান্তর ঠোঁটের কাছে যে গালিটা এলো সেটা ছাপার নিয়ম নেই। এবং মুখ ফুটে সেটা বলবারও সাহস নেই সুশান্তর। কারণ আপিসের বেয়ারা-দারোয়ান-জাতীয় লোকেরা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সম্পূর্ণ সক্ষম ও অভিজ্ঞ। সুশান্ত সামলে নিলে নিজেকে।

অনেক ক্ষেত্রেই তাকে এমনভাবে সামলাতে হয়। রিক্‌শা কুলি, ট্যাক্সিড্রাইভার,

ডেকরেটারের ঘরামি, পাবলিক স্টেজের শিফ্‌টার,— থিয়েটার বাবদ এদের সকলেরই সংস্প
আসতে হয় সুশান্তকে, আর প্রত্যেকবারই ক্ষত বিক্ষত হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। এরা ে
সুরুই করে একটা অবজ্ঞার ভঙ্গী দিয়ে। তার ওপরে এরা সবাই হিন্দীতে অনর্গল চেঁচি
যায়, তার উত্তরে বাংলায় চেঁচিয়ে জোর পাওয়া যায় না, অথচ হিন্দীটাও জানা নে
ফলে ওরাই যেন একা একা 'ম্যাড সীন' ক'রে ক্ল্যাপ নিয়ে বেরিয়ে যায়।

যদিও সুশান্তর ন্যাটসংঘের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র জনসাধারণের জীবনালেখ্য
নাটকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা, এবং অন্য সকলের মতো যদিও সুশান্ত প্রগতিবাদ হিসা
সেটা বিশ্বাসও করে, কিন্তু— যাকগে, যাকগে, বুক দিয়ে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল তারপ
হবো ইতিহাস। —

বড়োবাবু বললেন— 'এই লিস্ট্ দ্যাখো। সব কটা কোম্পানী তাদের হিসেবে জোচ্চু
করেছে। অথচ সব কটাই এই আপিস থেকে পাশ হয়ে গেছে। এদের প্রত্যেকের ফা
থেকে গত তিন বছরের ব্যালান্সশীট বের করো, তারপর—'

সুশান্ত বললে— (কারণ ছোটসাহেব বলেছে ছুটিটা আগে বড়োবাবুর কাছে চাইে
— 'আজকে তো হবে না বড়োবাবু। আজ আমাকে এখন ছুটি দিতে হবে, আমি এক্ষু
যাবো।'

কর্মব্যস্ত বড়োবাবুর যেন চমক ভাঙলো। বড়ো বড়ো দুটো গম্ভীর চোখ সপ্রশ্নভা
সুশান্তর মুখের ওপর নিবদ্ধ হোল।

সুশান্ত কাতরতার অ্যাক্‌টিং ক'রে বললে— 'মায়ের অসুখের জন্যে বড়োবাবু, এক্ষু
একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।'

বড়োবাবু তেমনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সুশান্ত বললে— 'মানে, মায়ের টি. বি. কিনা,— আজকেই এক্সরে করাতে হবে-
তাই—'

বড়োবাবু আরো একটু তাকিয়ে থেকে তবে চোখ নামালেন। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন-
'কতদিন?'

সুশান্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। একে সে টি.বি. সম্পর্কে কিছুই জানে না, হঠাৎ মু
এসেছে, ব'লে দিয়েছে। তার ওপর বড়োবাবুর চোখে চোখে তাকিয়ে মিথ্যে কথা বলা
শক্ত, লোকটা যে কতোটা বুঝে ফেলছে তা কিছু বোঝা যায় না। এইবারে সে খানিক
সহজ হয়ে বলতে পারলো—

'সে অনেকদিন। জ্বর, খুস্‌খুসে কাশি,— তখনই ডাক্তার সন্দেহ করেছিলেন— ; বি
'প্রাইস ইনডেক্স' এবার দেখবেন 'এইট্ হানড্রেড পারসেন্ট' হয়ে যাবে। আমরা সাধা
লোকেরাই মরবো।'

কথাটা সাধারণ তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে নামিয়ে (কিংবা তুলে) আনতে পেরে সুশান্তর ্যড়ো স্বস্তি এলো।

কিন্তু বড়োবাবু তত্ত্বের দিকে দিয়েই গেলেন না। বললেন— 'রোজ অতো সিগারেট া খেয়ে মায়ের চিকিৎসা করালেই পারতে।'

এসব তর্কে সুশান্ত খুব পটু। তার কোনো অভ্যাসটাই যে দোষের নয়, সে যে কেবল ামাজিক অবস্থায় চাপেই এই অভ্যাসগুলো করতে বাধ্য হয়েছে, নইলে সে যে 'নার্ভস্' ঠক রেখে কাজ করতেই পারবে না, ইত্যাদি নানা প্রকার যুক্তিতে তার মন একেবারে পরিষ্কার। কন্তু বড়োবাবু সে সব কথা বলতেই দিলেন না, শুরুতেই থামিয়ে দিয়ে বললেন— 'এতদিন কান চিকিৎসা হয়নি?'

সুশান্ত অভিনেতার মতোই বললে— 'আজ্ঞে তা কিছুটা হয়েছে বৈকি। ধার করেই ইঞ্জেকশনটা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

বড়োবাবু ফাইলের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'কী ইঞ্জেকশন?'

এইরে! টি. বি. তে কী যেন ইঞ্জেকনশটা দেয়! ইস্ কী যেন নামটা! সুশান্তর যেন স্টেজের ওপর পার্ট ভুলে যাওয়ার মতো হোল। দুত্তেরি, কী যেন নামটা!

বড়োবাবুর চোখ দুটো আবার উঠে এলো ফাইল থেকে সুশান্তর মুখের ওপর। সুশান্ত স্টেজ ফ্রাইট' গোপান করবার জন্যে মুখে খুব একটা ব্যাজার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করলো। —হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল। তাই মনের আঁকুপাঁকু অবস্থায় দুম্ ক'রে বললে— 'কী আবার! ক্লোরোমাইসিটিন। যা দেওয়া হয়।'

বড়োবাবুর চোখ আরো কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে তাকিয়ে রইল তার দিকে, তারপরে নামলো।

খুব একটা সাধারণ স্বরে বড়োবাবু বললেন— 'এই লিস্টটা নিয়ে যাও। ফাইলগুলো বের ক'রে কাজ শুরু ক'রে দাও।'

সুশান্ত ব'লে উঠ্লো— 'কিন্তু আমার ছুটি? আমাকে যে এক্ষুনি যেতে হবে।'

বড়োবাবু ফাইলের দিকে একটু চুপ ক'রে তাকিয়ে তেমনি সাধারণভাবে বললেন— —কাজটা আরম্ভ ক'রে দাও। গোপালকে ব'লে দিয়েছি সে পুরানো ফাইলগুলো বের ক'রে দেবে।'

সুশান্ত মরীয়া হয়ে উঠলো— 'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। চাকরী বড়ো, না আমার বড়ো! মায়ের যদি কিছু একটা হয় তখন কি আমি চাকরী নিয়ে ধুয়ে খাবো? আপনি অ্যাবসেন্ট' ক'রে দিন আমাকে, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।'

হঠাৎ বড়োবাবু ধম্কে উঠে বললেন— 'চুপ করো অসভ্য ডেঁপো ছোকরা। এদিকে া অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নাটক ক'রে বেড়াও, আর এইরকম মিথ্যে থা ব'লে কাজে ফাঁকি দিতে সঙ্কোচ হয় না। যাও, কাজ করোগে যাও।'

চতুর্দিকে সকলেই সচকিত হয়ে উঠেছে। তাতে সুশান্তর চুপ ক'রে চ'লে যাওয়া বা নতি স্বীকার করা আরো শক্ত হয়ে পড়লো। একটু আড়ালে এরকম বকুনি খেলে তার আত্মসম্মানে (?) হয়তো এতোটা বিঁধতো না। তাই নিজের সেই 'আত্মসম্মান' বজায় রাখতে তাকেও গলা তুলে বলতে হোল— 'আপনি বলতে চান আমার মায়ের অসুখের কথাটা মিথ্যে। লিখে দিন, লিখে দিন একটা কাগজে, তারপরে আমি দেখাচ্ছি।'

বড়োবাবু আত্মহারা হয়ে ব'লে উঠলেন— 'চলে যাও, চলে যাও তুমি এখান থেকে।'

সুশান্ত গট্‌গট্‌ ক'রে চ'লে গেল সোজা ছোটসাহেবের ঘরে। একমিনিট পরেই বেরিয়ে এসে বললে— 'আমি চললুম। ছোটসাহেব আমাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে।'

নিজের টেবিলে আপিসের কিছু পেন্সিল, ক্লিপ ও আলপিন সরিয়ে রেখেছিল নাট্য আন্দোলনে ব্যবহারের জন্যে, সেই চোরাই দ্রব্যগুলিকে হাত সাফাই ক'রে হাতের নানান কাগজপত্রের মধ্যে ভ'রে ফেলে সে বিজয়ীর গর্বে বেরিয়ে চললো। যাবার সময়ে নাটকের লোক হিসাবে একটা 'এক্সিট'-এর অ্যাকটিং না ক'রে সে পারলো না। পরাস্ত বড়োবাবুকে লক্ষ্য ক'রে বললে— 'বের ক'রে দেওয়া অতো সোজা নয়। আমাকে চ'লে যেতে বলতে গেলে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে লিখিয়ে আনতে হবে, বুঝলেন? বাই অর্ডার অফ দি প্রেসিডেন্ট।'

তারপর গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে গেল।— বেরিয়ে গেল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে লজ্জায় আর গ্লানিতে যেন তার আত্মা পুড়তে থাকলো।

রাস্তায় চড়া রোদ্দুর, গাড়ি আর ধুলো। সুশান্তর কালিমাড়া তেলামুখে যেন রাজ্যের ধুলো এসে লেগে গেল। তার মনটা কেবলি যেন বলতে লাগলো— এ অন্যায়, এ ঘোরতর অন্যায়।

কিন্তু নিজের কৃত অন্যায়ের স্বীকৃতি নয় এটা। যেন আর কোথাও কোনো আসল অপরাধী লুকিয়ে এইসব ঘটাচ্ছে, সুশান্ত তাকেই অভিশাপ দিচ্ছে। —সুশান্তর চেতনা কেবলই তার উপলব্ধিকে এড়িয়ে চলে। অথচ উপলব্ধিটাও ভেতরে ভেতরে ঘটতে থাকে, তাকেও স্তব্ধ রাখতে পারে না।

ফুটপাত থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল সুশান্ত। খেয়াল ছিল না একটা গাড়ি কতক্ষণ ধ'রে পিছনে হর্ণ দিচ্ছে। হঠাৎ সেটা একটা গালাগালি দিয়ে ভীষণ জোরে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুশান্তও reflex action-এ লাফ দিয়ে ফুটপাতের দিকে স'রে এলো, এবং reflex action-এই ব'লে উঠল— 'Swine,.

'দেখে শুনে পথ চলো হে, নইলে বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের একেবারে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে যে।'

অনিল রায়! ঠিক এই মুহূর্তে এই লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়াটা যেন ধরা পড়ে যাওয়ার মতন। পঁয়তাল্লিশের কিছু ওপরে বয়স, পেসায় খনিজ পদার্থের দালাল। এককালে ইনিও

দলের একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু সময় না হওয়ার অজুহাতে ছেড়ে দিয়েছেন। সকলেই জানে, সেটা অজুহাত।

কাছে এসে সুশান্তর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— 'কোথায় চলেছ? এ সময়ে?'

— 'এক্ষুনি ক্লাবে যেতে হবে, আজ যাদবপুরে প্লে আছে। আপনি?'

— 'আমি একবার বাড়ির দিকে যাবো। তোমাদেব ক্লাব ছাড়িয়ে ওপারেব ফাঁকা বাস্তাটা দিয়ে, অনেকখানি। চলো, তোমাকে একটা লিফ্‌ট দিই। কিন্তু কটায় পৌছুতে হবে তোমায়? তিনটেয়? তাহলে তো খানিকটা সময় আছে, চলো, একবাটি ক'বে চা খেয়ে ট্যাক্সি ডাকা যাবেখন।'

বলেই সুশান্তকে টেনে নিযে চললেন একটা সরু, লম্বা, মার্বেল টেবিল পাতা চাযের দোকানে। বসতে বসতে বললেন— 'খামখাতে অপবকে Swine বললেই নিজের দোষ স্খলন হয় না সুশান্ত। বসো। ওহে, ও বাবা, দু বাটি চা দাও এদিকে। সুশান্ত, তুমি কিছু খাবে নাকি হে? কিছু না? — তাহলে খালি চা। একটু চট্ করে দিয়ো।' পকেট থেকে সিগাবেট বেব ক'বে সুশান্তর দিকে এগিয়ে ধরলেন— 'খাবে নাকি একটা? আহা, খাও, খাও, নবনাট্য আন্দোলনের ময়দানে সিগারেট ফোঁকা তো সম্পূর্ণ সাম্যবাদ হে। নাও, খাও খাও।'

সুশান্ত স্পর্ধা করেই একটা সিগারেট তুলে নিল, এবং শ্রীবিকাশ রায়েব ভঙ্গীতে একটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে প্রশ্ন করলে— 'আপনি বুঝি সেটা পছন্দ করেন না?'

অনিল রায় একমুখ ধোঁয়া গিলে ফেলে হাসিমুখে মাথা নেড়ে বললেন— 'না।' তারপব ঠোট গোল ক'বে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। আর কিছু বললেন না।

কিন্তু সুশান্তর পক্ষেও আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। আপিসের ঘটনা, গাড়িকে গালি দেওযা, ও আরো নানাবকম গভীরতর কারণে তাকে ভিতবে ভিতরে যুদ্ধেচ্ছু ক'রে তুলেছে। হঠাৎ সে খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে একেবারে বকে বসা ছেলেদেব মতন উচ্চারণে ব'লে উঠল— 'বেড়ে আছেন মাইবি আপনারা। নবনাট্য আন্দোলনকে 'বিট্রে' করে পয়সা রোজগার করছেন আর 'গ্র্যাটিসে' অ্যাড্‌ভাইস ছাড়ছেন।' —যতোটা সম্ভব অপমানজনক হাসি হাসে সুশান্ত।

অনিল রায় এক লহমা চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলেন সুশান্তের মুখের দিকে। সুশান্ত সেই দৃষ্টির সামনে উদ্ধত ভাবে নিজের হাসির বিস্তৃতি এতোটুকু সঙ্কুচিত করলো না।

কিন্তু চা এসে গেল। অনিল রায় চোখ নামিয়ে নিজের পেয়ালা তুললেন, তারপর মৃদুস্বরে বললে— 'চা খাও।'

সুশান্ত চায়ের পেয়ালা তুললো, কিন্তু তার মনে হ'তে লাগলো যে অনিল রায়ের পয়সায় তার না খাওয়াই উচিত। অথচ নিজে পয়সা দিতে গেলেও খুব বাড়াবাড়ি দেখাবে। ইচ্ছে হ'তে লাগল যে, পেয়ালাটাকে ছুঁড়ে সামনের দেওয়ালের চাঁদ আর নৌকা মার্কা ছবিটাকে মারে— অনেকটা বিলিতি ফিল্মের অ্যাক্‌শনের মতো। কিন্তু সেটাও সম্ভব নয়। তাই দু'চুমুক

চা খেয়েই আবার বললে— 'অবশ্য আপনি বলতে পারেন যে আপনি 'অ্যাড্‌ভাইস্' দিচ্ছেন না। কিন্তু 'ক্রিটিসাইজ' তো করছেন? কেন করবেন? আমরা যা করছি তা সবের যুক্তি আছে, 'রীজ্‌ন্‌জ্' আছে।'

অনিল রায় কিছু না ব'লে এক মনে চা খেতে থাকেন।

সুশান্ত থামতে পারে না। যতক্ষণ না অনিল রায় রেগে উঠে ওর সমপর্যায়ে নেমে আসছেন ততক্ষণ ওর শান্তি নেই। ও আবার বলে— 'তাছাড়া সামনে সিগারেট খেলেই লোককে কিছু অপমান করা হয় না। তাহলে গুরুজনদের সামনে পান খাওয়াও অন্যায়, সেটাও তো নেশা।'

বলেই সুশান্ত চুপ ক'রে গেল। হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল অনেকদিন আগে কলেজের প্রথম বৎসরে এই কথার উত্তরে সে নিজেই তর্ক ক'রে তার এক সহপাঠীকে বলেছিল— 'তাহলে এবার থেকে বাপের সামনে মদও খেয়ো, তাতেই বা দোষ কী?'

সহপাঠী বলেছিল— 'হ্যাঁ, যদি বিলেতে জন্মাতুম তাহলে তো খেতুমই। এখানে চল্ নেই, খেলে বাবা ব্যাটা চ'টে যাবে, তাই খাবো না।'

সুশান্ত বলেছিল— 'পথে এসো বাবা, তাহ'লে দেখতে পাচ্ছো তো যে দেশের যা নিয়ম সেখানে তা মানতে হয়? — এই। অ্যাবসল্যুট মর‍্যাল ব'লে কিচ্ছু নেই, সবই হচ্ছে টাইম আর স্পেসের সঙ্গে রিলেটেড।'

মনে পড়তেই সুশান্ত যেন চমকে থেমে গেল। এসব কথা ও নিজেই বলেছিল? তাহলে কি ও এখন নিজেই নিজের বিরুদ্ধে চ'লে গেছে। যে-সুশান্ত ষোল বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, পৃথিবীর বড়োদের আসরের মধ্যে ঢোকবার উপযুক্ত হয়ে উঠতে দিনরাত প্রয়াস পেয়েছে— সে এবং আজকের এই চবিবশ বছরের সুশান্ত কি ভিন্ন? বিরুদ্ধপক্ষ? — অজান্তে এতো বড়ো ঘটনাটা ঘটলো কী ক'রে!

অনিল রায় চা খেয়ে পেয়ালাটা পিরিচের ওপর ঠক করে রাখলেন। সেই শব্দে সুশান্তর সম্বিৎ ফিরে এলো, সে তাড়াতাড়ি বাকি চাটুকু চুমুক দিয়ে শেষ করলো। ততক্ষণে অনিল রায় চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়েছেন। মোটা পোর্টফোলিওটা হাতে তুলে নিয়ে অত্যন্ত সাধারণ নির্বিকার গলায় বললেন— 'চলো, যাওয়া যাক।'

দুজনে রাস্তায় নেমে এলো। ট্যাক্সির জন্যে প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হোল, কিন্তু কেউ কারোর সঙ্গে কোনও কথা কইল না। অনিল রায় যে কী ভাবছিলেন সুশান্ত তার কিচ্ছু জানে না, কারণ ও নিজের চিন্তাতেই স্তব্ধ হয়ে ছিল।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল। অনিল রায় সুশান্তকে আগে উঠিয়ে পরে নিজে উঠলেন। ট্যাক্সি চললো। এতক্ষণে সুশান্ত লক্ষ্য করলো অনিল রায়কে। প্রায় সুশান্তর ডবল বয়সী। চুলে বেশ পাক ধরেছে, নাকের দুপাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত গভীর রেখা। গাল ভেঙে

গেছে, রগ ব'সে গেছে, সারা মুখ এতো তেলা যে চশমাটা নাকের ওপরে পিছলে খানিকটা নেমে এসেছে।

লজ্জা হোল সুশান্তর। একুশ বাইশ বছরে বিয়ে করলেই সুশান্তর বয়সী একটা ছেলে থাকতে পারতো অনিল রায়ের।

সুশান্ত বললে— 'অনিলবাবু, (কী জানি কেন অনিল রায়কে কেউ দাদা বলে না, সবাই বাবু বলে) তখন আপনার সঙ্গে আমি খুব খারাপ ভাবে কথা বলেছি, তার জন্যে— আমি, মানে,— আই অ্যাপোলোজাইজ।'

অনিল রায় ক্লান্ত চোখে একটু হেসে বললেন— 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

তাঁর সেই হাসি দেখে, শ্রান্ত ভঙ্গী দেখে, কী যেন একটা আবেগ সুশান্তর বুকের মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে। তার ইচ্ছে হ'তে লাগলো সে নিজের সব কথা ব'লে দেয় অনিল রায়ের কাছে, নিজের সব গোপন অন্যায়ের কথা সে অকপটে স্বীকার করে। কোনও কপটতা, কোনও গোপনতা যেন তার চরিত্রের মধ্যে কোথাও না থাকে।

কিন্তু কেউ যদি সুশান্তকে তক্ষুনি প্রশ্ন করতো যে কী কথা সে বলতে চায়, নিজের কোন্ গোপন পাপের কথা সে এমনভাবে স্বীকার করতে চায়, কোন্ কপটতাকে সে নির্মূল করতে চায়,— তাহলে সে হতচকিত হ'য়ে চুপ ক'রে থাকতো, কোনও জবাব দিতে পারতো না। কিন্তু এতো সব ভাববার সময় সুশান্তর ছিল না। কী একটা অদম্য আবেগ যেন তাকে ভিতর থেকে ঠেলে দিয়ে চলেছে। সে ব'লে উঠলো,— 'ঠিক নেই, ঠিক নেই অনিলবাবু। আমি যে কী তা আপনি জানেন না। মাঝে মাঝে এমন ঘেন্না হয়—'

অনিল রায় বিস্মিত দৃষ্টিত তাকালেন। সেই দৃষ্টির সামনে সুশান্ত হঠাৎ যেন আত্মসচেতন হয়ে উঠলো, স্বীকারোক্তির সুর কেটে গেল, সে যে কী ব'লে ফেলতে যাচ্ছিল সে সব কথা কেমন যেন গুলিয়ে গেল। অনিল রায়কে উপলক্ষ্য ক'রে সুশান্ত হয়তো নিজের কাছেই স্বীকারোক্তি করতে চাচ্ছিল। কিন্তু চোখাচোখি হতেই অনিল রায়ের স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমনি তার চোখ পড়লো অমনি সব গুলিয়ে গেল। সে ব'লে বসলো— 'চারিদিকে এতো নোংরামি, এতো নীচতা, যে— ঘেন্না করে।'

অনিল রায়ের চোখের তারা পাঁশুটে। সেখানে বিস্ময় মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো ব্যঙ্গ। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

সুশান্ত সেটা দেখতে পেল। হঠাৎ চুপ ক'রে গিয়ে ড্রাইভারের আসনের পিছনটা দুই হাতে শক্ত ক'রে আঁকড়ে সে সামনের দিকে দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে রইলো।

অনিল রায় বললেন— সেদিন এক ভদ্রলোক বলছিলেন যে, এখন বাংলাদেশে দেখি সবাই অধঃপতন অধঃপতন ব'লে উর্ধ্বশ্বাসে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু সকলেই যখন এতো ক্ষুব্ধ তখন আসল দোষীটি কে? গাল তো দেখি সবাই-ই পাড়ছে!— আমারও দেখে দেখে তাই মনে হচ্ছে, দোষীটি কে?'

সুশান্ত চুপ ক'রে রইল। অনিল রায়ও আর কিছু বললেন না।

হঠাৎ সুশান্ত ফিরে জিজ্ঞাসা করলে— 'আপনি দল ছেড়ে দিলেন কেন?'

অনিল রায় সুশান্তর দিকে তাকালেন, হয়তো ভাবলেন কিছু বলবেন কিনা, তারপর বললেন—'আমি হলাম স্বাধীনতা পাবার আগের যুগের লোক। তোমরা হ'লে পরের যুগের। তোমাদের সঙ্গে মেলাতে পারলাম না!'

— 'কিন্তু জলধিদা?'

— 'হয়তো পারছে। হয়তো তার দৃষ্টি স্বচ্ছ, কিংবা হয়তো তার চামড়া পুরু।'

— 'আপনি বলতে চান যে আমরা খুব ছোটলোক, না? আপনাদের তুলনায় আমরা খুব ইতর, না? এই কথাটাই তো বলতে চান, না?'

অনিল রায় তাঁর ক্লান্ত নিষ্প্রভ পাঁশুটে দৃষ্টিতে সোজা তাকলেন সুশান্তর হিংস্র যুদ্ধেচ্ছু মুখের দিকে। তেমনি তাকিয়ে থেকেই খুব স্পষ্ট গলায় বললেন—

— 'হ্যাঁ, বলতে চাই। কিন্তু মুখ ফুটে বলি না।'

সুশান্ত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলে 'কেন? ভয়ে?'

— 'হ্যাঁ, ভয়ে। তোমাদের জীবনে তো কোনও রকম কিছু পবিত্র জিনিস নেই। তোমাদের মনের ভিতরে কোথাও কোন ঠাকুর ঘর নেই। স্বাধীনতার পরেকার এই 'গোল্ড রাশ্'-এর ব্যাস্টার্ডস্ তোমরা। লেফটিজমের বুলি আর নির্লজ্জ অপরচুনিজম্-এর বর্ণসঙ্কর সন্তান তোমরা। You are out to defile the face of our country. You will piss on everything that we have held so dear and sacred in our lives.'

বলতে বলতে গলার শিরা ফুলে ওঠে অনিল রায়ের, কীরকম একটা তীব্র ধিক্কার দিয়ে ব'লে ওঠেন—

– 'Damn you,' damn you–damn you all–'

এতোখানি ক্ষোভ কখনো কল্পনা করেনি সুশান্ত, সে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকে।

অনিল রায় তেমনি অপ্রকৃতিস্থের মতো বলতে থাকেন— 'আমি আন্দোলনকে বিট্রে করেছি? আর তোমরা? তোমরা তাকে জয়যাত্রায় নিয়ে যাচ্ছো?— বেশ তো, go on, তাহলে আমাদের নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছো কেন? আমাদের নিয়ে চর্চা করবার এতো দরকার পড়ছে কেন চ্যাংড়াদের মধ্যে?— যতো নপুংসক। That's what you are. নিজেদের অক্ষমতার জন্যে অপরকে গালাগালি দিয়ে বেড়াও। But that will not help you procreate, Eunuchs–Know that?–eunuchs–all of you.'

অপরদিকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকেন অনিল রায়।
— সুশান্ত নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। ট্যাক্সি চলতে থাকে।

ক্লাবঘরের কাছের বড়ো রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে সুশান্ত নামে। বিদ্যায় নেবার জন্যে জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে বলতে গেল— 'আচ্ছা—'

অনিল রায় হঠাৎ কাছে ঝুঁকে এলেন, বললেন— 'সুশান্ত, আমাকে মাপ কোরো। আমার উত্তেজিত হওয়া উচিত হয়নি।' খানিকটা যেন আপন মনেই বললেন— 'আমরা রাজনীতিতে বিশ্বাস করতাম, থিয়েটারকেও ভালোবাসতাম। কিন্তু ক্রমশ চতুর্দিকে দেখতে দেখতে রাজনীতিতে বিশ্বাস একবারে চ'লে গেল। তাহলে বাঁচাবে কিসে? —ভাবলাম, ধর্ম। যা ধারণ করবে। মনে খুব ভালো ক'রে অনুভব করলাম, যে-জীবনে ধর্ম নেই সে জীবনে পুণ্য নেই। তার সমস্ত কর্ম হোল অকর্ম, তার সমস্ত চিন্তা হোল কুচিন্তা। ধর্ম চাই— morality, social and personal morality। কিন্তু কেউ তা মানে না। কেউ না। তাই পাবলিসিটির ব্যাপার নবনাট্যের দল থেকেই ব্যবসাদারদের ছাড়িয়ে গেল, তোমাদের motto হচ্ছে— যাকগে, যাকগে, কেনই বা বলছি। কিংবা আমারই ভুল, তোমরা ঠিক। Doesn't matter, I am in the minority— চলো ভাই ড্রাইভার, সামনে চলো, এবার একলা যাবো। —চললাম সুশান্ত।'

হাত নেড়ে অনিল রায় সাঁ করে বেরিয়ে গেলেন। —

সুশান্ত রাস্তা পার হয়ে ক্লাবঘরের সামন যেতেই দেখলো বীরেন সামনের সিঁড়িটার ওপর খবরের কাগজ মাথায় দিয়ে বসে আছে। সুশান্তকে দেখে বললে— 'আজ যা একখানা রোদ্দুর হয়েছে না—, একেবারে ক্লাইম্যাক্স।'

সুশান্ত তার পাশে বসতে বসতে হঠাৎ বললে— 'নাঃ। জীবনে কোনও ক্লাইম্যাক্স নেই, সব অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স।'

বীবেন নিজেকে 'ফ্যানি ম্যান' ভাবে। সেইরকম একটা ভঙ্গী ক'রে বললে— 'তোর দেখিচি মাইরি সব সময়ে ডায়ালগ একদম রেডি।' তারপর 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল' হবার চেষ্টা ক'রে বললে— 'জীবনে ক্লাইম্যাক্স নেই তো তাহলে কি খালি নাটকে আছে?'

সুশান্তর ইচ্ছে হচ্ছিল না বীরেনের সঙ্গে এইসব আলোচনা করতে, কিন্তু কথাটা উত্থাপন ক'রে ফেলেছে বলে খানিকটা যেন বাধ্য হয়েই বললে— 'তাই। যেখানে ক্লাইম্যাক্স এলে দপ ক'রে একটা আগুন জ্বলে উঠে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা সব ফয়সালা হয়ে যেত, জীবনে তা কিছুতেই হয় না। সব ঘটনা কেবলই ঘুরপাক খাবে, কেবলই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠবে। একেবারে একটা দুঃস্বপ্নের মতো। জীবনে কোনও ক্যাথারসিস নেই।'

অত্যন্ত কষ্ট ক'রে নিজের চিন্তার জট ছাড়াবার চেষ্টা করছিল সুশান্ত। কিন্তু বীরেন বলে উঠলো— 'দ্যাখ দোস্‌, ডোন্ট স্পীক বিগ বিগ ওয়ার্ডস। ড্রামা ইজ লাইফ, অ্যান্ড্ লাইফ ইজ ড্রামা। নবনাট্য আন্দোলন জীবনকে থিয়েটারে প্রকাশ করছে। অতএব যদি থিয়েটারে ক্লাইম্যাক্স থাকে জীবনেও থাকবেই। সিওর টু ষ্টে।' — অনেক আধুনিক ছেলের মতোই বীরেনের শ আর স উল্টে যায়।

এই প্রথম সুশান্তর আজ হঠাৎ মনে হোল যে ওরও বোধহয় আর নবনাট্য আন্দোলনে থাকা হবে না। কী এর অর্থ? কী মূল্য?

চোখে পড়লো রাস্তার ওপাশ থেকে রাণু আসছে। —রাণু এখন কেন আসছে?

বীরেন বললে— 'কী ব্যাপার, রাণু-মিশ্? তোমার তো সোজা স্টেজে চলে যাবার কথা।'—

রাণু এসে দাঁড়িয়ে একবার ঠোঁট টান করলো, মাথাটা এধার ওধার দোলালো, তারপর বললে— 'এখান থেকে তো একটা ট্যাক্সি যাবে। আমি তাইতে যাবো।'

রাণুর বয়স কুড়ি কিংবা একুশ। রঙ খুব কালো, মুখটা ঢলোঢলো, চোখ দুটো বড়ো বড়ো, দেহটা চোখে পড়বার মতো। রাণুও তা জানে।

বীরেন বললে— 'কী ক'রে হবে? আমি, সুশান্ত, শরদ্দা আর অমিতাদি। ব্যস্, চারজন হয়ে গেল।'

রাণু একগুঁয়ের মতো বললে— 'তা আমি কী জানি। আমিও আর্টিস্ট। অমিতাদিকে যদি ট্যাক্সি করে নিয়ে যাওয়া হয় তো আমিও যাবো। আমরা সবাই গ্রুপের জন্যে খাটতে এসেছি।'

বেশ বোঝা গেল রাণু ঝগড়া করবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে। সুশান্ত বিপন্ন বোধ করতে লাগলো। কারণ, রাণুর সঙ্গে তার একটা অর্ধগোপন সম্পর্ক হয়েছে, অতএব রাণুর যাতে অপমান না হয় সে তারই দেখা দরকার, অথচ এভাবে ব্যবহার করাটা যে গ্রুপের ডিসিপ্লিনের পক্ষে ভালো নয় সেটাও সে বুঝতে পারছে।

রাণু বললে— 'বাঃ, বসতে দাও।' যুবক দুজনকে সরিয়ে তাদের মাঝখানে বসলো রাণু।

বীরেন বললে— 'কিন্তু আমিতাদি ইজ ডিফারেন্ট। সে হোল হিরোইন, নায়িকা।'

রাণু বললে— 'আমিও সহনায়িকা, সেকেণ্ড হিরোইন।'

বীরেন বললে— 'আরে অমিতাদি নিজের পয়সাতেও ট্যাক্সি ছাড়া কোথাও যায় না। ট্রামবাসে চড়েই না।'

রাণু একেবারে মুখিয়ে উঠলো,— 'তাই বলো। তাহলে যতো বড়োলোকেরা দলে আসবে ততো তোমরা তাদের খোসামোদ করবে। আর আমরা যতোই খেটে মরি না কেন আমাদের কোনও দাম হবে না, এই তো?— অথচ নাটকে বড়লোকদের খুব গালাগালি দেওয়া লোক দেখিয়ে? বাঃ!'

বীরেন দাঁত বের করে হেসে চোখ নাচিয়ে বললে— 'ভাই ওসব হোল কমার্সিয়াল আপীল। বাঁধা ক্ল্যাপ। কিন্তু লাইফ ইজ ডিফ্‌ফারেন্ট।'— বীরেনের ইংরেজি বলাই চাই।

সুশান্ত ব্যঙ্গ করে বললে, 'সেকি, এক্ষুনি যে বলছিলে নাটক আর জীবন এক, নাটকে যা আছে জীবনে তা থাকবেই?'

বীরেন চটে উঠে বললে, 'দ্যাখ, আমার সঙ্গে ঠাট্টা কোরো না, ডোন্ট্ ট্রাই টু জোক অ্যাট মি। সেটা থিয়োরিটিক্যালী কথা, এটা প্রাক্‌টিক্যালী কথা। সেটা থিয়োরী অফ ড্র্যামা,

আর এটা প্র্যাকটিক্যাল অফ অর্গানইজেশন। নাটক মানে জমাতে হবে। আর জমাতে গেলেই কিছু মশলা দিতে হবে—'

রাণু বললে— 'হ্যাঁ, গরম মশলা।'

বীরেন খুশি হয়ে বললে— 'এই কথা। গর্‌মাগরম্ মশলা ডালো, গর্‌মাগরম্ পয়সা লাও। যেমন পৃথিবীর অবস্থা তেমনি হবে নাটক করার ব্যবস্থা। কী বলো রাণু, তাই না?'

রাণু ঘাড় বেঁকিয়ে অপাঙ্গে তাকিয়ে বললে— 'তুমি যদি খাওয়াও তাহলে তোমার সব কথা ঠিক। আর তা নইলে ভাই সব বোগাস্।'

— 'হে হে, খুব কমার্সিয়াল।'

— 'নিশ্চয়ই। যেমন পৃথিবীর অবস্থা।'

— 'হো হো, ওয়েল শেড, ওয়েল শেড। সাধু, সাধু। কিন্তু আমি কেন খাওয়াবো, তোমাকে তো মাইরি সুশান্ত খাওয়াবে।'

— 'আঃ, বলছি না ভীষণ খিদে পেয়েছে—। কী কিপ্টে বাবা! খাওয়াও না। আচ্ছা, চিনে বাদামই কিনে আনো ঐ ভুজাওয়ালার দোকান থেকে।'

বীরেন হ্যা হ্যা করে বললে— 'আমি ক্যায়োঁ যাব? আমি পয়হা দিচ্ছি, সুশান্ত নি' আসুক।'

রাণু কৃত্রিম তাড়নার সঙ্গে বললে— 'বীরেনদা, ভালো হবে না বলছি।' তারপরে দুহাতে বীরেনকে পিঠে ঠেলা দিতে দিতে বললে— 'যাওনা যাওনা, নিয়ে এসো না।'

গায়ে একজন মেয়ের হাতের ঠেলা উপভোগ করতে করতে বীরেন উঠলো, এবং হাসতে হাসতে চিনা বাদাম আনতে গেল।

রাণু সুশান্তর দিকে ফিরে বললে— 'আমি কিন্তু ট্যাক্সিতে যাবো।'

অর্থাৎ তুমি আমার পক্ষে লড়বে। —সুশান্ত একটু মুস্কিলে পড়ে বললে 'কিন্তু কাল কথাটা কী হয়েছিল? তোমার সঙ্গে ব্যবস্থাটা কী হয়েছিল?'

রাণু মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে— 'তাই ব'লে আমি কেন বাসে পুড়তে পুড়তে যাবো? আর সকলে ফ্যাশান ক'রে ট্যাক্সিতে যাবে, না?— এটা ডিমোক্র্যাসীর দল, এখানে আমরা সবাই সমান। — তাছাড়া—'

ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে রাণু চুপি চুপি বললে— 'কালকে জলধিদা কী বলছিলেন জানো? বললেন, সুশান্ত খুব ইম্পরট্যান্ট ছেলে, ওর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। আমি নিজের কানে শুনেছি। বললেন, ও যদি দল থেকে চলে যায় তো খুব ক্ষতি হয়ে যাবে দলের। শরৎদাকে আলাদা বলছিলেন, আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছি।'

সুশান্তর মনে হঠাৎ একটা আনন্দের বান ডাকলো। ওর যে এতোক্ষণ খুব খারাপ লাগছিল, ও যে রাণুকে বলবে ভাবছিল যে তুমিও বীরেনের মতো ইংরেজী বোলো না,— সব ভুলে গেল। কেবল মনে হ'তে লাগলো, ওর ক্ষমতা আছে, এই শুরু হয়েছে তার

স্বীকৃতি। এইভাবে ও সকলকে দেখিয়ে দেবে— শরৎ দত্তকেও— যে ও কী করতে পারে। — যতো এইসব কথা তার মনে হতে লাগলো ততোই জলধিদার প্রতি একান্ত শিষ্যসুলভ আবেগে তার চোখ প্রায় সজল হয়ে এলো।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাবার এই পুরুষসুলভ চিন্তামগ্নতা রাণুর ভালো লাগলো না। এমন একটা খবর সে যে চোরের মতো পা টিপে টিপে গিয়ে আড়িপেতে শুনেছে তা জেনেও সুশান্ত সংপ্রশংস দৃষ্টিতে যে তারই দিকে তাকালো না এবং তারই প্রতি প্রেমানুভব করলো না এটা রাণুর খুব খারাপ লাগলো, মনে হোল, সুশান্ত তাকে কেয়ারই করে না।

বললে— 'কী? তোমার কি ইচ্ছে আমার অপমান হোক? তাহলে বলো, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।'

সুশান্ত তাড়াতাড়ি বললে— 'আরে না, না। আমি কি বলেছি?'

সে রাণুর একটা হাতের ওপর হাত রাখলো। রাখতেই তার কেমন অনুভব হোল যে এই 'স্টেজ অ্যাকশন'টাই সে এতোক্ষণ ভুল ক'রে বাদ দিচ্ছিল। প্রায় আপনা থেকেই সে হাতটার ওপর একটু চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাণু তার হাতটাকে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ ক'রে প্রায় ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে— 'তুমি কিন্তু আমার হয়ে বোলো, উঁ?' তারপর বিজয়িনীর মতো হেসে বললে— 'তুমি আর আমি যদি একসঙ্গে চলে যাই তাহলে এ ক্লাব উঠে যাবে। আমরা আছি বলেই তো টিকে আছে। কিন্তু ডেমোক্র্যাসী না থাকলে আমরাই বা থাকবো কেন, বলো?'

বীরেনকে আসতে দেখে হাত সরিয়ে নিয়ে রাণু মুখের সামনে রুমাল নেড়ে হাওয়া খেতে লাগল খুব একটা মধুর ভঙ্গীতে।

বীরেন এসে চিনেবাদামের ঠোঙাটা রাণুকে দিয়ে বললে— 'সুশীল ব্যাণ্ডোর সঙ্গে দেখা হোল। খুব স্টাইল মেরে চলেছে।'

রাণু জিজ্ঞাসা করলে— 'কে সুশীল ব্যাণ্ডো ঐ 'স্রিষ্টিকামী'-র' (অর্থাৎ 'সৃষ্টিকামী'-র।)

— 'হ্যাঁ। আজ ওদের প্লে আছে রঙমহলে, তাই রিকুইজেশনের গোড়ের মালা কিনতে এসেছিল বাজারে। দেখা হলেই এমন হেসে কথা বলবে যেন আমরা শালা কীটপতঙ্গ।'

রাণু চিনেবাদাম ভাঙতে ভাঙতে বললে— 'ওদের এখন অহংকারে নাক উঁচু হয়ে আছে। আজ রঙমহল, কাল মিনার্ভা, পরশু নিউ এম্পায়ার। আর আমাদের? কোথায় গোড়ে, কোথায় ট্যাংরা, কোথায় সিঁথি।'

বীরেন বললে— 'আরে, শিষ্টিকামীদের আগে এরকম করতে হয়নি? তখন তো ধাপার মাঠে মাজা নাচিয়ে এসেছে। তারপর যেমনি একটু পজিশন হয়ে গেল অমনি পিপল্-কে বিট্রে ক'রে আর্ট থিয়েটার ব'নে গেল। আমার সব জানা আছে বাওয়া। — দ্যাখো না আর ছমাস পরে আমরা কী করি—'

খুব একটা সংস্কৃতিসম্পন্ন উচ্চারণ ও ভঙ্গীর ক্যারিকেচার ক'রে বললে— 'কী বোল্-

ছেন? ম্যাড়াপে? স্যড়ি, ভে-ই সড়ি। আমরা ন্যু এম্পয়াড়ে কড়ি। শো লং, টা টা, চিয়াড়িও—'

রাণু একেবারে খিল খিল ক'রে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে।

এমন সময়ে শরৎ দত্ত আসে। কাঁধে একটা পেটমোটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝোলানো। সুশান্ত দেখলো, তিনটে বেজে দশ।

শরৎ দত্ত এসে গুরুজনের গাম্ভীর্য বজায় রেখে কৌতূহল প্রকাশ করলো—'কী ব্যাপার?'

ওরা তিনজনে নেমে দাঁড়ালো। বীরেন বললে— 'শিষ্টিকামী আজকাল নিউ এম্পায়ার টিউ এম্পায়ারে 'সো' করছে, তাই ওদের খুব ডাঁট হয়েছে।'

পকেট থেকে চাবি বের ক'রে ক্লাবঘরের দরজা খুলতে খুলতে শরৎ বলে— 'তা সে সব কথা রাস্তায় ব'সে বলছো কেন? লোকে শুনলে ভাববে না যে আমরা অন্য দলের চর্চা করি? ভেতরে এসে বলো।'

সকলে ভিতরে সতরঞ্চি পাতা ঘরের মধ্যে ঢোকে। ব্যাগ রেখে একটা তোবড়ানো টিনের ছাইদান টেনে নিয়ে শরৎ বসে। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের ক'রে দু'আঙুলে সেটা নরম করতে করতে বলে— 'ওসব দু'দিনের ফক্কিকারী। সংস্কৃতির প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে শো ক'রে যে টাকাটা জমিয়েছিল এইবারে সেটা বোর্ড-ওয়ালাদের দিয়ে আবার বেরিয়ে যেতে হবে। বড়ো শক্ত ঠাই।'

রাণু বললে— 'কিন্তু তবু তো তাদের পাবলিসিটি হচ্ছে,— লোকে জানছে।'

শরৎ একটু উচ্চস্তরের হাসি হাসলো। বললে— 'বীরেন, তোমার মনে আছে? সেই যে ভরতপুত্র নাট্য সমাজ? মিনিস্ট্রির টাকা পেয়ে কীরকম হোর্ডিং ব্যানার দিয়ে পাব্লিসিটি করেছিল? কিছু টিকলো? —'

বীরেন বললে— 'সব এবারে ভুপুর ভুস্—'

শরৎ মৃদু মৃদু হাস্য করলেন। শরতের বয়স তিরিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে। কিন্তু জলধিদার প্রত্যেকটি চলন বলনের নকল করতে করতে এমন হয়েছে যে এখন তাকেই জলধিদার চেয়ে বেশী প্রাজ্ঞ মনে হয়। এই প্রাজ্ঞ ও গম্ভীর শরৎ দত্তই হোল এই গ্রুপের স্ট্রং ম্যান।

সুশান্তর অনেকক্ষণ থেকেই খারাপ মনে হচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে ইচ্ছে হচ্ছিল যে কোথাও পালিয়ে যায়, পালিয়ে গিয়ে নিজের সঙ্গে মুখোমুখি ব'সে চিন্তার জট ছাড়িয়ে নিজেকে সে একটু ভালো ক'রে বোঝে। কিন্তু পালাবার উপায় নেই। আপিস তাকে কলকাতায় বেঁধে রাখবে, আর নাটকের আকর্ষণ তাকে এই সমস্ত ভাঁড়দের মধ্যে টেনে আনব।

শরৎ তখন রাণুকে বলেছে— 'অতএব আমরা যে পথে চলেছি সেইটেই হচ্ছে ঠিক পথ। আর-যারা যা করছে, বুঝলে রাণু, সব ভুল।' বিড়িতে একটা টান মেরে বললে— 'যাকগে এসব কথা। রাণু, তোমাকে বলেছিলাম, যে আমার এক বন্ধু ফিল্ম প্রোডিউস করে?—

সে একজন নতুন মেয়ে চায়, হীরোইনের পার্ট। বেলেঘাটায় আমাদের প্লে তাকে দেখিয়েছিলাম— তোমার একটা ফটো দিও তো।'

রাণু কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে গেল। — সুশান্তর মনে হয় এটা কি নবনাট্য আন্দোলনের জায়গা, না ফিল্মের শিল্পী সংগ্রহের কেন্দ্র!— মুখে একটা তিক্ত হাসি আসে তার, হঠাৎ সতরঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সে খুব তিক্তভাবে আবৃত্তি করে— 'বুক দিয়ে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল—'

বীরেন সঙ্গে সঙ্গে কালের পুতুলের মতো মুখস্থ ব'লে ওঠে— 'তারপরে হবো ইতিহাস—।'

শরৎ ভ্রূ তুলে দণ্ডায়মান সুশান্তর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে— 'কী হলো?'

কেবল নিজের ওপর ভরসা ক'রে সোজা দাঁড়িয়ে ঝগড়া সুরু করবার ক্ষমতা সুশান্তর নেই। তাই যতদূর সম্ভব উত্তেজনাকে দমন ক'রে সে বললে— 'আমাকে তিনটের আগে আসতে বলেছিলেন। অথচ এখন সাড়ে তিনটে বাজতে চললো। এবারে আমাদের রওনা হওয়া উচিত নয় কি?'

শরৎ বিড়ির ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে গম্ভীরভাবে বলে— 'হবে। তোমাদের আসতে বলেছিলাম, এসেছ। ডিসিপ্লিন বজায় রেখেছ। এতে এতো কথার কী আছে?'

সুশান্ত একটা ব্যর্থ হাসি টানবার চেষ্টা ক'রে বললে— 'আপনি নিজে কিন্তু দেরি ক'রে এসেছেন,— তিনটে বেজে দশ মিনিটে।'

শরৎ পরম শান্তভাবে উত্তর দিলে— 'তোমার ঘড়ি ভুল। তাছাড়া, যে লোক কাজ করে তার দেরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর যারা অতো কাজ করে না তাদের ঠিক সময়ে আসতেই হবে। এই হলো ডিসিপ্লিন।'

সুশান্তর মনে হলো রাণুর সামনে ওকে ইচ্ছে ক'রে অপদস্থ করা হচ্ছে। সুতরাং উত্তপ্ত কণ্ঠে ব'লে উঠলো— 'কখনো না। এটা ডিমোক্র্যাটিক অর্গানাইজেশন, এখানে আলাদা আলাদা লোকের জন্যে আলাদা আইন হ'তে পারে না। যদি তিনটেয় আসবার কথা সকলের জন্যে ফাইন্যাল হয়ে থাকে তাহলে সকলকেই তিনটেয় আসতে হবে। এইটাই ডিসিপ্লিন।'

শরৎ দত্ত ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মতো তাকিয়ে বললে— 'দ্যাখ, ওসব ডেমোক্র্যাসী-ট্যাসী আমার কাছে চালাতে এসো না। ও সব জলধিদার মতো ভালোমানুষদের কাছে বোলো। আমি বুঝি ডিসিপ্লিন। —তাছাড়া আমি যদি এখানে এসে তিনটের সময় বীরেনকে ট্যাক্সি ধরে আনতে পাঠাই ওর আধঘন্টা লেগে যেত না? তাই ট্যাক্সি আমি নিজে ঠিক ক'রে এসেছি, ড্রাইভার চা খেয়ে আসছে। তাহ'লে? হোয়াট্ দি ব্লাডি হেল্ ডু ইউ আন্ডারস্টান্ড অ্যাবাউট ডিসিপ্লিন? লম্বা লম্বা বুলি মারছো, জানো কী ক'রে একটা অর্গানাইজেশন চালাতে হয়? সেটা ডিমোক্র্যাসী দিয়ে নয়। কোনও দেশ কখনোও ডিমোক্র্যাসীতে চলে না। ওটা

বক্তৃতা। কাজ করতে গেলে চাই ডিসিপ্লিন। এবং সেই ডিসিপ্লিন রাখবার ভার আমার ওপর। অতএব এখানে, মাই ওয়ার্ড ইজ ল, যদি এখানে কেউ থাকতে চায়।'

শরৎ দত্তের উত্তাপে সবাই যেন কেমন ভয় পেয়ে চুপ ক'রে গেছে। সুশান্ত বেশ বুঝতে পারছে যে সকলের সামনে তাকে পাঁকে পুঁতে ফেলা হচ্ছে। আক্রান্ত ব্যক্তির মতো এতোটুকু সাহায্যের আশায় সে রাণুর দিকে তাকাল। — রাণু চোখ নামিয়ে সতরঞ্চি খুঁটতে লাগলো।

বাইরে থেকে ট্যাক্সির হর্ণের আওয়াজ এলো। এই আড়ষ্ট অবস্থা থেকে বের হবার সুযোগ পেয়ে বীরেন এবং রাণু উৎফুল্লস্বরে গাড়ির আগমনবার্তা ঘোষণা করলো, যদিও তার কোনও দরকার ছিল না। তারপরেই দুজনে উঠে প'ড়ে কোলাহল ক'রে মালপত্র টানাটানি করতে লাগলো।

কিন্তু সুশান্তর পক্ষে এ অপমান পরিপাক করা সম্ভব হোল না। সে এই দলের চ্যাংড়াদের মধ্যে একজন নয় যে তাতে এতো সহজে অপরের সামনে তিরস্কার করা যেতে পারে। অথচ শরৎ দত্ত এখানে যেমন শক্তিমান তেমনি ক্রূর। তার সঙ্গে লড়াই করতে নামা মানে অনেকখানির জন্যেই প্রস্তুত হয়ে নামা। কিন্তু সুশান্ত তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে, সে ব'লে উঠলো— 'তাহলে আমি গ্রুপে থাকতে চাই না। এখানে যদি ডিমোক্র্যাসী না থাকে, সকলে যদি এক আইন না মানে, তাহলে সেটা নবনাট্য আন্দোলন নয়। সেটার মধ্যে ধর্ম নেই, মহৎ কিছু নেই,— এটা অন্যায়। অন্যায়'

শরৎ দত্ত দাঁড়িয়ে উঠে ভারী ব্যাগটা কাঁধে তুলতে তুলতে বলে— 'চলে যাও, কেউ তোমাকে পায়ে ধ'রে রাখছে না। অ্যাট্ ওয়ান্স—।'

সুশান্ত দ্রুতপদে দরজার দিকে এগিয়ে চললো। বীরেন মাঝপথে তাকে ধ'রে ফেললো।

বীরেন— 'এই, কী পাগলামি হচ্ছে। শোন্, শোন্।'

শরৎ দত্ত তখন বল্‌ছে— 'নবনাট্য আন্দোলন এইটা নয়, ঐটা নয়,— আরে নবনাট্য আন্দোলন তোমার বাবার চাকর? এটা একটা জ্যান্ত জিনিস। এবং বাঁচবার জন্যে এর যখন যা দরকার পড়বে এ তাই করবে।'

সুশান্ত বীরেনের বাহুবন্ধ অবস্থাতেই মুখ ফিরিয়ে প্রতিবাদ ক'রে বললে— 'না। কতকগুলো নীতি থাকে যা মৌল, যা ফাণ্ডামেন্টাল। সেগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে যা ইচ্ছে করলে নবনাট্য হয় না।'

রাণু র্ভৎসনা ক'রে বললে— 'আঃ কী হচ্ছে! চুপ করো।'

শরৎ দত্তকে মিনতি ক'রে বললে— 'আপনি ছেড়ে দিন। সুশান্তর আজ মনটা ভালো নেই। আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো।'— সুশান্তর কাছে এসে বলে— 'ছি ছি ছি, জলধিদা শুনলে কী ভাববেন! এরকম মুখে মুখে তর্ক করা কি ভালো? এতে কী লাভ হয়? চলো চলো। এখন দেরি হয়ে যাচ্ছে না?'

ব্যাপারটা খানিকটা শান্ত হয়েছে দেখে বীরেন একটা পোঁটলা নিয়ে বেরিয়ে গেল। শরৎ দত্তও জয়দৃপ্তভাবে ট্যাক্সিতে মাল তোলা দেখতে বেরিয়ে গেল। রাণু নিজের হাতথলি ও প্রম্পটিঙের নাটকগুলো নিয়ে সুশান্তর কাছে এসে চাপা স্বরে বললে— 'তুমি কী বলতো? এরকম সামান্য দশ মিনিটের ব্যাপারে ঝগড়া বাধাতে আছে?— আমাদের ঝগড়া তো অমিতাদির সঙ্গে ডিমোক্র্যাসী নিয়ে।'

বীরেনকে আসতে দেখে বলে— 'চলো চলো, তুমিও একটা পুঁটলি নাও। ট্যাক্সিতে শরদ্দার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক ক'রে নেবে। চলো।'

সুশান্ত সত্যিই একটু পুঁটুলি তুলে নিয়ে ট্যাক্সিতে এসে চড়লো। চারজনকে নিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

সহৃদয় পাঠক সুশান্তর এই ব্যবহারের বিশ্লেষণ করা থেকে আমাকে রেহাই দেবেন। খালি এইটা কেন, সুশান্তব আগাগোড়া অনেক ব্যবহারের যুক্তিই আমার পক্ষে বর্ণনা করা শক্ত। যেমন, সুশান্ত পুঁটুলি নিয়ে গেল বটে কিন্তু শরৎ বা রাণু কারুর যুক্তিকেই সে মনে মনে মানলো না। তবু কেন যে গেল? এবং গেলই যদি, তবে ইচ্ছে ক'রে সামনে ড্রাইভারের পাশে বসতে গেল কেন? আর কেনই বা ছুটন্ত রাস্তার ওপর রোদ্দুর আর ধূলোর অসভ্য মাতামাতি দেখতে দেখতে তার অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে নিজের মায়ের কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছিল। যে-মা রাত্রে স্নান ক'রে আসতেন, শোবার ঘর হাল্কা সাবানের গন্ধে ভরে যেতো।

শরৎ দত্তের হঠাৎ খেয়াল হোল যে তারা চারজন, এর ওপর মিসেস্ চ্যাটার্জিকে তুললে ট্যাক্সিওয়ালা আপত্তি করবে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে— 'একি একজন বেশী হোল কী ক'রে?'

ড্রাইভারের পাশে ব'সে সুশান্ত আশান্বিত হোল এইবার লড়াইয়ে তার মিত্রশক্তি বাড়বে।

বীরেন বললে— 'ঐ তো রাণু এসেছে বলে।'

রাণু মাঝখানে বসেছিল। শরতের দিকে তাকিয়ে আবদারের স্বরে বললে— 'বাঃ, আমি বুঝি ট্যাক্সিতে যেতে পারি না? আমি ট্যাক্সিতে যাবো।'

রাণুর দিকে তাকিয়ে শরৎ দত্তের মুখে একটা প্রশ্রয়ের হাসি ফুটে উঠলো। মাথা নেড়ে বললে— 'বটে! তাহলে অমিতা চ্যাটার্জিকে তোলবার সময়ে তো আর একটা ট্যাক্সি করতে হবে। তার পয়সা কে দেবে? তুমি দাও তাহলে।'

রাণু চোখ ঘুরিয়ে মাথা দুলিয়ে আধো আধো ক'রে বললে— 'আ-হা, আমি কেন দিতে যাবে? আপনি দেবেন। আপনি তো করপোরেশনে চাকরী করেন।'

সুশান্ত বুঝলো রাণু ডিপ্লোম্যাসীতে জিতে গেল। রাণু খুব চালাক। যুদ্ধ এড়িয়ে ও যুদ্ধ জয় করতে জানে। কিন্তু জয় কি হোল?

হঠাৎ সমস্ত কায়দাকৌশল— যাকে সকলে বলে 'ট্যাক্‌টিক্স— তার ওপরে সুশান্তর অপরিসীম ঘৃণা বোধ হোল। মনে হলো, এতদিন এদের মধ্যে একজন পদস্থ ব্যক্তি হতে

গিয়ে সে এদেরই মতন হতে চেয়েছে। কিন্তু সেটা ভুল করেছে। পৃথিবীতে সত্যের পথ সোজা। কোনও ছলাকলা কাপট্য বা কৌশলের সেখানে দরকার হয় না। ও সেই আদর্শ নিয়ে সোজা পথেই চলবে। জলধিদা নিশ্চয়ই ওর কথা বুঝবেন। ও তাঁকে সব কথা বলবে। তাহলেই ও বাঁচবে, ওকে বাঁচতেই হবে। —সত্যিই এতোক্ষণ পরে সুশান্তর মনে একটা মুক্তির অনুভব এলো। কোনও মিথ্যাচরণ নয়, কোনও ট্যাক্‌টিক্স নয়, ও নির্মল হয়ে বাঁচবে।

সম্বিৎ ফিরে এলো শরৎ দত্তের 'রোখকে, রোখকে' চীৎকারে। ট্যাক্সি থামতেই শরৎ রাণুকে নিয়ে নেমে পড়লো। বললে— 'আমি রাণুকে আর মিসেস চ্যাটার্জিকে নিয়ে যাচ্ছি, তোমরা সোজা যাদবপুর চ'লে যাও, স্টেজে।'

দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে সামনের স্ট্যাণ্ডের আর একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে দরজা খুলে নিজেই আগে উঠে বসলো শরৎ দত্ত, রাণু পিছু পিছু অনুসরণ করে উঠলো।

বীরেন বললে— 'কাম অন দোস্। নাউ কাম ইন্‌সাইড।' সুশান্ত কোনও উত্তর না দিয়ে ড্রাইভারকে বললে— 'যাদবপুর।'

এক মিনিট আগে যে-সুশান্ত জীবনে বাঁচার পদ্ধতি পেয়ে গেছে ভেবে উল্লসিত হয়েছিল এই এক মিনিট পরেই তার কাছে আবার বাঁচাটাই বিস্বাদ বলে মনে হচ্ছে। কেন?— ভালো করে ভাবতে চেষ্টা করলো সুশান্ত। এটা কি ঈর্ষা? সেকি তাহলে রাণুকে এতো ভালোবাসে? কই না। রাণুকে তার স্বার্থপর, খল, নির্বোধ মনে হয়। তাহলে সে রাণুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিল কী ক'রে? তাকে বিয়ে করবার কথা ভেবেছিল কী ক'রে?— হ্যাঁ, তখন সে অন্য লোক ছিল, আজ সে অন্য লোক। সে অন্ধ ছিল, অনেক জিনিস সে দেখেও দেখেনি। আজ সমস্ত ঘটনাগুলো যেন অতি তীক্ষ্ণ ফোকাসে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে গেছে। — তাই যদি হয়, তাহলে সে কষ্ট পাচ্ছে কেন? তার আনন্দের উপলব্ধি হারিয়ে গেল কেন?

সুশান্ত বুঝতে পারলো, সে নিজের সঙ্গে মিথ্যো কথা বলছে। রাণুকে সে ভালোবেসেছে, এবং বাসেনি। রাণু যখন কথা বলেছে তখন বেশীর ভাগ সময়েই তার ভালো লাগেনি, কিন্তু সে যখন ঘাড় বেঁকিয়ে চোখের কোণে তাকিয়েছে তখন সুশান্তর বুকের মধ্যে তার হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে গেছে। ঐ যে রাণু শরৎ দত্তের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠলো তখন পিছন থেকে তার পাছার মসৃণ রেখা না দেখে তো সুশান্ত পারলো না। সে রেখার মধ্যে অতো কমনীয়তা বলেই তো তাকে পুজো করতে ইচ্ছে করে। আবার এতো ঈর্ষাও হয়। রাণুর বড়ো বড়ো পালকে ঘেরা কালো চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে কতো গভীর হয়ে ওঠে, যেন তাতে ডুব দিয়ে শান্তি পাওয়া যায়। সে কি কেবল যে-রাণু কথা বলে তার দৃষ্টি? না কি, আরো অন্য কোনও রাণু ঐ চোখের সমুদ্রের নীচে সেই মণি ঝলোমল সবুজ আলোতে প্রবাল পালঙ্কের ওপর অকলঙ্ক হাস্যমুখে ঘুমিয়ে রয়েছে? উর্বশীর মতো? প্রেমে কি পড়েনি সুশান্ত? তাকেই কি জাগিয়ে তোলবার স্বপ্ন দেখেনি সে? কিন্তু, তার যে সেই সোনার কাঠি নেই। —সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে সুশান্ত।

গাড়ি এসে যাদবপুরের কাছের সেই এক কলোনীতে পৌঁছুলো। সুশান্ত গিয়ে সেট্ খাটাবার কাজে লাগলো। ঘেমে ধূলোমেখে নোংরা হয়ে যখন সে কাজ শেষ করলো তখন অন্যান্যেরা এসে গেছে। বেশীর ভাগ ছেলেরাই তখন গেঞ্জি গায়ে বা এলো গায়ে চায়ের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় একজন ভলান্টিয়ার একটি চায়ের দোকানের ছেলের হাতে একটা বিরাট কেৎলি ও ছোট ছোট একরাশ ভাঁড় নিয়ে এলো। সেই ভাঁড়ে চা পরিবেশন হতে থাকলো।

বীরেন বললে— 'খাবার দাবার নেই? নো ফুড? একি শুখো মাইনের গাওনা বাওয়া!'

কাছাকাছি জনাকয়েক শিল্পী হ্যা হ্যা ক'রে হেসে উঠলো।

ভলান্টিয়ার বাইরে গিয়ে সংস্কৃতির সংগঠকদের ঘটনাটা বললো। তাঁরা বললেন— 'এঃ নগদ টাকা নিয়েছে আবার খাবার! তুমি ওসব শুনো না দীপেন, স্রেফ চেপে যাও।'

সময় হয়ে আসতে লাগলো। বাইরে দর্শক সমাগমে চতুর্দিক বেশ গম্‌গমে হয়ে উঠলো। ভেতরে কোনওরকমে তৈরি করা একটা লম্বা সাজঘর। তারই মধ্যে চট্ দিয়ে একটা পার্টিশন করা। একপাশে মেয়েরা, অপরপাশে ছেলেরা সাজছে। পার্টিশনটা নেহাতই মনকে চোখ ঠারার মতো। কারণ, জ্যালজেলে চটের ভিতর দিয়ে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা সব সায়া ব্লাউজ প'রে 'মেক আপ' করছে, পোশাক পরছে। অপরদিকে ছেলেরাও সেইরকম স্বল্পবাস পরিহিত। কেউ কেউ বা ঐখানেই 'আণ্ডারওয়্যার' প'রে নিচ্ছে। আলোচনাও তাদের বিবিধ এবং বিস্তৃত। একেবারে ফিল্ম থেকে— ফিল্ম পর্যন্ত। কোনো কথাকে বিশেষ ক'রে প্রকাশ করতে গেলে শ'-কার বা ততোধিক কুৎসিত শব্দ নির্বিকারে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সবটাই হয় খুব সহজতার সঙ্গে, যেন এর মধ্যে কোথাও কোথাও ত্রুটী থাকতে পারে না।

সাজঘরে ঢোকবার পথটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুশান্ত ভাবছিল, সব দলেই কি এমন হয়! নিজের দলের প্রতি তার এতদিন খুব একটা একানুগত্যের অহংকার ছিল, তাই খোঁজ নেবারও দরকার বোধ করেনি। আজ জানতে ইচ্ছে হোল!

ওদিকে তখন শরৎ দত্ত সংগঠকদের খোঁজাখুঁজি ক'রে বেড়াচ্ছে! টাকা যেটা পাওনা আছে সেটা এইবেলা আদায় ক'রে না নিতে পারলে পরে আর ভরসা নেই।

সংগঠকদের তখন একটা মিটিং হচ্ছে। কাছাকাছি আর একটা সংস্কৃতি উৎসবের প্রতিযোগিতায় এবারে অর্থাগম কিছু কম হয়ে গেছে। তার ওপর নিজেদের রাহা খরচ ও জলপানের খাতে খরচা একটু বেশী হয়ে গেছে। ফলে, কাউকে বঞ্চিত না করলে নিজেদের ভাগে আয়কর-রহিত-আয়ের অংশ একেবারেই শূন্য হয়ে যায়। তাই কাকে কাকে প্রকৃষ্টরূপে বঞ্চনা করা যায় তারই ফয়শালা করতে এই মিটিং।

শরৎ গিয়ে জলধিদাকে বললে— 'টাকা না দিলে, শো বন্ধ ক'রে দেব। করবো না।'

জলধিদা দাড়ি লাগাতে লাগাতে তাকালেন শরতের দিকে। একটু অন্যমনাভাবে চেয়ে

থেকে বললেন— 'না না, টাকার জন্য শো বন্ধ করো না। শো মাস্ট গো অন। —তবে দ্যাখ একটু চেষ্টা ক'রে— টাকাটাও তো দরকার।'

দুবার ওয়ার্নিং বেল বাজবার পর আর বাজছে না। দর্শকরা অসিহষ্ণু হয়ে উঠছে। একজন ছুটতে ছুটতে এসে বললে— 'কী মশায় আরম্ভ হচ্ছে না কেন? আরম্ভ ক'রে দিন—'

শরৎ দত্ত বললে— 'আপনাদের সেক্রেটারীকে ডেকে দিন। তিনি না বললে তো আরম্ভ করতে পারি না। তাঁর কথাতেই তো এসেছি।'

একটু পরেই বেঁটে মোটাসোটা সেক্রেটারীটি এসে গেলেন। এবং শরৎ দত্তকে এড়িয়ে জলধিদার কাছে গিয়ে চুপি চুপি কুড়ি খানা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন— 'জলধিদা, বাকি একশো টাকা আমি কালই গিয়ে আপনার বাড়িতে দিয়ে আসবো। এমন মুস্কিলে পড়ে গেছি—। আপনি প্লে-টা আরম্ভ করতে বলে দিন, অডিয়েন্স একেবারে ক্ষেপে আছে।'

জলধিদা বললেন— 'না না, ছি ছি, এর জন্য প্লে কেন আটকাবে? এই নন্দ, শরৎকে বলো এক্ষুনি শুরু ক'রে দিক।'

এমন কি তিনি টাকাটাও নিজের হাতে ছুঁলেন না, সুশান্ত সামনে দাঁড়িয়েছিল, তাকে ডেকে টাকাগুলো রেখে দিতে বললেন।

তারপর, খুব লম্বা একটা ঘন্টি মেরে পর্দা উঠে গেল, এবং এতগুলি সংস্কৃতি-সাধকের যুগপৎ চেষ্টায় আরো এক সন্ধ্যার সংস্কৃতি-বিতরণ সুরু হলো।

মাইকের অব্যবস্থায় দর্শকরা শুনতে পাচ্ছে না। খানিকপরে গোলমাল শুরু হোল। তাতে জলধিদা বললেন— 'সবাইকে বলো এগিয়ে গিয়ে যেন মাইকের কাছে অ্যাকটিং করে।'

সুশান্ত আপত্তি ক'রে বললে— 'কিন্তু তাহলে যে সমস্ত প্রোডাক্‌শনটাই খারাপ হয়ে যাবে। কী রকম অস্বাভাবিক দেখাবে না?

জলধিদা বললেন— 'ওসব সূক্ষ্ম জিনিসের কেউ দাম দেয় না ভাই। এরা কেউ নাটকটার মূল কথাটা ধরতে পারছে? এরা সস্তায় বাহান্ন মজা মারতে এসেছে। এইরকম ক'রে ম্যারাপ বেঁধে মাইক দিয়ে কখনো থিয়েটার হয়? ভাঁড়ের নাচ হ'তে পারে। যাও যাও, বলো— এগিয়ে গিয়ে সবাই চেঁচিয়ে বলুক।'

গিয়ে বলে এলো সুশান্ত। কিন্তু আবার ফিরে এলো জলধিদার কাছে। প্রশ্ন করলে— 'তাহলে এরকম ক'রে এসব জায়গায় আমরা অভিনয় করি কেন? এতে তো আমরা যে-থিয়েটারের কথা বলি, যে-নাট্যশিল্পের কথা বলি, সব নষ্ট হয়ে যায়।'

জলধিদা অত্যন্ত শান্তভাবে মুখ তুলে তাকালেন। মোটাসোটা মানুষটির মাংসপেশী সব শিথিল হয়ে গেছে। বড়ো বড়ো চোখের কোণগুলো রক্তাভ। একদৃষ্টে সুশান্তর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন— 'এই হোল জীবন। তোমার দেশের লোক এইরকম-থিয়েটার পেলেই তুষ্ট। হয় চীৎকার, নয় ভাঁড়ামি, নয় ম্যাজিক। তুমি আমি কী করতে পারি, বলো? উই আর ইন্ দি মাইনরিটি।'

স্টেজে ঢোকবার সময় আসায় কথায় ছেদ পড়ে গেল।

এইভাবে সেই সংস্কৃতিযজ্ঞ সেদিনের মতো শেষ হ্লো। দর্শকরা হৈ-হৈ ক'রে বাড়ি চললো। সংগঠকরা ঠাণ্ডা লেমনেড খেতে লাগলেন। শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা ওরই মধ্যে একটু নামজাদা— বিশেষ করে মহিলা শিল্পীদের— ঠাণ্ডা লেমনেড খাওয়াবার জন্যে খুব উপরোধ চলতে লাগলো। প্লে নাকি খুব ভালো হয়েছে, সেই অমুকদের প্লের চেয়েও নাকি অনেক ভালো হয়েছে।

এর মধ্যে সুশান্ত দেখছে রাণু শরৎ দত্তের প্রতি একটু বেশী ভক্তি অনুভব করছে। একবার এ আলোচনাও কান খাড়া ক'রে শুনতে পেল যে শরতের এক বন্ধু ফটোগ্রাফার, শরৎ একটা চিঠি লিখে দেবে, রাণু তার স্টুডিয়োতে গিয়ে ছবি তোলাতে পারে। সুশান্তর মনটা ভিক্ষুকের মতো হয়ে উঠলো। সে কয়েকবার রাণুকে ডেকে কথা বললো, একবার একটু আবছায় মতো জায়গায় সে একটু আদিরসাশ্রিত রসিকতাও করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু রাণু হাসলো যেন ভদ্রতা ক'রে, কথাটা না শুনেই। রাণুর চোখে সেই দৃষ্টি একবারও এলো না। সেই দৃষ্টির আভাসই এলো না। সুশান্ত বেশ বুঝতে পারছে যে রাণু তার কাছ থেকে পিছলে স'রে যাচ্ছে। রাণু নিজেকে সস্তা করছে। অথচ ঠেকাবারও উপায় নেই। যদি অন্যত্র ও ঠকে, ঠোকা খায়, তাহলেই আবার ও সুশান্তর কাছে ফিরে আসবে। এবং তাও সুশান্তর ব্যক্তিত্বের জন্যে নয়, অন্যান্য জাগতিক সুবিধের জন্যে।

অপরাপর অভিনয়ের দিনে রাণু শেষকালে ফিরতো সুশান্ত ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে। বাসে। আজ সে বোধহয় গোড়া থেকেই চেষ্টা করছিল যাতে বাসের শ্রেণী থেকে সে ট্যাক্সির শ্রেণীতে উন্নীত হয়। তাই আজ বেরুবার সময়ে তাকে কোথাও পেল না সুশান্ত। অন্যান্য ছেলেরাও কেউ আজ থাকলো না। নানান্ অজুহাতে তারা চ'লে গেছে। অথচ সেই পুঁটুলিগুলো র'য়ে গেছে যেগুলো ক্লাবঘরে তুলতে হবে। সুশান্ত শ্রান্তভাবে সেইগুলোর মধ্যে খানিকক্ষণ ব'সে রইল।

চারিদিকে এটা ছন্নছাড়া ভাব। মেক-আপের টেবিলগুলোর ওপর স্পিরিটগাম্ চল্‌কে প'ড়ে চট্ চট্ করছে। কতকগুলো রঙ মোছা ছেঁড়া ন্যাকড়া নারকেল তেলের গন্ধে ভর্ ভর্ করছে। কয়েকটা চায়ের ভাঁড়। একটা কাত হয়ে পড়েছে। চতুর্দিকে কাগজের টুক্‌রো। ছেঁড়া শালপাতা। —দেখলে মনে হয় কোন্ প্রেতের দল যেন এখানে ঢুকে সমস্ত নোংরা ক'রে, তছনছ ক'রে, চ'লে গেছে।

সুশান্তর মনের সঙ্গে এই পরিবেশ বড়ো খাপ খেল। তার মনে হ'তে লাগলো যে, জীবনে মরাটাই বড়ো। শেষ হোল এই, এখানকার মতো এই শ্মশানের চেহারায়। কী লাভ কোন কিছুর জন্যে চেষ্টা ক'রে : কোন্ উচ্চাশা চরিতার্থ করবার জন্যে নিজের প্রথম যৌবনের অসম্মান ঘটিয়েছে? যে-মানুষ সে হতে চেয়েছিল, যে-মানুষ সে হতে পারতো, তা না হয়ে ও এমনটা হোল কেন? আজকাল ওর আর জ্ঞান আহরণের ইচ্ছে নেই। ও কেবল

বেছে বেছে সেইসব বই পড়ে যা প'ড়ে রাখলে এইরকম সব দলে চাল মারা যায়। ও সেইসব সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বুলি মুখস্থ রাখে যা বলামাত্র এদের মধ্যে ওর 'পজিশন' হয়। কীসের পজিশন! কী লোভে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসে সে তেজারতির কারবার খুলে বসলো! কী অভিশাপে নতুন থিয়েটার করতে নেমে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলবার কথা ব'লে এলো!—

আমরা সবাই সমান। আজ রাণু ছুটছে উচ্চাশার পিছনে, এতদিন ও নিজে ছুটছিলো। হঠাৎ আজ বরাতক্রমে দু'একটা অপমানের মধ্য দিয়ে তার সম্বিৎ ফিরে এলো। কিন্তু রাণু তো মেয়ে, সুতরাং তাকে আরো বেশী দাম দিতে হবে। একে ওকে তাকে সুবিধে নিতে দিতে হবে। হয়তো এক আধবার গর্ভনষ্ট করাতে হবে। তারপর সর্বদেহে সেই লাঞ্ছনার ইতিহাস বহন ক'রে হয়তো সুশান্তর কাছে ফিরে আসবে। এমনই হামেশা হয়, এমনিই হচ্ছে। তখন কি সুশান্ত আবার তাকে গ্রহণ করবে?— না। তা সে পারবে না। লোকে ঠাট্টা করবে। যারা রাণুর ওপর সুবিধে নেবে তারাই মুচকি হেসে বলবে— 'ওর স্ত্রীর সঙ্গে আমরা শুয়েছি। তখন জিনিস আরো ভালো ছিল।' — অসম্ভব, সে-রাণুর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। — কিন্তু ভুল তো সে নিজেও করেছে, তারও তো একভাবে চরিত্র নষ্ট হয়েছে। শুধু রাণু মেয়ে বলেই কি তার চরিত্র দেহের সঙ্গে এতো যুক্ত? এই পুরুষশাসিত সমাজে কেবল মেয়ে বলেই কি তাকে এতো বেশী দাম দিতে হবে?

উত্তেজনায় সুশান্ত উঠে পড়লো। মনে মনে বললে— হ্যাঁ, দিতে হবে। তাই-ই দিতে হয়। আমি তো তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কতো সহজে রাণু সেটা তুচ্ছ করতে পারলো। তারপর একদিন ব্যবহৃত হয়ে, কীটদষ্ট হয়ে যখন ফিরে আসবে তখন সেই অতলসাগরের অন্য-রাণুকে কি আর জাগানো যাবে? সে কি ততোদিনে একেবারে ম'রে যাবে না?

হঠাৎ দেখালো জলধিদা। পাশের এক বাড়িতে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ণ করছিল, তাই তাঁর যাওয়া হয়নি। এখন যাবার সময় দলের কে একজন র'য়ে গেছে শুনে তিনি দেখতে এসেছিলেন। সব শুনে বললেন— 'ছি ছি,' শরৎরা কেউ কোনো বন্দোবস্ত না করেই চ'লে গেল? চলো চলো, আমার জন্যে ট্যাক্সি রয়েছে, তুমি পথে আমাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে ক্লাবে গিয়ে পুঁটুলিগুলো তুলে দিয়ো। — চাবি আছে তো? বাস্, তাহলে চলো আর দেরি করো না।'

জলধিদার সঙ্গে ট্যাক্সিতে রওনা হোল সুশান্ত।

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে পারলো না। ব'লে ফেললো— 'জলধিদা, আমি বোধহয় আর গ্রুপে থাকতে পারবো না।'

জলধিদা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন— 'আর কোথাও বেটার চান্স পাচ্ছো?'

সুশান্ত অতি দুঃখেও একটু হাসলো। বললে— 'আপনি আমাকে অতো ছোট ভাববেন না। আমি চান্সের লোভে পালিয়ে যাচ্ছি না।'

জলধিদা সুশান্তের হাতের ওপর মৃদু মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন— 'রাগ কোরো না। এমনিতে কেউ চান্স পেয়ে চ'লে গেলে দলের মধ্যে তাকে গালাগালি দিই বটে, সেটা খালি বাকি লোকের 'মরাল' ঠিক রাখার জন্যে। কিন্তু মনে মনে তো জানি যে-যাবে সে বেঁচে যাবে। এখানে তো কারুর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আমার বাবা সারাজীবন খেটে খানকয়েক ছোট খাট বাড়ি ক'রে গেছেন তাই না আমি কেবল নবনাট্য ক'রে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু সবাই কি করে পারবে? অতোবড়ো উৎসাহী কর্মী ছিল অনিল,— অনিল রায়, — সে-কি পারলো? তাই কেউ যদি চান্স পায়— বিশেষ ক'রে চাকরীতে চান্স পায়— আমি খুব খুশী হই। ভাবি, যাক এক সংসারটা অন্তত নিরাপদ। ক্লাবে গাল দিই, কিন্তু মনে খুশী হই।'

সুশান্ত বিস্মিত হ'য়ে বললে— 'আপনি একজন পুরানো লোক। আপনার মনেই যদি এরকম সন্দেহ থাকে তাহলে এ আন্দোলন টিকবে কী ক'রে?'

জলধিদা হাসলেন, বললেন— 'টিকবে, টিকবে। আমরা যেমন ক'রে চেয়েছি তেমন ক'রে টিকবে না, কিন্তু দেশের লোক যেমন ক'রে চায় তেমন করেই টিকবে। — কীরকম জানো? বুদ্ধ একটা ধর্ম প্রচার করলেন। কিন্তু সে ধর্ম বড়ো কঠোর, সেটা মানতে গেলে দেশের লোককে বদলে যেতে হয়। তাই তারা নিজেদের স্থূলতা দিয়ে বুদ্ধকেই বদলে নিলে। সেইটুকুই টিকলো। আমাদের এই হিন্দুধর্মের কথাই ধরো না, একদিন তো বলেছিল যে, যেনাহং অমৃতস্যাম্ তেন কিম্ কুর্য্যাম, যা অমৃত নয় তাকে নিয়ে আমি কী করবো। বলেছিল, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। কিন্তু লোকে সেটাকে টেনে এনে হাঁচি, টিকটিকি ওলাপুজো, মনসাপুজোয় নামিয়ে ফেললো, এবং এটাই টিকলো। সেই সময় নবনাট্যের দু'একটা প্যাঁ হয়তো দেশের থিয়েটারে অঙ্গীকৃত হয়ে যাবে। সেইটুকুই টিকবে।'

সুশান্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। জলধিদা এইসব কথা বলছেন একথা সে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করতো না। রাস্তার আলো গাড়ির মধ্যে এক একবার চম্‌কে দিয়ে তক্ষুনি ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। সেই আলোতে জলধিদার মুখে প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্ধক্যের ভাঙন লেগেছে। চরম হতাশায় যে ঔদাসীন্য আসে তারই ছাপ তাঁর চোখে। সুশান্তর দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, — 'বেশী বক্তৃতা দিচ্ছি না? তোমাকে বলতে ইচ্ছে হোল, তাই বললাম।'—

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করলে— 'আমরা তাহলে কী করবো?'

জলধিদা প্রথমে উত্তর দিলেন না, তারপর হঠাৎ বললেন—'সত্যি বলবো? শুনবে?' কাছে ঝুঁকে পড়ে গোপন কথা বলার মতো ক'রে বললেন— 'কাউকে কেয়ার কোরো না। কিচ্ছু গ্রাহ্য কোরো না। ভালো মন্দ সৎ অসৎ নিয়ে একদম মাথা ঘামিও না। যা ইচ্ছে হবে, তাই করবে, সেটা যদি পাগলামি হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা হয়, অশ্লীলতা হয়, তাও করবে।

খালি নামাবলী গায়ে দিয়ে নিজের কাছে ভণ্ডামী কোরো না, প্রগতি করছি মনে ক'রে ভাঁড়ামি কোরো না, মাতৃস্নেহ দেখাবার অছিলা ক'রে স্তন খুলে দেখিয়ো না। ব্যাস্, যদি পারো, বেঁচে যাবে। এই আমার উপদেশ।'

সুশান্তর বুকে আবার জোয়ার জেগে উঠলো। রুদ্ধ গলায় বললে— 'ঠিক আমিও তাই ভেবেছি। সত্যের পথ সোজা। সেখানে কোনো ছলাকলা কায়দা কৌশলের দরকারই হয় না। আমি সেই পথেই চলবো।'

জলধিদা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সুশান্তের একটা বাহু ঝাঁকনি দিয়ে বললেন— 'কে তোমাকে বলেছে সত্যের পথ সোজা? ইডিয়ট!' পৃথিবীতে একটাও সত্যি কথা কখনো সোজাসুজি ঘটে? একটা নতুন গাছ জন্মানোর জন্যে পৃথিবীতে কতো কৌশল করা হয় দেখতে পাওনা? কতো ছলাকলী ছেনালি ক'রে রঙ বেরঙের ফুল তৈরি করা হয়, সেই ফুলে গন্ধ দিয়ে মধু দিয়ে কীটপতঙ্গকে প্রলুব্ধ করা হয়, সেই পোকাদের পায়ে পায়ে রেণু গিয়ে তবে ফুলে ফল ধরে। মনে থাকে, তারা আসে নিজেদের খাবার লোভে, আর রেণু ব'য়ে নিয়ে যাওয়াটা হোল অ্যাক্সিডেন্টাল— একটা বাই-প্রোডাক্ট! এই হোল সত্য, আসল কাজটাই হোল বাই-প্রোডাক্ট। তুমিও তাই যা ইচ্ছে ক'রে যাও। উন্মাদ হয়ে নাচো, যদি তাই ইচ্ছে হয়। তাহলেই বাই-প্রোডাক্টের কাজ যার নেবার সে ঠিক নিয়ে নেবে। — আরে, তোমার আমার জন্মটাই তো অ্যাকসিডেন্টাল, একটা বাই-প্রোডাক্ট। ইউ হ্যাভ নো মর্যাল্স্ বাট্ ইওর হাঙ্গার।'

সুশান্ত যেন ডুবজলেরও বাইরে চ'লে গেছে। ব'লে ওঠে— 'কিন্তু ধর্ম? জীবনে কোনও ধর্ম থাকবে না। আমাদের? কোনও নীতি থাকবে না? তাহলে আমাদের ধারণ করবে কীসে?

জলধিদা হা হা ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন— 'বোকা, বোকা। তোমরা কেবল আমার দাদা সাজা চেহারাটাই দেখেছ, আমার ইতিহাসটা দেখনি? আমি তো অনিল রায়ের সঙ্গে একরকমের ধর্ম, নীতি— সব মেনে শুরু করেছিলাম, সে-ধর্ম কি আমাকে ধারণ করলে? সেই নীতি কি আমাকে জয়ের মালা পরালে? — আমরা সবাই কুত্তা, মুখে ক'রে বল এনে দিয়েই ল্যাজ নাড়ি, এবার প্রভু নিশ্চয় কিঞ্চিৎ বিস্কুট দেবেন। ধর্ম নীতি বজায় রেখেই ভাবি এবার প্রভু পুরস্কার দেবেন। কে পুরস্কার দেবেন? ভগবান? ইতিহাস? বিপ্লব? — ইডিয়েটস্!— বাঁচতে যদি চাও খালি নিজের জন্যে বেঁচো। ক্রুর হ'য়ো, হিংস্র হয়ো, আর শঠ হয়ো। তবেই বাঁচতে পারবে।'

সুশান্ত জলধিদার হাঁটু ধ'রে প্রায় ব্যাকুলভাবে অনুনয় ক'রে বলে— 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না আপনি দয়া করে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি যদি কেবল নিজের কথা ভাবি তাহলে গ্রুপ চলবে কী করে? সমাজ চলবে কী করে?'

জলধিদা খানিকক্ষণ উত্তর দিলেন না। এতক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে পড়েছেন, তাঁর

সেই হাঁপানির টানটা শুরু হয়েছে। দম নিয়ে শ্রান্তভাবে বললেন—- 'ওসব শুধু শেখানো বুলি। তুমি তোমার মতো বাঁচো, তাতেই সমাজের যা হবে তাই যথেষ্ট হবে। শেলী বায়রণের কী জীবন ছিল? সামাজিক? র‍্যাঁবো ভেরলেনের কী জীবন ছিল? আর্থার মিলার কেন মেরিলীন মনরোকে ক'দিনের জন্যে বিয়ে করে?—ওসব বুলি আউড়িয়ো না, আমার মতো দশা হবে। আর তাহলেই দেখবে যে ঐ শরৎ দত্তের মতো একজন স্ট্রং ম্যান এসে আমাকে ভক্তি করেই দলকে নিজের মনোমত ক'রে নেবে। স্টালিন। — আমি সব বুঝতে পারি।'

সুশান্তর বুকে তর্জনী ঠুকে বললেন— 'যদি ছেড়ে পালিয়ে যাও,— তুমি নির্বীর্য্য। যদি বুক ফুলিয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে যাও,— তুমি নির্বোধ। পৃথিবীটা অরণ্য। এখানে বাঁচতে চাও তো চালাক হও। নিজেকে বোঝো, নিজের স্বার্থকে বোঝো। — চুপ, আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। আমার এতো বলা উচিত হয়নি।'

হাঁপানির টানের একটা শব্দ হ'তে থাকে জলধিদার।

বাড়ির কাছে এলে জলধিদা নামতে যেয়ে হঠাৎ একটু ক্লিষ্ট হাসি হাসেন, তারপর হাত বাড়িয়ে সুশান্তর হাতটা ধ'রে বলেন— 'তোমাতে আমাতে একটা চুক্তি হোক। এসব কথা কাউকে বোলো না। বাইরে আমি শরৎদের সঙ্গে মিশে তোমায় গালাগালি দেব, কিন্তু ভেতরে সাহায্য করবো। — Please আমাদের মেরে তাড়িয়ে দাও। মুছে ফেলে দাও। তবে ভালো হবে। —কথা রইল?'

সুশান্ত খুব ভেবে মাথা নেড়ে সায় দিল।

'চললাম'— ব'লে শেষবারের মতো সুশান্তর হাতে একটা চাপ দিয়ে জলধিদা নেমে গেলেন।

একলা ট্যাক্সিতে ব'সে ক্লাবঘরের দিকে যেতে যেতে সুশান্ত ভাবতে লাগলো, সত্যিই পৃথিবীতে ন্যায় অন্যায়ের কোনও মেলোড্রামাটিক বিভাগ নেই। এখানে লড়াই মানে তীরধনুক নিয়ে ধর্মযুদ্ধ করা নয়। এখানে অন্ধকারের স্তরে স্তরে গাছের শিকড়দের মাটির নীচেকার প্রাণপণ লড়াইয়ের মতো। সেই অদৃশ্য অবিরত লড়াই করবার যার সামর্থ্য থাকবে সে-ই জিতবে। ঠিক। এইটাই মর‍্যালিটি। নির্মল জীবনযাপন বাজে কথা। মন্দের সঙ্গে আপোষ করতেই হবে। তাই করবো, সুশান্ত চোখ খুলে লড়াই করবে।

এমন চালাকের মতো লড়বে যে বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারবে না যে ও কী প্রাণঘাতী লড়াই লড়ছে। হাতে বাঘনখ দিয়ে ও শিবাজীর মতো হেসে আলিঙ্গন করবে। ও কাউকে রেহাই দেবে না, কারণ কেউ তো ওকেও রেহাই দেবে না।

আপনমনে হাসলো সুশান্ত। নিজেকে খুব ধীর, খুব স্থির ব'লে মনে হ'তে লাগলো এতক্ষণে।

গাড়ি যেখানে ট্রামরাস্তা ছেড়ে ক্লাবের রাস্তায় বেঁকবে তারই মোড়ে হঠাৎ দেখলো রাণু দাঁড়িয়ে বাস-এর অপেক্ষা করছে।

নিশ্চয় শরৎ দত্ত বাড়ি যাবার পথে রাণুকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু এতো দেরী হোল কেন? নিশ্চয়ই কোথাও খাইয়েছে রাণুকে। এরা দুজনে মিলে কি সুশান্তকে শেষ ক'রে দেবে ভেবেছে?

'রোখকে, রোখকে' ব'লে গাড়ি থামিয়ে রাণুকে ডাকলো সুশান্ত। যেন কিছু হয়নি, যেন রাণুকে দেখতে পেয়ে ওর খুব আহ্লাদ হয়েছে, এমননিভাবে ডাকলো রাণুকে।

রাণু যেমন আশ্চর্য হোল, তেমনি যেন একটু লজ্জাও বোধ করলো।

সুশান্ত একগাল হেসে বললে— 'চলো, ক্লাবঘরে পুঁটলিগুলো রেখে তোমাকে ট্যাক্সিতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করলে সুশান্ত পরম প্রেমভরে রাণুর হাতটা দুহাতে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলে— 'এখানে একলাটি দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?'

রাণু বললে—'ঐ-ইয়ে-একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তারা এই পর্যান্ত লিফ্‌ট্‌ দিলে।'

সুশান্ত কোনও প্রশ্ন না তুলে রাণুর মুখের কাছে স'রে এলো, নাক তুলে শুকে পরম প্রেমাপ্লতুভাবে মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করলে— 'খুব খেয়ে এসেছে মনে হচ্ছে। কে খাওয়ালে?' — যেন খুব নির্দোষ রসিকতা।

রাণু অকারণে একটু রেগে বললে— 'কে আবার খাওয়াবে? চৌরঙ্গীতে নেমে একলা পাঞ্জাবী হোটেলে খেলাম। তারপরে বেরিয়েছি— ইয়েদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

সুশান্ত উজ্জ্বল চোখে রাণুর প্রায় মুখের কাছে মুখ এনে বললে— 'সত্যি তুমি খুব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর।'

সুশান্ত যে প্রশ্ন করলো না, তাকে কোনো সন্দেহই করলো না, এতে রাণু কতৃজ্ঞতার সঙ্গে আবার যেন একটু প্রেম অনুভব করলো সুশান্তের প্রতি। তাই একটা চুমুও খেতে দিল সুশান্তকে। তারপরে মুখ সরিয়ে নিয়ে সলজ্জ তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললে— 'কী অসভ্য!'

সেই ঘাড় বেঁকিয়ে অপাঙ্গে তাকানো। কিন্তু আজ সুশান্তর মন দ্রবীভূত হোল না। আজ যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে রাণুর চোখে খালি ছলনা, খালি ছেনালি। একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করলো সুশান্ত। আজ সে অভিভূত হচ্ছে না। কিন্তু কেবল আবেগ থেকে মুক্তি পেলেই তো হবে না। রাণু তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে শরৎ দত্তের হাত ধ'রে ভাসবেই। তখন সুশান্তর পৌরুষ অপমানিত হবে। সকলে তাকে ঠাট্টা করবে jilted ব'লে। শরৎ দত্তের সঙ্গে যে-কোনো ঘটনা নিয়ে লড়তে যাক না কেন সকলে ভাববে সে ঈর্ষায় ঝগড়া করছে। না, তার আগেই এদের শেষ করতে হবে। জলধিদা ঠিক বলেছেন, শুধু নিজের স্বার্থ বোঝো। যে রাণু তার বাঁচার পথে কন্টক হচ্ছে তাকে একেবারে তছনছ ক'রে দিতে হবে। যাতে তার কোনও ক্ষমতা না থাকে সুশান্তর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার। — কিন্তু কী উপায়? কেমন ক'রে রাণুকে সেই চরম অপমানটা সে করবে? জলধিদা

বলেছেন— ক্রূর হয়ো, হিংস্র হয়ো, আর শঠ হয়ো ; তবেই বাঁচতে পারবে। — সুশান্তর মাথার মধ্যে যেন একশ' সাপ কিল্‌বিল্‌ করে।

রাণু আধবোজা চোখে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস ক'রে প্রশ্ন করলে, 'কী দেখছো?'

সুশান্ত তাড়াতাড়ি চোখ গোপন করতে হেঁট হয়ে রাণুর হাতে চুমু খেল। তারপর যেন নেশা ধরেছে চোখে সেইভাবে তাকিয়ে বললে— 'তোমাকে।'

রাণু উদ্ভাসিত হয়ে বললে—'আ-হা, মিথ্যুক।'

সুশান্তর কণ্ঠের গভীরে একটা চাপা হাসি বেজে উঠলো। সে পারছে। সে পারবে। তাকে পারতেই হবে। বাঘনখ হাতে নিয়ে সে মধুর হেসে আলিঙ্গন করবে। ঠিক। আলিঙ্গনই সে করবে। আজ সে রাণুকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক ঘটাবে। তারপর সেই অবস্থাতেই রাণুকে এমনভাবে কুৎসিৎ ঠাট্টা করতে শুরু করবে যেন সে একটা রাস্তায়-দাঁড়ানো বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং কাল সকাল থেকেই সকলের কাছে ঘটনাটা এমনভাবে প্রচার করবে যে তারপরে রাণুকে ফুস্‌লে নিয়ে শরৎ দত্তকে আর গর্ববোধ করতে হবে না। বরঞ্চ সুশান্ত তাড়িয়ে দেবার পব রাণু যতো শরৎ দত্তকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করবে ততোই সকলের সামনে শরৎ দত্ত খেলো হ'তে থাকবে।

ঠিক। এই কাজই সে করবে। ক্লাবঘরের চাবি তার কাছে। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেবে। তারপর— ক্লাবঘরেই তার নতুন মিলিটারি কৌশলে প্রথম এবং একটা প্রধান শত্রুর বিনাশ।

আবার তেমনি ক'রে হেসে উঠে সে রাণু হাতের তালুতে, তার আঙুলের ডগাতে উপর্য্যুপরি চুমু খেতে লাগলো।

ক্লাবঘর এসে গেল। রাণুকে একটু ছোট্ট পুঁটুলি ভেতরে আনতে ব'লে সে বড়ো বড়ো পুঁটুলি দুটো দু'হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে গেল। রাণুর হাতের প্রম্পটিং-এর কপিগুলো আলমারিতে রাখতে ব'লে সে আবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিল।

রাণু আলমারি বন্ধ ক'রে ফিরে বললে— 'একি, ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে নাকি?'

হাতের একটা বাক্স নামিয়ে রেখে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে সুশান্ত বললে— 'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করবো ব'লে।'

রাণু কীরকম ভয় পেয়ে ব'লে ওঠে—'না, না, এসব ঠিক নয়। এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে।'

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সুশান্ত সামনে এসে বলে— 'এতো রাত্তিরে কে আসবে? কার দরকার?'

রাস্তার আলো তেরছা হয়ে ঘরের মধ্যে পড়েছে। রাত তখন এগারোটার কাছে।

এই নির্জন ঘরের সান্নিধ্য রাণুকে যেন একটু দুর্বল ক'রে ফ্যালে। সে শুধু বলে— 'লক্ষীটি, বাড়ি চলো।'

দুহাত দিয়ে রাণুর মুখটা তুলে ধ'রে সুশান্ত বলে— 'কেন? আমাকে ভালোলাগে না তোমার?'

অজস্র চুমু খেতে থাকে রাণুর কপালে, তার চোখে, তার গালে, এবং তারপরে ঠোঁটে।

এইবার সুশান্তর মনে এক মিশ্রিত ভাব আসে। রাণুর ত্বকে কী একটা হাল্কা গন্ধ আছে। সেই চেনা লোভনীয় গন্ধ ক্রমশ সুশান্তকে আবিষ্ট ক'রে ফেলতে থাকে। অথচ এটা যে লড়াই তাও সে বিস্মৃত নয়। — একই সঙ্গে কি একজনকে এতো ভালোবাসা আর এতো ঘৃণা করা যায়। — হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ভালোবাসার আবেগ যেন কোথা থেকে পাক দিয়ে উঠে এসে ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়লো। অন্ধ চোখে সুশান্ত দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো রাণুকে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে ঠেকলো রাণুর পিঠের ব্লাউজের নীচে বক্ষবন্ধনীর স্ট্র্যাপটা। তক্ষুনি তার মাথার মধ্যের সাপগুলো যেন গর্জন ক'রে ছোবল মেরে ওঠে। আর সুশান্ত পাতলা ব্লাউজের ওপর থেকেই দু'হাতে স্ট্র্যাপের হুক্‌টা খুলে দেয়।

রাণু সবলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে— 'এই, ওকি হচ্ছে। ওসব গাড়োয়ানি আমরা ভালোলাগে না।'

সুশান্ত জোর ক'রে তাকে টেনে এনে তার কাঁধ থেকে আঁচল সরিয়ে দিতে যায়। কিন্তু রাণু তাকে ধাক্কা দিয়ে ছিট্‌কে স'রে যায় দেয়ালের দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে— 'কী করছো কী? বলছি এসব আমার ভালো লাগে না। আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে তো বলো। আমি এখুনি বাড়ি যাবো।'

সুশান্ত বুঝলো কোনও কাজ ভাবা যতো সহজ সেটা সম্পন্ন করা ততো সহজ নয়। সেও তখন হাঁপাচ্ছে। মনে মনে বললে— ও, 'হী-ম্যান' ভালো লাগে না তোমার? বেশ, তাহলে ফিল্মকুমার হবো। মিঠে ক'রে বলবো। জিত্‌তে আমাকে হবেই। এ ঘর থেকে রাণু অক্ষত বেরোতে পারলে আমার সর্বনাশ হবে।

কিন্তু কথা বলতে গিয়ে তার গলা কাঁপতে থাকে, আওয়াজটা অন্যরকম শোনায়। একহাতে আলমারির ওপর ভর দিয়ে সে ঝুঁকে প'ড়ে বলে— 'কেন? আমাকে তোমার ভালোলাগে না। আমাকে যে তাহলে বিয়ে করবে বলেছিলে, সে সব মিথ্যে? এতোদিন আমাকে যতো ভালোবাসার কথা বলেছ সব মিথ্যে? বলো? আমি কালই বিয়ের নোটিস দিতে যাবে। ভেবেছিলুম রেজিস্ট্রারের কাছে। তাহলে আমায় বারণ করো। আমি এক্ষুনি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি। বলো।— লায়াব, বিচ! — বিচ্!

বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জলে ঝ'রে পড়ে। সুশান্ত নিজেও বুঝতে পারে না কোন অন্তর্নিহিত কান্না তার এই বানানো কথার মধ্যেই এমন ফেটে বেরিয়ে পড়ে। বরঞ্চ তার মাথা শান্ত আছে দেখে ভিতরে ভিতরে সে একটা উল্লাস বোধ করে। যখন তার চোখে জল ঝরছে, গলা কাঁপছে, তখন সে শান্ত ও ক্রুর মস্তিকে যুদ্ধের প্রতিটি পদক্ষেপের হিসেব করতে থাকে।

কিন্তু রাণু বিচলিত হয়ে পড়ে। সুশান্তর ভালোবাসার এই গভীরতা দেখে সে মুগ্ধ হয়। কাছে এসে সুশান্তর হাত ধ'রে বলে— 'এই! কী ছেলেমানুষি করছো! এই শোন, — দ্যাখ, আজকে অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

সুশান্ত ইচ্ছে ক'রে নিজের চোখের জল মুছলো না। সেই জলভরা চোখেই রাণুর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললে— 'না। তুমি বলো, আমাকে ভালোবাসো না। বলো, সব মিথ্যে কথা!'

রাণু কখনো কোনো পুরুষমানুষকে কাঁদতে দেখেনি। হঠাৎ দুহাতে সুশান্তর মুখটা টেনে এনে তার মুখের ওপর চুমু খেয়ে বললে— 'বাসি, বাসি, খুব বাসি।'

সুশান্ত কৃতার্থ প্রেমিকের ভঙ্গীতে রাণুর দু'হাত তুলে ধ'রে তাতে পাগলের মতো চুমু খেল। তারপর তার পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে রাণুর পায়ের পাতার ওপর চুমু খেতে লাগলো।

রাণু শশব্যস্তে বাধা দিয়ে সতরঞ্চির ওপর ব'সে প'ড়ে বললে— 'ছি ছি ছি, ও কী করছো! তুমি পাগল না কী বলতো!'

সুশান্ত বলে— 'হ্যাঁ, আমি পাগল। তোমার জন্যে আমি পাগল। রাণু, তুমি আমার কাছে দেবী। তুমি এতো সুন্দর যে তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার কান্না পায়। তুমি জানো না রাণু, তুমি আমার সব। রাণু, তুমি আমার সব।'

শুনতে শুনতে রাণুর চোখ আবার আগেকার মতো গভীর হয়ে ওঠে। আবার সেই সমুদ্রের তলদেশের মতো গভীর।

সুশান্ত বলতে থাকে— 'অথচ তুমি ঘুমিয়ে আছো। আমি তোমায় ডাকছি, তুমি জাগো না কেন? আমি পারবো না জাগাতে? কেন? আমার হাতে সেই সোনার কাঠি নেই ব'লে?'

হঠাৎ পকেট থেকে দশ টাকার কুড়িখানা নোট বার ক'রে ফেল্‌লো। জলধিদাকে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে। সেই নোটগুলো রাণুর পায়ের কাছে আঁজলা ক'রে ছড়িয়ে দিল। বললে— নাও, নাও, সব নাও। সব নিয়ে আমাকে মেরে ফ্যালো। আর সর্বস্ব নাও।'

নাটকে এই অভিনয় করতে হ'লে সুশান্ত পারতো না। কিন্তু আজ কেমন ক'রে যেন তার কণ্ঠে তার দৃষ্টিতে একটা অপ্রকৃতিস্থতা তার এই অভিনয়কে বাস্তব ক'রে তুলছে।

রাণু তাড়াতাড়ি টাকাগুলোকে তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে— 'এ কীসের টাকা!'

— 'আমাদের বিয়ের। তোমার মরবার।'

আবার হাসে সুশান্ত। কী রকম ক্ষ্যাপাটে হাসি। দু'আঙুল দিয়ে রাণুর ঠোঁটটাকে আদর করতে করতে বলে— 'তুমি এতো সুন্দর কেন? উঁ? কেন, কেন, এতো কেন, এতো কেন?'

এই রকম অপ্রকৃতিস্থের মতো রূপের স্তবগান, হাতে করকরে নোট, আর বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা. এই তিনে মিলে রাণুকে সেই স্বল্পালোকিত কামরার মধ্যে একটা বড়ো পোঁট্‌লার ওপর হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলে, তার চোখে কামনার রঙ ছড়িয়ে দিলে।

এবারে সুশান্ত খুব সন্তর্পণে এগোচ্ছে। তার কানে সাপেরা হিস্ হিস্ ক'রে মন্ত্রণা

দিচ্ছে। আর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে যতো তার জয়ের উল্লাস হচ্ছে ততোই তার মন কেন যেন একটা বন্য জন্তুর মতো আর্ত হয়ে উঠছে, ততোই তার সারা শরীর থর থর ক'রে কাঁপছে, সে থামাতে পারছে না।

রাস্তার তেরছা আলোয় ক্রমশ দেখা গেল রাণুর শাড়ির আঁচল খ'সে গেল। তারপর তার জামার বোতাম খুলে গেল। কোমরের কষি আল্‌গা হোল। —অপরূপ সুন্দর একটি দেহ। গভীর নাভি, নিটোল বুক, আর তার ওপরে রাণুর ঠোঁটে স্বল্প মদির হাসি। চুল বিস্রস্ত, চোখ সেই ঘন কালো।

অসহ্য সুন্দর! সুশান্তর গলার মধ্যে একটা বোবাকান্না পাকিয়ে ওঠে। জাগবে রাণু জাগ্‌বে। এলোমেলো চুলের মধ্যে সেই সমুদ্রের তলদেশের হাতছানি। সত্যিকার রাণু, তার রাণু। হঠাৎ মনে হয়, এ কী করছে সে! নতুন থিয়েটার গড়তে এসেছিল, সেখানে শঠ হ'তে হবে! একটা মেয়েকে ভালোবেসেছিল, সেখানে ব্যভিচার করতে হবে!

হঠাৎ সোজা হয়ে বসে সুশান্ত। একাজ সে করবে না। রাণু জাগবে, রাণু জেগেছে।

চোখে পড়ে তার সাপের মন্ত্রের সেই কুড়িখানা নোট। সুশান্তর মনে হয় ঐ সাপকে সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ফেলে দিয়ে তার দেবীর মতো রাণুর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে। সব অন্যায়ের কথা স্বীকার করবে। — তাড়াতাড়ি টাকাগুলো রাণুর হাত থেকে নিয়ে সে ফেলে দিতে চাইলো। কিন্তু নোটের ওপর রাণুর আঙুল শক্ত হয়ে উঠলো। সুশান্ত অব্যক্তভাবে কী একটা ব'লে জোর ক'রে টাকাগুলো টানতে গেল। রাণু উঠে ব'সে দুহাতে আঁকড়ে ধরলো টাকাগুলো। তার আঁচল খ'সে গেছে, জামার বোতাম খোলা, চুল তেমনি বিস্রস্ত, কিন্তু চোখ অন্যরকম। কোথায় সেই সমুদ্রের তলদেশের আলো, কোথায় সেই অন্য-রাণু!

একটা চাপা অব্যক্ত চীৎকার ক'রে নোটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সুশান্ত। কী যেন বলতে গেল, কিন্তু শুধু ঠোঁট নড়লো। আবার সেই একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে। সেটা কি একটা কুৎসিত অশ্লীল গালাগালি? কাকে, রাণুকে? না, নিজেকে? কেবলই বিশ্বাস করতে চায় ব'লে?—তারপরেই সে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেই তো অরণ্য থেকে বেরুনো যায় না। মহলাকক্ষ বন্ধ ক'রে তো চাবিটা কালই পৌঁছে দিতে হবে। টাকাগুলোও যথাস্থানে জমা দিতে হবে। হয় জলধিবাবুর কাছে নয়তো শরৎ দত্তর কাছে। তারপর দলের সঙ্গে সম্পর্ক, রাণুর সঙ্গে সম্পর্ক,— কতো সমস্যাই যে আছে। মানুষের যে পদে-পদেই দায়িত্ব থাকে কি না। তাই আবার ফিরতে লাগলো সুশান্ত। একটা ভগ্ন মানুষের মতো। এসে দ্যাখে মহলাকক্ষের দরজা খোলা রেখেই রাণু চ'লে গেছে। তার তো কোনো দায় নেই। —তাক থেকে তালা-চাবি নিয়ে দরজটা বন্ধ করতে লাগলো সুশান্ত।

অবেলায় ফুলকলি

বুদ্ধদেব গুহ



অসময়ে বৃষ্টি হল, দিনের অসময়ে তো বটেই বছরেরও অসময়ে। হোটেল থেকে বেরোতে দেরিও হয়ে গেছিল। রায়পুর এখন মস্ত শহর। ছত্রিশগড়ের রাজধানী হওয়ার পর থেকে তো রমারমা ক্রমান্বয়েই বাড়ছে। সরকারি অফিস-কাছারিও বেড়েছে। সকালে নারায়ণপুর থেকে বেরিয়ে অনেকখানি পথ গাড়িতে এসে মাঝদুপুরে রায়পুরের হোটেলে ফ্রেশ হবার জন্য এসে উঠেছিল অনি। প্রদীপরা আজ মাঝরাতের গাড়ি ধরে নাগপুরে ফিরে যাবে। নাগপুর থেকে ওরা সদলবলে এসেছিল অনিকে বস্তার ঘুরিয়ে দেখাবে বলে। চারটে রাত আর পাঁচটা দিন যেন ঘোরের মতো কেটে গেল। জগদলপুর, দেবী দন্তেশ্বরীর মন্দির, ইন্দ্রাবতী নদী, তারপর নারায়ণপুর। নারায়ণপুর থেকেই বাইসন-হর্ন মারিয়াদের অবুঝমারে যেতে হয়। অবুঝমারের প্রবেশপথের উপরেই ছোটি ডোংরি নামের একটি বনবাংলোতে সালফি খেয়ে পরে একটি পরিত্যক্ত ঘোটুলে মারিয়দের নাচ দেখা হল। অনেকে রণ-পা-তে চড়ে নাচল। ঘোটুলের সামনেব হাতায়, যার পুরোটাই কাঠের টুকরোর বেড়া দিয়ে ঘেরা হ্যাজাকের আলোতে, বর্ণাঢ্য পোশাকে সাজা নারী-পুরুষের নাচ দেখা হল। ওরা একরকমের লাঠি নিয়ে নাচে যেগুলো নাড়লে-চাড়লে তাদের মধ্যে থেকে বাঁশির মতো আওয়াজ বের হয়। গত রাতেই সেই নাচ দেখেছিল ওরা, এখনও স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। প্রদীপ গাঙ্গুলি, প্রদীপ মৈত্র, তাপস সাহা এবং সঞ্জীব গাঙ্গুলি সস্ত্রীক অনিকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে।

এখানে সকলেই বলে মেইল। এখন অনেক গাড়ি হয়েছে বটে। আগে নাগপুর, রায়পুর, ভিলাই, জববলপুর, বিলাসপুর ইত্যাদির বাঙালিদের কলকাতা যেতে-আসতে বম্বে-হাওড়া আর হাওড়া-বম্বে মেইল ভায়া নাগপুরই ভরসা ছিল। পুরানো অভ্যেস বলে ওরা এখনও মেইলই বলে বম্বে মেলকে।

ভাগ্যিস ট্রেনটা প্রায় আধ ঘন্টা খানেক লেট ছিল, নইলে ট্রেন ফেল করত আজ। ওভারব্রিজ পেরিয়ে প্লাটফর্ম-এ যখন দাঁড়াল তখন বেশ গরম লাগছিল। ওরা সকলে একটা পাখার নীচে দাঁড়াল। ফার্স্ট ক্লাস এ সি কম্পার্টমেন্ট কোথায় দাঁড়াবে তা কুলিকে ওরা জিজ্ঞেস করে নিয়েছিল। অনির ফার্স্ট এ সি-তে চড়ার সামর্থ্য নেই। ওরাই তার জন্যে এই বিলাসিতার বন্দোবস্ত কবেছে। তবে বয়স হওয়াতে চেহারা ভারী হয়ে গেছে। শারীরিক

কষ্ট আর সহ্য করতে পারে না। আরাম করে যে এসেছে এবং আরাম করেই ফিরবে তা জেনে স্বস্তি হয়। ট্রেনে একবার উঠে পড়তে পারলে আর চিন্তা নেই কোনো। ভিড়ের প্লাটফর্মে ধাক্কাধাক্কি করে ওঠাই যা ঝামেলা।

ওরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময়েও সঞ্জীবের ক্যামেরায় বিশ্রাম মিলল না। সে সমানে ছবি তুলে যেতে লাগল। অনি ভাবছিল, যখন যৌবন ছিল, চেহারা সুন্দর ছিল তখন কেউ ছবি তোলেনি আর আজ এই বৃদ্ধর ছবি তোলে কত মানুষ। সাহিত্যিক হয়ে অগণিত মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা পেল, তাদের মধ্যে অধিকাংশই অপরিচিত, তা বলার নয়, ভোলারও নয়। মন ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। সঙ্গে সঞ্জীবের স্ত্রী সুচিত্রাও ছিল। সেই ওদের দলে একমাত্র মহিলা। মেয়েকে এক বোনের কাছে রায়পুরে রেখে দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমাতে বেরিয়েছিল ওরা। বসেও ছিল মুখোমুখি টাটা সুমোর পিছনের সিটে। কী প্রেম! কী প্রেম! ওদের দেখে ভারী ভালো লেগেছে ওই চার-পাঁচদিন অনির।

নিধুবাবুর একটা গান আছে—

'প্রণয় পরম রত্ন যত্ন করে রেখো তারে, বিচ্ছেদ তস্করে আসি যেন কোনোরূপে নাহি হরে। অনেক প্রতিবাদী তার হারালে আর পাওয়া ভার, কখন যে সে হয় কার, কে বা বলিতে পারে।'

সত্যি কথা। প্রেমকে নিরন্তর সেবা-যত্ন, উজ্জ্বল করে না রাখতে পারলে প্রেম অন্য ঢালে গড়িয়ে যায়।

প্লাটফর্মে একটা শোরগোল উঠল। ঘুমন্ত অজগর জেগে উঠলে যেমন হয় তেমন দুলে উঠল জনারণ্যের বুক। ট্রেনটা এসে গেল। প্রদীপরা অনিকে নিয়ে কোচে উঠে কম্পার্টমেন্টে বসিয়ে দিল। রিজার্ভেশন চার্ট থাকে না মাঝ-স্টেশনে। গাড়ি ছাড়লে কণ্ডাক্টর গার্ড যাকে যেখানে যেতে বলবেন তাই যেতে হবে। অনিকে যে কামরাতে ওঠাল প্রদীপেরা সেটা একটা ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্ট। এক ভদ্রলোক বোধহয় দুপুরে ভোদকা বা জিন খেয়ে সব পর্দা-টর্দা টেনে দিয়ে লম্বা ঘুম লাগিয়েছিলেন। রায়পুর স্টেশনের গণ্ডগোল এবং আগন্তুকদের আগমনে তিনি ব্যাজার মুখে উঠে বসে আগন্তুকদের দেখতে লাগলেন। অনি ঢোকার একটু পরেই এক অপরূপ সুন্দরী মহিলা, তাঁর বয়স হবে মাঝ-চল্লিশ, একটি ছাইরঙা সিল্কের শাড়ি পরে এসে উঠলেন। আর তাঁর সঙ্গে একজন স্টেনগানধারী অলিভগ্রিন পোশাক পরা প্রহরী। একজন সুদর্শন ভদ্রলোকও উঠে এসেছিলেন। মহিলার সঙ্গে অনেক মালপত্র, বড়ো বড়ো স্যুটকেস। ভদ্রলোক বাঙালি কণ্ডাক্টর গার্ডকে ধমকে বললেন হিন্দিতে, সেই মহিলাকে দেখিয়ে, আজে বাজে লোকের সঙ্গে ওঁকে এক কম্পার্টমেন্টে দেবেন না, একলাও দেবেন না ক্যুপেতে। ওঁর কোনো অসুবিধে হলে আপনার চাকরি চলে যাবে।

অ্যাটেণ্ড্যান্ট এবং কণ্ডাক্টর গার্ড দুজনেই না স্যার, না স্যার কোনো চিন্তা করবেন না স্যার বলে যেতে লাগলেন দু-হাত জোড়া করে।

ট্রেন প্রায় ছেড়ে দেয়, মিনিট চারেকের স্টপেজ বোধহয়, অনি শুনল, দুই প্রদীপও তাঁদের ডেকে শাসাচ্ছে, বাংলার বড়ো লেখক যাচ্ছেন, বলেই অনির নামটা বলে বললেন, ওঁর যেন কোনো অসুবিধা না হয়। বুঝতেই পারছেন, কলকাতার এমন কোনো কাগজ নেই যারা ওঁর কথা মানে না।

না-না, স্যার, কী বলছেন স্যার। একথাও দু-হাত জোড়া করে বলতে বলতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। ভদ্রমহিলার সঙ্গে এত মাল ছিল করিডর জ্যাম করে রাখা যে ট্রেন ছাড়বার সময়ে অনি গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারল না।

ট্রেন ছেড়ে দিলে কণ্ডাক্টর গার্ড এবং অ্যাটেণ্ড্যান্ট এসে মহিলাকে বললেন, বলুন, মা আপনার জন্য কী করতে পারি।

তারপর, অনিকে দেখিয়ে বললেন আপনাকে এবং ওঁকে একটি ফার-বার্থ কম্পার্টমেন্ট দিয়ে দেব। দেখব যাতে রাতে কোনো প্যাসেঞ্জার আপনাদের কম্পার্টমেন্টে না ওঠে।

ওঁরা মহিলার সঙ্গে হিন্দিতেই কথা বলছিলেন তবে সে হিন্দি যথার্থ হিন্দিভাষীর বোধগম্য হবার মতো নয়।

ভদ্রমহিলা কিছু বলার আগেই ওঁরা বললেন অনিকে দেখিয়ে, ইনোনে বুজুর্গ আদমী হ্যায় অউর বঙ্গাল কী বহত ভারি রাইটার ভি হে। বলেই অনির নামও বলল, অনিকেত সেন। ভদ্রমহিলার মাথাতে ঘোমটা ছিল না কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যা ঘোমটার মতন— আব্রুর দ্যোতক।

উনি চোখ দুটো নীচে নামিয়ে বললেন, ওঁর সঙ্গে এক কামরাতে যেতে আমার আপত্তি নেই।

এতবড়ো বরমাল্য, ইজ্জত, অনি, বহুদিন পায়নি।

সেও চোখ নামিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

ওঁরা বললেন, আপনারা ম্যাডাম ও স্যার 'বি' কম্পার্টমেন্টে চলে যান। আপনাদের সব মালপত্র আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। স্টেনগানধারী গার্ডও তাই বলল। বলল, আপ বে-ফিক্কর যাইয়ে মা।

তখন সেই মহিলা আর অনি গিয়ে 'বি' কম্পার্টমেন্টে উঠল। ট্রেনটা গতি বাড়িয়েছে। দুলছে কামরা। প্রথম দশ মিনিট কেউই কোনো কথা বললেন না। অনিরই একটু অস্বস্তি লাগছিল। সারাটা রাত একজন অপরিচিতা মহিলা শুধু নয়. অত্যন্ত সুন্দরী মহিলার সঙ্গে এক কামরাতে যাবেন এই কথাটা মনের মধ্যে নানারকম উথাল-পাথাল হচ্ছিল। অনির বয়স হয়েছে অনেক কিন্তু ও বুড়ো হয়নি। ওর মধ্যে একটা ছেলেমানুষ চিরদিনের জন্য মৌরসি পাট্টা গেড়েছে সতেরো বছর বয়স থেকে, যে এখনও তেমনই প্রেমিক আছে, তেমনই অবুঝ,

তেমনই ভাবাবেগসম্পন্ন হঠকারী। ও নিজেকে যতখানি ভয় পায়, পৃথিবীর অন্য কোনো কিছুকেই অত ভয় পায় না।

অনি বলল, সঙ্গে স্টেনগানধারী সিকিউরিটি কেন? আপনার স্বামী কি আর্মিতে আছেন?

ইংরেজিতেই বলল।

ভদ্রমহিলা বললেন, পরিষ্কার বাংলাতে, আমাকে চিনতে পারলে না অনিদা? আমি তোমাদের লেক রোডের পাড়ার নমু।

নমু। তুমি।

অনি কি বলবে ভেবে পেল না।

বলল, স্টেনগান? নমু হেসে বলল, আমার শ্বশুরমশাই মন্ত্রী ছিলেন। ছত্তিশগড়ে এম সি সি-র তাণ্ডব চলেছে, তাই সিকিউরিটি। আমি তাঁর বড়ো ছেলের স্ত্রী।

হঠাৎ মধ্যপ্রদেশের রহিস পরিবারের ছেলের, মিনিস্টারের এমন মতি?

আমার শ্বশুরমশায় অচ্যুদানন্দ শর্মা বাংলা সাহিত্য, বাংলা গান, রবীন্দ্রনাথ এবং বাঙালিদের খুবই পছন্দ করেন। তাই ভালো খানদান থেকে, গ্রাজুয়েশন করা সুন্দরী বাঙালি মেয়ে, যদিও তুমি আমাকে পেঁচি বলে ডাকতে, পছন্দ করে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। তবে পারিবারিক কৌলীন্যটাই বেশি করে দেখেছিলেন। তুমি তো জানো মেদিনীপুর জেলাতে আমাদের মস্ত জমিদারি ছিল এবং আমার ঠাকুরদার রাজা পদবিও ছিল। যদিও তুমি যখন আমাকে দেখেছিলে, তখন বাবা লেক রোডে বাড়ি করে কলকাতাতে আসেন। কিন্তু মেদিনীপুরে আমাদের প্রাসাদ এখনও আছে এবং আমার ছোট কাকা সেখানে শুধু থাকেনই না, আমাদের অবস্থাও ফিরিয়েছিলেন। ও পাড়া ছেড়ে আমাদের আলিপুরের বাড়িতে চলে যাবার পর। ছোটোকাকাও খুব পড়াশোনা করতেন। গান-বাজনার শখ ছিল, ভালো শিকারি ছিলেন। তুমি তো দেখোনি ছোটকাকাকে।

দেখব না কেন? তিনি তো আসতেন কলকাতাতে মাঝে মাঝে।

ও, দেখেছিলে?

আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে বিহারের চৌপারনে এক শিকারের ক্যাম্পে দেখা হয়েছিল ছোটোকাকার। তারপর ছোটোকাকার নিমন্ত্রণে তিনি যখন অনন্তপুরে আসেন, তখনই আমাকে দেখে ভারী পছন্দ হয়। ছোটোকাকাকে বলেন, আমার বড়ো ব্যাটা পড়াশোনা শেষ করলেই একে আমি বহুরানি করে নিয়ে যাব। ইজাজৎ দিন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, এই তো আমার কথা। আমি এখন কেমন চোস্ত হিন্দি বলি দেখলে তো। বাড়ির বড়ো 'বহুরানি' হয়ে সকলের মন যুগিয়ে চলি। আমার শ্বশুরমশাইয়ের তো আমাকে না হলে এক মিনিটও চলে না। এমনকি এজন্য শাশুড়ি-মা অনুযোগ পর্যন্ত করেন।

তাই? সত্যি! গল্পের মতো শোনাচ্ছে না, সিনেমার গল্পের মতো।

তারপর বলল, তোমরা সত্যিই জলের মতো। যে পাত্রে তোমাদের ঢালা হয় তোমরা সেরকমই হয়ে যাও। মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তোমাদের অসীম।

এখনকার মেয়েরা অন্যরকম। ওদের যে আর্থিক স্বাধীনতা আছে।

তারপরই বলল, এবারে তোমার কথা বলো। বিয়ে তো করেছ নিশ্চয়ই, ছেলেমেয়ে কী?

তুমি তো জানো নমু, সকলে যা করে কোনোদিনও আমি তা করিনি। করলে, তোমাকে ভালোবেসে ফেলার অপরাধে তোমার বাবা যখন আমাকে খুন করিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিলেন, তখনও আমি তোমাকে না ভালোবেসে পারিনি। রাজা-রাজড়াদের রকমটাই এরকম। তুমি একরকম ছিলে, আমি অন্যরকম। আমরা প্রত্যেক মানুষই একেকরকম। পৃথিবীটা তাই হয়তো এত ইন্টারেস্টিং এখনও। তুমি তোমার বাবারই মতো 'খানদানি' হতে চেয়েছিলে. বড়োলোকের মেয়ে রাজার 'বহুরানি' হতে চেয়েছিলে। তাই হয়েছে। এ সংসারে যে যা চায় তাই হয়তো পায়। যদিও সকলেই যে পায় এমন নয়। তবে অনেকেই পায়। সম্ভবত অধিকাংশ মেয়েই তোমারই মতো। একজন চালচুলোহীন ছেলে, সে যতই মেধাবী ও ভালো হোক না কেন, তোমার যোগ্য সে কোনোদিক দিয়েই ছিল না।

সেটা বাবার কথা। আমার কথা ছিল না, তুমি ভালো করেই জানো তা। কিন্তু এতদিন পরে আবার বাবাকে নিয়ে পড়লে কেন অনিদা! বাবা তো চলে গেছেন আমার বিয়ের পরই।

তাই? মা? মা আছেন?

হ্যাঁ। মায়ের কাছেই তো যাচ্ছি। এখন মা পাকাপাকিভাবে অনন্তপুরেই থাকেন তবে ন-মাসে ছ-মাসে আসেন কলকাতাতেও।

তোমার মা ভারী অন্যরকম ছিলেন। তোমাদের পরিবারের সব আড়ম্বর, ভারী ভারী সেকেলে সোনার গয়নার মধ্যে একটি ছোট্ট কিন্তু উজ্জ্বল হীরের নাকছবির মতো। তুমি তোমার বাবার মতো হয়েছিলে। মায়ের মতো হতে পারোনি।

আমার প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু এখনও পাইনি।

নমিতা বলল।

পুরো কম্পার্টমেন্ট ওর মহার্ঘ্য পারফিউমের গন্ধে ভরে ছিল। কোন্ প্রশ্নের? অনি শুধোল।

ছেলে মেয়ে কী? বউদি কোথাকার মেয়ে?

আমি বিয়ে করিনি? করলে, অনন্তপুর, রাজবাড়ির নমিতাকেই করতাম। যাকে তাকে নিয়ে আমার চলত না। তবে আমি যাকে চেয়েছিলাম তার সঙ্গে আজকের তোমার কতখানি মিল আছে জানি না। মিল থাক আব নাই থাক, আমাব মনে মনে তুমি যেমন ছিলে তেমনই আছ। আমার নমু।

নমিতা গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ নামিয়ে বলল, এত লেখাপড়া শিখেও তুমি সেন্টিমেন্টাল

ফুল রয়ে গেলে কী করে। আজকাল কেউ কি দেবদাস হয়? সে তো পরম মূর্খামি। আমি কি এমন ছিলাম? আমার মধ্যে কী ছিল যা অন্য কোনো মেয়ের মধ্যে ছিল না?

অনি হাসল। বলল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গর কথা বলছ? সে তো সব মেয়েরই কমবেশি সমানই। শাড়ি খুলে তো তোমাকে দেখতে পাইনি এবং কখনো চাইনি। শরীর ছাড়াও একজন মেয়ের অনেক কিছু থাকে, পৃথকীকরণের চিহ্ন হিসেবে।

তা কী? মানে, সে সব কী?

তা বলার নয়। পুরুষেরাই সেটা জানে। তোমাকে বোঝাতে পারব না, আর এত বছর পরে তা বলার দরকারই বা কী? লাভ তো নেই-ই।

তুমি কি কলকাতাতে ফিরছ নাকি অন্য কোথাও নামবে পথে।

আমি খড়্গাপুরে পড়াই আই আই টি-তে। খড়্গাপুরেই নামব।

তাই? আমিও নামব খড়্গাপুরে। তারপর ওখান থেকে গাড়িতে অনন্তপুর।

অনন্তপুরে ক-দিন থাকবে?

দিন পনেরো তো বটেই। কেন? তুমি কি আসবে?

নাঃ।

কেন? না কেন?

আমার অনেক কাজ। ক্লাস তো থাকেই, ক্লাসের পরে পড়াশোনা থাকে, ছেলেমেয়েরা অনেকে বাড়িতে পড়তে আসে। একটি মেয়ে আসে, তার নাম নমিতা। দেখতেও সে প্রায় তোমারই মতো। ওকে দেখে আমার তোমার কথা মনে হয়।

তুমি কি বিষয় পড়াও?

আর্কিটেকচার। স্থাপত্য।

ও।

তারপর বলল, তোমার কপালের পাশে চুলে পাক ধরাতে তুমি আরও সুন্দর হয়েছ। যৌবন যখন ছুটি চায়, তখন এইসব কনসোলেশন প্রাইজ দিয়ে যায় যাবার সময়ে।

অনি বলল, হেসে।

তারপর বলল, তুমিও আরও সুন্দরী হয়েছ, অন্যরকম। বহুরানির আভিজাত্য এসেছে তোমার মধ্যে। আচ্ছা তোমার স্বামী কি তোমার সঙ্গে বাংলাতে কথা বলেন?

না, না, হিন্দিতেই বলেন।

অসুবিধে হয় না তোমার?

প্রথম প্রথম হত, এখন হয় না। তবে আমার শ্বশুরমশাই সুন্দর বাংলা বলেন, রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত।

আমার কোনো বই পড়েছেন উনি?

জানি না, জিজ্ঞেস করব। তুমি যে লেখক হয়েছ তা পশ্চিমবাংলাতে এলে লোকমুখে শুনি। উনিও সে কারণেই পড়েননি হয়তো। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর ইত্যাদি অনেক বই আছে ওঁর কাছে। পরের প্রজন্মের কারোকেই জানেন না বোধহয়।

তুমি আমার কোনো বই পড়েছ?

লজ্জিত হয়ে নমিতা বলল, না এখানে এই রায়পুরে বাংলা বই পাই কোথায়? বাংলা কাগজ হয়তো আসে কিন্তু আমাদের বাড়িতে তো রাখা হয় না। তারপরে লজ্জিত গলাতে বলল, আদত ছুট গ্যয়ী।

হাসল অনি। বলল, তুমি বুঝি এইরকম বাংলা বলো আজকাল।

বুঝতে পারলে তো। তাহলেই হল।

হেসে বলল, নমিতা। তারপরে বলল, তুমি সময় পাও কী করে নিজের চাকরি করে?

সময় আমাদের সকলেরই অনেক। সময় নষ্ট না করলে সময়ের অভাব কী?

তারপরেই বলল, ছেলে-মেয়ে কী?

দুই ছেলে। বড়োটার বয়স বছর বারো হল। ইচ্ছে আছে বাঙালি বউ আনার। আমার শ্বশুরমশাইয়েরও তাই ইচ্ছে। গরিবের ঘরের মোটামুটি লেখাপড়া শেখা, খুবই সুন্দর কোনো মেয়ে যদি তোমার নজরে থাকে তো দেখো না একটু আমার ছেলের জন্যে। এখন থেকেই সগাই করে রাখব। ছেলের বয়স কুড়ি হলেই বিয়ে দিয়ে দেব।

ছেলে রোজগার করার আগে?

বাবার ব্যবসাতে বসবে। রোজগারের জন্য চাকরি তো করতে হবে না। বি.এ.-টা করলেই হল। আমার শ্বশুর আর স্বামীর তো অনেকরকম ব্যবসা— ব্যবসা এখন স্বামীই দেখেন। শ্বশুরমশাই রাজনীতি নিয়েই থাকেন আর পড়াশুনা।

গরিব ঘরের বাঙালি মেয়ে নিয়ে এসে তাকেও সোনার পায়জোর আর চুটকি আর হীরের নথ পরিয়ে পোষা পাখি করবে তো, তোমাকে যেমন করেছেন শ্বশুরমশাই? সেও তো বাংলা ভুলে গিয়ে তোমারই মতো বলবে 'আদত ছুট গ্যয়ী?' এমন কুকর্ম আমার দ্বারা হবে না।

ওরকম করে বলছ কেন? আমি কি সুখী হইনি?

হয়েছ বুঝি? আসলে সুখ কাকে বলে তাই তুমি ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবে থেকে ভুলে গেছ। আরাম এক কথা, আর সুখ আর-এক।

নমিতা একটু দুঃখ পেল।

বলল, তাই বুঝি?

তাই তো।

আর তুমি সুখী হয়েছ?

আমি কী করে সুখী হব? সেই লেক রোডের নমিতাকে যে এখনও ভুলতে পারিনি। সুখী আমার আর এ জীবনে হওয়া হবে না। আমার যে ছাত্রীটির কথা বললাম, যে একেবারে তোমারই মতো, ওর মধ্যেই আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনে দুজনের চোখে চেয়ে। নমিতার গর্বিত ও আদুরে মুখখানির দিকে চেয়ে ভারী ইচ্ছে করছিল অনির যে ওকে একটা চুমু খেয়ে দেয়, অ্যাটেন্ড্যান্ট-এর কামরাতে হাতে স্টেনগান নিয়ে বডিগার্ড থাকলেও। একটি চুমু খেলে নমিতা খুশিই হবে। অথবা কে জানে, ওর মধ্যপ্রদেশীয় শ্বশুরবাড়ির পরিবেশে থেকে থেকে ও হয়তো খুবই রক্ষণশীল হয়ে উঠেছে। থাক। কী দরকার।

এ সি কোচ-এর জানালা দিয়ে রাতের বেলা কিছুই দেখা যায় না। বিরক্তিকর। ট্রেনটা দাঁড়াল কোনো স্টেশনে। দুর্গ হবে হয়তো। একটু পরেই ছেড়ে দিল।

নমিতা চুপ করেই রইল। দুচোখে ভারী অভিমান নিয়ে।

অনির মনে পড়ে গেল আগা শাহির তহলবীর একটি শের—

'লোর, হম বঁতায়ে গুঁচা-ও-গুল সে ফরক কেয়া?
এক বাত হ্যায় কহি-হুয়ি, কে বে-কহি হুয়া।'

মানে, ফুলের এবং ফুলকলির মধ্যে তফাত আমি ভালোই জানি।

ফুল হল বলে ফেলা কথা আর ফুলকলি হল যে-কথা বলা হয়নি, তা।

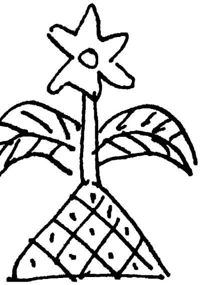
ট্রেনটা দুলে উঠতেই দুজনের চোখ দুজনের চোখে পড়তেই হঠাৎই দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। নিঃশব্দে।

অনি বলল, দরজাটা তো লক করাই আছে। আমার একটু কাছে এস তো নমু।

নমিতা কথা না বলে, নীচে রাখা নরম চামড়ার চটিতে পা গলাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনি দেখল, নমুর সুন্দর ফর্সা সাদা বাঁশপাতি মাছের মতো পায়ের পাতাদুটি অন্যায় করার উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। কে জানে, কতক্ষণ নেবে নমু অনির কাছে আসতে। অনি নমুর পায়ের দিকে চেয়ে বসে রইল। ভাবল, যতক্ষণ লাগে লাগুক। প্রায় কুড়িটা বছর পেরিয়ে আসতে সময় তো একটু লাগবেই।

আগ্নেয়গিরি

ইন্দ্রমিত্র



কিছুতেই সুরূপাকে রাজি করানো যাচ্ছে না।

দ্বিজেন খুব অস্বস্তির মধ্যে আছে। দারুণ জেদী মেয়ে সুরূপা, একবার 'না' বললে তাকে 'হ্যাঁ' বলানো প্রায় অসম্ভব তবু চেষ্টা করে যেতে হবে। এবারের পার্টিতে সুরূপা যদি 'পিঙ্ক এলিফ্যান্ট ক্লাবে' না যায় তাহলে সোসাইটিতে মান বজায় রাখা দায়। এমনিতেই সোসাইটিতে সুরূপার বিশেষ সুনাম নেই, আড়ালে অনেক ভদ্রমহিলাই সুরূপা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। 'পিঙ্ক এলিফ্যান্ট ক্লাব' সুরূপার ভালো লাগে না। ভালো না লাগলে এবার অন্তত যাওয়া দরকার, খুব দরকার। কারণ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার আগরওয়াল নিউইয়র্ক থেকে মাত্র একদিনের জন্য কলকাতায় আসছেন এবং স্বয়ং তিনি সেদিন ওই পার্টিতে উপস্থিত থাকবেন। উচ্চপদস্থ সকলেই সস্ত্রীক উপস্থিত, কিন্তু উচ্চপদস্থ হয়েও দ্বিজেন একা একা পার্টিতে এসেছে ব্যাপারটা— মিস্টার আগরওয়াল সুনজরে নাও দেখতে পারেন। হয়তো এমনও হতে পারে ....

বিচলিত হয়ে দ্বিজেন বলল— সুরূপা, ব্যাপারটার সিরিয়াসনেস তুমি বুঝতে পারছ না। মিস্টার আগরওয়াল অসন্তুষ্ট হলে আমি অতলে তলিয়ে যেতে পারি। সন্তুষ্ট হলে তিনি আমাকে পাহাড়ের চূড়ায় তুলে দিতে পারেন। এবার অন্তত চলো। প্লীজ।

মুখ থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে সুরূপা বলল— তোমার ওই মিস্টার আগরওয়াল যদি মদ খেয়ে আমাকে দেখে ....

দ্বিজেন জিভ কেটে বলল—ছি-ছি, মিস্টার আগরওয়াল সম্পর্কে ওসব প্রশ্নই অবান্তর। তিনি মদ খান বটে, দেদার মদ খান, কিন্তু মহিলা বিষয়ে একেবারে নির্বিকার। সেদিক থেকে তাঁর চরিত্র একেবারে নিষ্কলঙ্ক।

— কথাটা সত্য হলে তোমার আপিসের অনেক মিসেসই তো ভেঙে পড়বেন। আহা, মিস্টার আগরওয়ালকে সন্তুষ্ট করা গেল না, যেমন বেড়ী তেমনি রইল, উদার শরীর নিয়েও স্বামীকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সুনজরে আনা গেল না— তোমার আপিসের অনেক সাহেবের মিসেসের বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে না?

দ্বিজেন সায় দিয়ে বলল— যাবে কি, এখন থেকেই চৌচির হয়ে আছে। আসল খবর তো সকলেই জানেন, আগরওয়াল সাহেব কারও মিসেসের দিকে একবার ফিরেও তাকাবেন না, ভদ্রতার খাতিরে খুব বেশি হলে একবার হ্যান্ডসেক করবেন, ব্যস।

সুরূপা খিলখিল করে হাসল। বলল— তবু যাবেন নিশ্চয়ই সকল মিসেস?

— নিশ্চয়ই।

— অবশ্য আমি বাদে।

দ্বিজেন হাতজোড় করে বলল— প্লীজ। এবার অন্তত চলো। না হলে ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে।

— দেখাক। তবু যাব না। মদ এক-আধটু আমি খাই বটে, জাস্ট টু কীপ কম্পানি, কিন্তু মদ খেয়ে ওদের মতো বেহায়াপনা কিছুতেই করতে পারব না।

দ্বিজেন কাতর গলায় বলল— আমি কি তোমাকে বেহায়াপনা করতে বলেছি।

— না, তা বলোনি। কিন্তু একবার কি হয়েছিল মনে আছে? মদ খেয়ে তোমাদের নাগরাজ সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরতে এসেছিলেন, আমি সেদিন কষে ওর গালে চড় না লাগালে লোকটা হয়তো আমার সর্বনাশ করে ছাড়ত। ও হয়তো ভেবেছিল যে ওখানে সব মিসেসের চরিত্রই একরকম।

— আহা, সেসব তো চুকে বুকে গেছে। নাগরাজ তো তোমার কাছে নিজের ভুল স্বীকার করেছে।

সুরূপা অসহিষ্ণু হয়ে বলল— তা করেছে। কিন্তু সোসাইটির অন্য সব মিসেস তো আড়ালে আমাকে টিটকিরি দেয়, ওরা আমার নাম রেখেছে 'সতী'। সবই আমার কানে আসে।

— আড়ালে কে কী বলে তা নিয়ে মন খারাপ কোরো না। প্লীজ।

সুরূপা ঘাড় নেড়ে বলল— মন আমি খারাপ করি না। ওদের দেখলে আমার ঘেন্না করে। একেকজন যে কতজনের সঙ্গে ঢলাঢলি করে তা আমি নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্বিজেন চুপ করে রইল।

কিন্তু সুরূপা চুপ করে রইল না— ছি-ছি, কী উৎকট কাণ্ড, যত্রতত্র শরীর বিলিয়ে দিচ্ছে, ওদের বিবেক বলে কি কিছু নেই? যতই ওরা 'সতী' বলে আড়ালে আমাকে ঠাট্টা করুক, আমি সতী, আমি সতী, আমি হাজারবার সতী। তুমি ছাড়া আর মাত্র একজন আমার শরীর নিয়ে যা-খুশি-তাই করতে পারবে।

দ্বিজেন এমন কথা সুরূপার মুখে ঘৃণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। চমকে উঠে বলল— কে সেই একজন?

—যম।

দ্বিজেন হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করল—যমের গালে কষে চড় মারবে না?

সুরূপা গাঢ় গলায় বলল— পারলে হয়তো মারতাম। কিন্তু পারব না। ওটুকু আমাকে সয়ে নিতে হবে।

দ্বিজেন মিনতি করে বলল, 'পিঙ্ক এলিফ্যান্ট ক্লাবে'র পার্টিটাও এবারের মতো সয়ে নাও।

— না। সেকথা থাক। নিজের শরীর সম্পর্কে আমি যা বললাম, তুমি কি তা জোর গলায় বলতে পারো?

দ্বিজেন জোর গলায় বলল— আলবত। আজ পর্যন্ত আমি কখনও সজ্ঞানে ....

হাত তুলে সুরূপা বলল— সজ্ঞানে কখনও তোমাকে অসভ্যতা করতে দেখেনি বটে, কিন্তু যখন সজ্ঞানে থাকো না? কয়েক পেগ খাওয়ার পরই তো তুমি ক্লাবের লনে ঝোপের পাশে আধো-অন্ধকারে অজ্ঞান হয়ে থাকো, তখন?

আমতা-আমতা করে দ্বিজেন বলল— তখন কি আমি অন্য কারও মিসেসকে.....

ঘাড় নেড়ে সুরূপা বলল— না, আমার চোখে সেরকম দৃশ্য কখনও পড়েনি! কিন্তু আমি তো সবসময় তোমার সঙ্গে ক্লাবে যাই না। আমার চোখের আড়ালে?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে দ্বিজেন বলল— নাঃ, অজ্ঞান অবস্থায়ও চূড়ান্ত কিছু করলে নির্ঘাৎ আমার মনে থাকত।

সুরূপা মনে-মনে হাসল। হাতেনাতে ধরা পড়েনি বলেই বীরত্ব ফলাচ্ছে। সুরূপা যদি দ্বিজেনকে কোনোদিন উৎকট অবস্থায় হাতেনাতে ধরে ফেলতে পারে তাহলে কিছুতেই রেহাই দেবে না। সুরূপা আলাদা চরিত্রের মেয়ে। শুধু নিজের চরিত্র নয়, স্বামীর চরিত্রের শুচিতার দিকেও তার কড়া নজর। মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়েছ, হও, কিন্তু তা বলে চরিত্রের শুচিতা নষ্ট করবে কেন?

ওদিক দিয়ে অবশ্য দ্বিজেন সম্পর্কে সুরূপার দুশ্চিন্তা খুব সামান্য। কারণ দ্বিজেনকে সে মর্মে-মর্মে চেনে। দ্বিজেন ওদিক থেকে একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা। কিন্তু মাঝে-মাঝে সুরূপার মনে একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, ঘরে যে বরফের মতো ঠাণ্ডা, চোখের আড়ালে বাইরে সে কোথাও আগ্নেয়গিরি হয়ে ওঠে না তো?

বাইরে যদি দ্বিজেন কোথাও আগ্নেয়গিরি হয়ে ওঠে তাহলে সুরূপার চোখ সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না— নিজের চোখের উপর সুরূপার আস্থা আছে।

সুরূপা সত্যি-সত্যি আলাদা চরিত্রের মেয়ে। উদাস গলায় বলল— আচ্ছা। পার্টিফার্টিতে তো তোমাদের দেদার টাকা উড়ে যায়। আমোদ-আহ্লাদে রাশি-রাশি টাকা উড়িয়ে দিচ্ছ, কিন্তু কখনও কি তোমাদের একথা মনে হয় যে দেশে কোটি-কোটি গরীবদুঃখী পড়ে আছে?

দ্বিজেন কিন্তু-কিন্তু হয়ে বলল— আর কারও মনের কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমার কখনও-কখনও সেকথা মনে হয়।

— সে-বিষয়ে কখনও কিছু করেছ?

দ্বিজেন সামান্য হাসল। বলল—আমি কী করব? আমি ইচ্ছা করলেই কি কোটি-কোটি গরীবদুঃখীকে উদ্ধার করতে পারি? আমার ক্ষমতা কতটুকু?

— তোমার ক্ষমতা খুব সামান্য, আমি জানি। —সুরূপা শান্ত গলায় বলল— কোটি-কোটি গরীবদুঃখীকে উদ্ধার করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অন্তত একজন গরীবদুঃখীকেও কি একদিনের জন্য সুখী করতে চেষ্টা করেছে?

এ-কাজ হয়তো করা যেতে পারত। কিন্তু দ্বিজেনকে সবিনয়ে স্বীকার করতে হল যে এ-কাজ করা হয়নি। দ্বিজেন মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল যে অন্তত একজন গরীবদুঃখীকে একদিনের জন্য হলেও, সুখী করার চেষ্টা করবে— আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

কিন্তু আপাতত গরীবদুঃখীর কথা মুলতুবি। কাল বাদে পরশু পার্টি— আপাতত নিজের সমস্যার সমাধান হোক। পার্টিতে আগরওয়াল সাহেরে সুনজরে পড়ার জন্য কোম্পানির সকলেই ব্যস্ত হয়ে আছে, দ্বিজেনও সে-বিষয়ে, বলাই বাহুল্য, উদাসীন হয়ে নেই।

কিভাবে আগরওয়াল সাহেবের সুনজরে পড়া যাবে তা নিয়ে সকলেই গোপনে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, মুশকিল হচ্ছে, স্যুটবুট ছাড়া আর কোনোদিকে আগরওয়াল সাহেবের নজর নেই। কিন্তু কোন স্যুটবুট পরে আগরওয়ালকে মোহিত করা যাবে— এই সমস্যায় কোম্পানির আর পাঁচজনের মতো দ্বিজেনও এখন জর্জরিত।

সুরূপা ভুরু কুঁচকে বলল— এটা একটা সমস্যা হল?

দুচোখ আধবোজা করে দ্বিজেন বলল, তুমি যত সহজ ভাবছ, এটা তত সহজ ব্যাপার নয়।

—খুব সহজ। চলো। আমি তোমার স্যুটবুট পছন্দ করে কিনে আনি, দেখো আর সকলে নির্ঘাত ঘায়েল হয়ে যাবে।

সুরূপা চটপট দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন আর দেরি করার দরকার নেই, কেনাকাটার কাজ এখনই হয়ে যাক।

হাতে ইশারায় সুরূপাকে বসিয়ে দিল দ্বিজেন। বলল— অত সহজ নয়। তুমি হালফ্যাশনের দামী স্যুটবুটে আমাকে সাজিয়ে দেবে, এই তো?

— তাছাড়া আর কি।

দ্বিজেন ঘাড় নেড়ে বলল— সেখানেই হয়েছে মুশকিল। আগরওয়াল সাহেব হালফ্যাশন কিংবা দামের দিকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। ক্যাম্বিসের বুটজুতো আর গেরুয়া খদ্দরের স্যুট পরে বোম্বাইতে রমেশ বচ্চন নামে একজন ছোকরা অফিসার আগরওয়াল সাহেবকে এমন মোহিত করে দিয়েছে যে ছোকরা দশজনকে টপকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুরূপা বলল— তাহলে আর কথা কি। তুমিও ক্যাম্বিসের বুটজুতো আর গেরুয়া খদ্দরের স্যুট পরে যাও।

জিভে দাঁতে চুকবুক করে দ্বিজেন বলল— অত সহজ হলে আর সমস্যা কিসের। ওই খবর শুনে মাদ্রাজে কুপুস্বামী বলে একজন অফিসার ক্যাম্বিসের বুটজতো আর গেরুয়া খদ্দরের স্যুট পরে পার্টিতে এসেছিল, আগরওয়াল সাহেব দেখে রেগে টং, ছোকরাকে মুখের ওপর বলে দিয়েছেন নকলনবিশি আমি দুচোখে দেখতে পারি না। ব্যস, কুপুস্বামীর বারোটা বেজে গেল।

এখন, এতক্ষণে, সুরূপা বুঝতে পারল সমস্যা কত গভীর। এবং স্পষ্ট করে বলল— এ-ব্যাপারে হাজার ভেবেও আমি কিছু করতে পারবো না। খুব জটিল ব্যাপার। খুব জটিল ব্যাপার। তুমি কিছু ভেবেছ?

— ভেবেছি তো বটেই। এবং কাজও করে রেখেছি। খুব গোপনে। তারপর দেখি কপালে কী আছে। আগরওয়াল সাহেব তুষ্ট হবেন না রুষ্ট হবেন কে জানে। এখানে কপালের উপর নির্ভর করতেই হবে।

সুরূপা সায় দিয়ে বলল— অবশ্যই। তা তুমি কীরকম স্যুটবুট করেছ?

— দেখাচ্ছি। কিন্তু খুব গোপনে। কাউকে যেন কিছু বলো না। আর কিছু না থাক, আমার স্যুটবুটে যেন নতুনত্ব থাকে। তুমি পাঁচমিনিট এখানে চুপচাপ বসে থাকো। আমি ওঘর থেকে নতুন স্যুটবুট পরে আসছি। নিজের চোখে দেখে আমাকে তুমি অন্তত একটা মতামত দাও।

পাশের ঘরে চলে গেল দ্বিজেন।

সুরূপা ঘড়ির দিকে নজর রেখেছে। পাঁচ মিনিট নয়, পনের মিনিট পর দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল— আরে, চেনাই যায় না দ্বিজেনকে, আগাগোড়া লাল টকটকে, টাই থেকে বুটের ডগা পর্যন্ত সব টকটকে লাল, বোতামগুলোর রঙ পর্যন্ত একতিল আলাদা নয়। এমন আশ্চর্য স্যুটবুট ইহজন্মে কেউ কি কখনও চোখে দেখেছে? অন্তত সুরূপা দেখেনি।

সুরূপা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল— আগরওয়াল সাহেব পছন্দ করবেন কিনা জানি না, কিন্তু গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এমন টকটকে লাল স্যুটবুট পরে আর কেউ পার্টিতে যাবে না। অবিকল সার্কাসের ক্লাউনের মতো দেখাচ্ছে।

মুখে হাত চাপা দিয়ে সুরূপা হাসতে লাগল। হাসি আর কিছুতেই থামতে চায় না। আর টকটকে লাল স্যুটবুট পরে দ্বিজেন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

পার্টির দিন। সন্ধ্যাবেলা। টকটকে লাল স্যুটবুট পরে দ্বিজেন গম্ভীরমুখে গাড়িতে উঠল। সাহেবের এই অত্যাশ্চর্য স্যুটবুট দেখে ড্রাইভার গণেশ হাজরা পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল। কিন্তু কিছু এসে যায় না তাতে, রাস্তায় গণেশ গাড়ি উল্টে না দিলেই যথেষ্ট।

দোতলার বারান্দা থেকে হাত নেড়ে সুরূপা জানাল— গুড লাক।

গাড়ি চলে গেল। আর সুরূপা একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। দ্বিজেন যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ সুরূপার আর কিছু কবার নেই। দ্বিজেন কতক্ষণে ফিরে আসে কে জানে।

দেড়ঘন্টা যেতে-না-যেতেই ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল সুরূপা।

— আমি দ্বিজেন বলছি।

— বলো।

— বাজি মেরে দিয়েছি। আমার স্যুটবুট দেখে আগরওয়াল সাহেব খুব তুষ্ট হয়েছেন, আমাব পিঠ চাপড়ে বলেছেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেন্ট করতে হলে এইরকম রুচিসম্পন্ন অফিসারই এখন সবচেয়ে বেশি দরকাব।' এখানে বসেই একুশজনকে টপকিয়ে আমাকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

— সুখবর। খুব সুখবব।

— আমাকে ঠেলে দিয়েই আগরওয়াল সাহেব পার্টি থেকে চলে গিয়েছেন। কাল সকালের ফ্লাইটেই কোথায় যেন যাবেন, তাই তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে গেলেন।

— আঃ হা, আরো একটুখানি থাকলে হয়তো আরো কয়েকজনকে টপকিয়ে তোমাকে পাহাড়ের চূড়ায় দিকে আবো একটু ঠেলে দিযে যেতে পারতেন।

— যাকগে, যেতে দাও। এক ধাক্কায় যা হয়েছে তাই যথেষ্ট।

— তা তো বটেই, এক টকটকে লাল স্যুটবুটের ধাক্কায় অনেককে কাত করে দিয়েছ।

— কাত কী বলছ? অনেকের মিডল স্ট্যাম্প উড়িযে দিয়েছি। আর, শোনো, তোমার গ্যারান্টি একেবারে অক্ষবে-অক্ষবে ফলে গিযেছে।

— আমার গ্যারান্টি? কী গ্যাবান্টি?

— বাঃ, মনে নেই তোমার? তুমি গ্যারান্টি দিয়ে বলেছিলে যে এমন টকটকে লাল স্যুটবুট পরে আর কেউ পার্টিতে যাবে না। টকটকে তো দূরের কথা, পার্টির আর কারও স্যুটবুটে লালের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই।

— হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গ্যারান্টির মতো গ্যারান্টি দিয়েছি বটে। আমিই জিতলাম।

— তা তো বটেই। আর, শোনো, এখানে সকলে সাব্যস্ত কবেছে যে আমাব অনারে আজ সারারাত পাটি চলবে।

— সারারাত?

— হুঁ। তা তুমি আর আমার জন্য রাত্তিরে অপেক্ষা করে থেকো না। কাল সকালেই আমি ফিরব।

— আচ্ছা।

রিসিভার নামিয়ে রাখল সুরূপা। আবার বই খুলল। বই ভালো লাগল না বেশিক্ষণ। বই চোখ বুজে শুয়ে রইল। কিন্তু ঘুম আসতে চায না।

আড়াইঘন্টা বাদে সুরূপার মনে হল এতক্ষণে দ্বিজেন নির্ঘাত পার্টির আর সকলের মতো নেশায় টইটম্বুর হয়ে গিয়েছে। আজ তো দ্বিজেনের জয়জয়কার। সুরূপার চোখের আড়ালে আজ যদি দ্বিজেন বরফের মতো ঠাণ্ডা না থাকে? আজ বিজয়ী দ্বিজেনের হাতের কাছে কোনও মিসেস কি এগিয়ে না এসে পারবে?

কিন্তু, হায়, সুরূপার এখন কিছুই করার নেই। এই গভীর রাত্রে সুরূপা কী করতে পারে? কিছু কি করা যায়?

ধাঁ করে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। টেলিফোন তুলে নিল সুরূপা।

— এটা কি পিঙ্ক এলিফ্যান্ট ক্লাব?

— জী।

— দ্বিজেন সান্যাল সাহেবের ড্রাইভার গণেশ হাজরাকে একটু ডেকে দিতে পারো? খুব জরুরী দরকার।

রিসিভার ধরে বসে রইল সুরূপা। অল্পক্ষণের মধ্যেই গণেশ হাজরার সাড়া পাওয়া গেল— আমি গণেশ হাজরা বলছি।

— গণেশ? তুমি গাড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো। সাহেবকে কিছু বলবার দরকার নেই। যা বলবার পরে তাকে আমি বলব। তাড়াতাড়ি এসো।

— আচ্ছা।

রিসিভার নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে নিল সুরূপা। সাজগোজ আর কী, নিজেকে যতদূর সম্ভব পার্টির একজন বেহায়া মিসেস বানিয়ে ফেলল।

গাড়ি এসে গেল। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে সুরূপা বলল— ক্লাবে চলো। তাড়াতাড়ি।

ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চলে এলো পিঙ্ক এলিফ্যান্ট ক্লাবে।

ক্লাবে ঢুকে পড়ল সুরূপা।

সকলেই নেশায় টইটম্বুর হয়ে আছে, সুরূপাকে কেউ নজরের মধ্যে আনল না। ওই টইটম্বুরের মধ্যে কে কার দিকে নজর দেয়। প্রায় প্রত্যেকেরই তো গড়াগড়ির দশা।

কিন্তু কোথায় টকটকে লাল স্যুটবুট? হলঘরে লালের চিহ্নমাত্র নেই। তাহলে নির্ঘাত লনের কোনও ঝোপঝাড়ে পড়ে আছে।

যা ভেবেছে ঠিক তাই। লনের সবচেয়ে অন্ধকার ঝোপের নিচে টানটান হয়ে আছে টকটকে লাল স্যুটবুট। নিজের মুখ অন্ধকারে রেখে সুরূপা তার হাতের নাগালে বসল।

সুরূপার অঙ্ক ভুল হয়নি। টকটকে লাল স্যুটবুট একটানে সুরূপাকে নিজের বুকে তুলে নিল। তারপর লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। সুরূপা নিজেকে ছেড়ে দিল। দ্যাখা যাক কতদূর গড়ায়। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না ততদূর গড়ালো— সুরূপার পক্ষে কল্পনাতীত। সুরূপা ভেবেচিন্তে দেখল একা দ্বিজেন আজ একসঙ্গে এক ডজন দ্বিজেন হয়ে উঠেছে। সুরূপা মনে-মনে ভাবল—

ঘরে দ্বিজেন চিরকাল নির্জীব বরফ, আমাকে অন্যের মিসেস ভেবে আজ ও দুর্জয় আগ্নেয়গিরি হয়েছে।

দ্বিজেনের চরিত্র সুরূপার কাছে এখন জলের মতো স্বচ্ছ।

কিন্তু সুরূপা কোনও কথা বলল না। শাড়িটাকে সামলে ক্লান্ত শরীরে ক্লাবের বাইরে চলে এলো। গাড়িতে উঠে গা এলিয়ে দিয়ে বড়-বড় নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে বলল— গণেশ, বাড়ি চলো। তাড়াতাড়ি।

গাড়ি থেকে বাড়ির সামনে নেমে সুরূপা বলল— গণেশ, ক্লাবে ফিরে যাও। আমি যে ক্লাবে গিয়েছি, সাহেবকে কিছুতেই একথা বলবে না। যা বলবার আমিই বলব। মনে থাকবে তো?

— বাঃ, আপনি বারণ করে দিয়েছেন, আমি কেন বলতে যাব? সাহেবকে আমি কোনো কথাই বলব না।

গাড়ি নিয়ে গণেশ আবার ক্লাবে চলে গেল।

আর সুরূপা মুখটুখ ধুয়ে মুছে শাড়িটাড়ি বদলে ক্লান্ত শরীর ঢেলে দিল বিছানায়। দুর্জয় আগ্নেয়গিরির ধকল সামলানো তো সোজা কথা নয়।

সকালবেলা। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই সুরূপা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

টকটকে লাল স্যুটবুট পরে ঘরে দ্বিজেন। চেয়ারে বসে বুটজুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে দ্বিজেন বলল— কাল রাত্তিরে আমার ডবল আনন্দ হয়েছে। একটা আনন্দের খবর কাল টেলিফোনে জানিয়েছি, আরেকটা আনন্দের খবর এখন মুখোমুখি জানাব।

যেন কিছুই জানে না এমনি নিরীহ গলায় সুরূপা বলল— আরও একটা আনন্দ?

— হ্যাঁ। উঃ, হাঁটু আমার ব্যথা হয়ে গেছে, পায়ের আর জোর নেই। শুনলে তুমি চমকে যাবে।

সুরূপা শান্তমুখে বলল— আগে তো শুনি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে দ্বিজেন বলতে লাগল— আগরওয়াল সাহেবের পিঠ চাপড়ানিতেই আমার এমন নেশা হয়ে গেল যে আমার আর একফোঁটা মদ ছুঁতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ট্রে ভর্তি মদের গেলাস নিয়ে আবদুল আমার কাছে এসে বলল, 'হুজুর, নিন, আজ আপনারই তো আনন্দের দিন।' আমি বললাম, 'কেন আবদুল, তোমার কি আনন্দ হয়নি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবদুল বলল, 'হুজুর, আমি গরীবদুঃখী মানুষ, আমার আবার আনন্দ, আপনাদের আনন্দেই আমার আনন্দ। এখানে ট্রে ভর্তি মদের গেলাস নিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেয়ারগিরি করেই তো কুড়ি বছর কাটিয়ে দিলাম, আমার মতো গরীবদুঃখীর নিজের আর আনন্দ কোথায়?' ধা করে আমার মনে হল, আজ এক রাত্তিরের জন্যেও যদি আবদুলের মতো একজন গরীবদুঃখীকে সুখী করতে পারি তো আমার জীবন সার্থক হয়।

নিশ্বাস বন্ধ করে সুরূপা জিজ্ঞেস করল— তারপর?

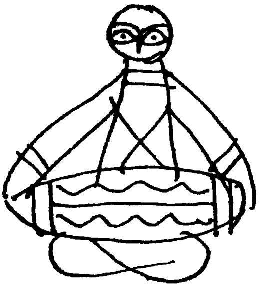
একই রকম গলায় দ্বিজেন বলতে লাগল— পিছনের একটা নির্জন ঘরে আবদুলবে আমি টানতে-টানতে নিয়ে গেলাম। জোর করে আবদুলের বেয়ারার পোশাক পরলাম আমি, আমার টকটকে লাল স্যুটবুট পরালাম আবদুলকে। বললাম, 'আবদুল, আজ রাত্তিরে আমি আবদুল বেয়ারা, তুমি সান্যাল সাহেব।' তারপর আর কি, সারারাত্তির আবদুল হয়ে ট্রে ভর্তি মদের গেলাস নিয়ে আমি বেয়ারাগিরি, সান্যাল সাহেব হয়ে আবদুল কী করেছে কে জানে। সকালবেলা আবার ওই নির্জন ঘরে গিয়ে দুজনে পোশাক বদলাবদলি করেছি। আর আবদুল বলেছে, 'হুজুর, আপনাকে খোলাখুলি বলা যাবে না, হুজুর, কিন্তু আপনার দয়ায় এক রাত্তিরে যা আমোদ-আহ্লাদ করেছি তা আমার মতো গরীবদুঃখীর পক্ষে যথেষ্ট, আমার আর কোনও আপশোস নেই।' আবদুলের কথা শুনে, সুরূপা, আমার মন আনন্দে ভরে গেছে। আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ। কিন্তু সারারাত বেয়ারগিরি করে, উঃ হাঁটু আমার ব্যথা হয়ে গেছে, পায়ে আর জোর নেই।

সব শুনে পাথর হয়ে গেল সুরূপা। পাথরের মতো দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল দ্বিজেনের মুখের দিকে।

দ্বিজেন অবাক হয়ে বলল— তুমি অমনভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছ কেন? আমি আগরওয়াল সাহেবের নামে শপথ করে বলতে পারি যে আমার প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

নিরুপমা

প্রফুল্ল রায়



বাস থেকে নামতেই নিরুপমার চোখে পড়ল, হাওড়া স্টেশনের বাইরের ঘড়িটায় আটটা বেজে পাঁচ। রাজপুরের লাস্ট ডাউন ট্রেনটা আটটা পঁয়ত্রিশে। অর্থাৎ হাতে এখনও আধঘন্টর মতো সময় রয়েছে।

ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে গেলেও এ ট্রেন মিস করবার সম্ভাবনা নেই। তবু তাড়াতাড়ি যাওয়া ভাল। আগে গেলে বসার একটা জায়গা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। নইলে ভিড়ের গাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া প্রায় অবধারিত।

জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতো মানুষ স্টেশনের দিকে ছুটছিল। সেই স্রোতে নিজেকে সঁপে দিল নিরুপমা।

কত বয়েস হবে তার? চল্লিশ বেয়াল্লিশ তো নিশ্চয়ই। এক পলকেই টের পাওয়া যায়, সূর্য পশ্চিমে হেলে গেছে। রোগা দুর্বল শরীর নিরুপমার, কণ্ঠার হাড় গজালের মতন ঠেলে উঠেছে। গায়ের রঙে একসময় চাঁপাফুলের আভা ছিল, এখন জ্বলে জ্বলে তামাটে। চামড়ার তলা থেকে মোটা মোটা নীল শিরা ফুটে বেরিয়েছে। চোখ দু'টি বেশ বড়-বড়, তবে কেমন যেন বিষণ্ণ আর ক্লান্ত। তার তলায় শ্যাওলার মতো কালচে দাগ। কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে রুপোর তার চিকচিক করে। কপালটা মাঠের মতো প্রকাণ্ড। চুল উঠে উঠে ওই হাল হয়েছে। মুখ লম্বাটে, অনেকটা ডিমের আকারের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। একদিন হয়তো সুশ্রী আর ভরাট ছিল, এখন ভাঙচুর চলছে। কিছুদিনের মধ্যে যে সৌন্দর্যটুকু আছে তাও আর অবশিষ্ট থাকবে না।

পরনে সস্তা দামের প্রিন্টেড শাড়ি আর মোটা খেলো ছিটের ব্লাউজ। পায়ে আধ পুরনো চটি। ধুলোয় ঘামে জামাকাপড় চটচটে হয়ে আছে। কপালে গলায় ঘাড়ের খাঁজে ঘামের দানা জমে রয়েছে।

নিরুপমা স্টেট গভর্নমেন্টের একটা অফিসে লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক। রাজপুর থেকে তাকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে হয়। রোজ সকালে সে সেকেণ্ড ট্রেন ধরে কলকাতায় আসে। ফেরে লাস্ট ডাউন গাড়িতে।

এই মুহূর্তে নিরুপমার কাঁধে একটা সাইড-ব্যাগ, দু-হাতে চটের থলে। ব্যাগ-ট্যাগগুলো মালপত্রে ঠাসা। ডাল তেল সাবান মশলা চা চিনি, সারা মাসের যাবতীয় টুকিটাকি বাজার করেছে নিরুপমা।

আজ মাসের চার তারিখ। সব মাসেরই প্রথম দিকে নিরুপমা এইরকম বাজার করে নিয়ে যায়। অন্যদিন এত জিনিস টিনিস থাকে না, তবে একটা ব্যাগ অন্তত থাকেই। বাড়ি ফেরার সময় রোজ মাছ-আনাজ-টানাজ কিনে নিয়ে যায়।

মানুষের স্রোতে ধাক্কা খেতে খেতে নিরুপমা স্টেশনের ভেতর এল। যেদিকে চোখ ফেরানো যায়, শুধু থোকা থোকা জনতা। এইমাত্র দূর পাল্লার দু-তিনটে ট্রেন এসে লেগেছে। যাত্রীরা চেকিং গেটের ভেতর দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসছিল।

ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে যাচ্ছিল নিরুপমা। রাজপুরের ট্রেন ওখান থেকেই ছাড়বে।

হঠাৎ বাঁ পাশের গোলাকার পিলারটার দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নিরুপমা। সুদর্শন চেহারার একটি ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। ছ ফুটের উপর লম্বা, পিঠ টান টান। চুল ব্যাকব্রাশ-করা, নাক-মুখ ধারাল। চওড়া উজ্জ্বল কপাল যেন তাঁর সফলতার প্রতীক। পরনে দামি ট্রাউজার্স আর বুশ-শার্ট। মোটা ফ্রেমের চশমা এবং হাতের পাইপ তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে যেন।

এক পলক দেখেই নিরুপমা চিনতে পারল— অনিমেষ সেন।

অনিমেষের একপাশে দারুণ সুন্দর চেহারার এক মহিলা। আর এক পাশে তিনটি স্বাস্থ্যবান স্মার্ট ছেলেমেয়ে। দেখেই বোঝা যায়, ওরা অনিমেষের স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে। ওঁদের সঙ্গে অনেক মালপত্র— ফাইবারের স্যুটকেশ, হোল্ডঅল, বেতের বাস্কেট, কাচের সোরাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। খুব সম্ভব কোথাও বেড়াতে টেড়াতে যাচ্ছে অনিমেষরা।

ঘুরে ফিরে বার বার অনিমেষকে, তার স্ত্রীকে এবং বাচ্চাগুলোকে দেখতে লাগল নিরুপমা। দেখতে দেখতে তার বেয়াল্লিশ বছরের বয়স্ক পুরনো জীর্ণ হৃৎপিণ্ডে ঝড় বইতে শুরু করল।

নিরুপমা ভাবল, সেদিন আরেকটু দুঃসাহসী হলে অনিমেষের পাশে ওই মহিলাটির বদলে সেই থাকতে পারত। ওই ফুলের মতে বাচ্চাগুলো তারই হতে পারত।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই বিশাল হাওড়া স্টেশন, চারদিকে ছড়ানো রকমারি স্টল, নিওন আলো, থোকা থোকা ভিড়, জনস্রোত— সব কখন মুছে গেল। আর বুকের ভেতর আচমকা কোথায় একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল যেন। তার ভেতর দিয়ে সময়ের উলটো দিকে পা ফেলে ফেলে কুড়ি বছর পেছনে ফিরে গেল নিরুপমা।

অনিমেষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একান্ত আকস্মিকভাবে।

না, অনিমেষের কথা এখন নয়। তার আগে নিজেদের সংসারের ছবি মনে পড়ে যাচ্ছিল নিরুপমার। নিরুপমাদের সংসারে মোট সাতজন লোক। তারা পাঁচ ভাইবোন আর বাবা-মা। ভাইবোনদের ভেতর নিরুপমা বড়।

দেশভাগের ঠিক পরপরই ঢাকা জেলার এক মফঃস্বল শহর থেকে তারা পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছিল। দিনকয়েক শিয়ালদা স্টেশনে কাটাবার পর বাবা রাজপুরে উদ্বাস্তুদের জবরদখল কলোনিতে একখানা ঘর তুলে তাদের নিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে ওখানেই আছে নিরুপমারা।

মাথা গোঁজার একটা জায়গা করবার পর বাবা মার্চেন্ট অফিসে ছোটখাট চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এত সুখ কপালে সইল না। বছরখানেক যেতে না যেতেই কোম্পানি দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিল। বাবা কিন্তু দমেনি। অসীম মনোবল তার, খাটতেও পারত প্রচুর। কিন্তু হঠাৎ পক্ষাঘাতে ডান দিকটা অসাড় হয়ে যাওয়ায় সমস্ত সংসার একেবারে মৃত্যুর হাঁ-য়ের ভেতর ঢুকে যাবার উপক্রম হল।

সেই সময়, সেই অন্ধকার ভয়ঙ্কর দিনে ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড় নিরুপমাকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে ম্যাট্রিকটা পাশ করে এসেছিল সে। ওইটুকুর ভরসাতে এখানে ওখানে দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছিল নিরুপমা। কখনও ইন্টারভিউর ডাক আসত, কখনও আসত না। বছরখানেক এইভাবে কাটাবার পর যখন সে হতাশ আর ক্লান্ত, দুম করে তখন স্টেট গভর্নমেন্টের কেরানিগিরিটা পেয়ে গিয়েছিল।

ভাইবোনরা ছোট ছোট, বাবা শয্যাশায়ী। কে বাজার করে, কে সংসার দ্যাখে! সকালবেলা খেয়েদেয়ে একটা কাপড়ের ব্যাগ কাগজে মুড়ে কলকাতায় চলে যেত নিরুপমা। রাত্তিরে বাজার টাজার করে বাড়ি ফিরত। ছুটির দিনেও তার বিশ্রামের সময় ছিল না। সেই দিনটায় রেশন তুলত, এক সপ্তাহের ময়লা কাপড় টাপড় কাচত, মায়ের কাজে হাতে হাতে সাহায্য করত। এইভাবে, একই রেকর্ড বার বার বাজাবার মতো দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল।

একদিন কলকাতা থেকে লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরছিল নিরুপমা। আষাঢ় মাস-টাস হবে। গাড়িতে উঠবার পরই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। তিন চারটে স্টেশন পেরুবার পর একটা ছোট স্টেশনে আসতেই খবর পাওয়া গিয়েছিল ট্রেন আর যাবে না। সামনে কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

রাজপুরের ওটাই লাস্ট ট্রেন। যাত্রীরা কিছুক্ষণ হই-হল্লা করে নেমে গিয়েছিল। কামরার ভেতর নিরুপমা আর একটি যুবক ছাড়া তখন আর কেউ ছিল না।

নিরুপমার ভীষণ ভয় করছিল। মাঠের মাঝখানে ছোট্ট স্টেশনে তার মতো সুরূপা তরুণী মেয়ের পক্ষে একা একা রাত কাটানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। নিরুপমার হাড়ের ভেতর দিয়ে হিম নামতে শুরু করেছিল যেন। কী করবে, কী করা উচিত, কিছুই ভেবে উঠতে পারছিল না সে। এদিকে সেই যুবকটিও উঠে পড়েছে। দরজা খুলে সে নামতে যাবে, নিরুপমা ডেকে উঠেছিল, 'শুনুন—'

যুবকটি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। আমি খুব বিপদে পড়েছি।'

নিরুপমার মুখে ভয় উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল। কয়েক পলক তার দিকে তাকিয়ে থেকে যুবকটি বলেছিল, 'কী ব্যাপার বলুন তো—'

'আমি রাজপুরে থাকি। ট্রেন তো শুনছি আর যাবে না। সারারাত এখানেই পড়ে থাকবে। এখন আমি যে কী করব—' নিরুপমার গলা কাঁপতে শুরু করেছিল।

একটু ভেবে যুবকটি বলেছিল, 'ভারি মুশকিল হল। আচ্ছা, কাছাকাছি আপনাদের কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় বা জানাশোনা লোক থাকে?'

'না।'

'থাকলে রাতটা সেখানে কাটাতে পারতেন।'

একটু চুপ, তারপর যুবকটি আবার বলেছিল, 'অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকলে একটা কথা বলতে পারি।'

'কী?' স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল নিরুপমা।

'আমাদের বাড়ি পরের স্টেশনের গায়ে। রেল লাইন ধরে মাইল দুয়েক হাঁটতে হবে। বাড়িতে আমার বাবা-মা, দাদা-বৌদি, ভাইবোনেরা আছে। ইচ্ছে করলে রাতটা ওখানে কাটিয়ে যেতে পারেন।'

সম্পূর্ণ অচেনা একটি যুবককে সেদিন বিশ্বাস করতে পারেনি নিরুপমা। বর্ষার রাতে বাড়ি নিয়ে যাবার নাম করে যে তাকে কোথায় নিয়ে তুলবে, কে জানে। অথচ সেই যুবকটিকে ছাড়াও যাচ্ছিল না। আধফোটা ভীরু গলায় নিরুপমা বলেছিল, 'না—'

'আমাদের বাড়িতে আপনার কিন্তু কোনো অসুবিধেই হত না।'

'না, মানে—'

'কী?'

যুবকটি যাতে ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট না হয় সেজন্য মনে মনে ততক্ষণে একটা অজুহাত তৈরি করে নিয়েছিল নিরুপমা। বলেছিল, 'আমি কখনও বাইরে রাত কাটাইনি—'

যুবকটি বলেছিল, 'বিপদে পড়লে কী করা যাবে?'

'না না, সে কথা বলছি না। বাড়ি না ফিরলে সবাই ভীষণ ভাববে! বাবা পক্ষাঘাতের রোগী, আমি যতক্ষণ না ফিরি জেগে বসে থাকে। বুঝতেই পারছেন আজ না ফিরতে পারলে বাবা সারারাত ঘুমোবে না।'

'সেটা অবশ্য ভাববার কথা।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গিয়েছিল যুবকটির, 'একটা কাজ করতে পারবেন?'

'কী?'

'এখান থেকে মাইল তিনেকের মতো হাঁটতে পারলে বাস রাস্তা। ওখান থেকে রাজপুরের বাস পেতে পারেন।'

'কিন্তু আমি তো বাস রাস্তায় যাবার পথ চিনি না—'

'পথ ঠিক নেই, মাঠের ওপর দিয়ে যেতে হবে'।

কী বলতে গিয়ে থেমে গেল নিরুপমা।

একটুক্ষণ ইতস্তত করে যুবক বলল, 'চলুন আপনাকে বাস রাস্তায় দিয়ে আসি।'

যার সঙ্গে তাদের বাড়িতে যেতে সাহস হয়নি, সেই তারই সঙ্গে তিন মাইল মাঠ ভেঙে বাস রাস্তায় যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু সেদিন উপায় ছিল না।

অন্ধকার অল্প অল্প বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছিল। খানিকটা যাবার পর যুবকটি বলেছিল, 'এতক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলছি। অথচ আমরা কেউ কারো নাম জানি না। আমার নাম অনিমেষ—অনিমেষ সেন—'

অগত্যা নিরুপমাকে নাম বলতে হয়েছিল।

অনিমেষ এবার বলেছিল, 'তখন আপনার কথা শুনে মনে হয়েছিল, রোজই লাস্ট ট্রেনে রাজপুরে ফেরেন—'

'বেশির ভাগ দিনই লাস্ট ট্রেনে ফিরি। মাঝে মাঝে অবশ্য এর আগের ট্রেনও ধরি।'

'রোজ কলকাতায় আসেন? কোনো কাজ থাকে?'

'আমি চাকরি করি।'

'ও। কোন অফিসে?'

নিরুপমা তার অফিসের নাম বলেছিল।

অনিমেষ কিছুটা বিস্ময়ের সুরে বলেছিল, 'কী আশ্চর্য, আমার অফিসও তো আপনাদের অফিসের কাছেই।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

'ব্র্যাবোর্ন রোডে। আলাপ হয়ে ভালই হল। এবার থেকে মাঝে মধ্যে অফিসপাড়ায় দেখা হবে।'

'তা হবে—' ভদ্রতার খাতিরে নিরুপমাকে বলতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল সে।

'কতদিন চাকরি করছেন?'

'আড়াই বছরের মতো।'

অন্ধকারে দীর্ঘ পথ পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভয়, আড়ষ্টতা ধীরে ধীরে কেটে গিয়েছিল নিরুপমার। অনিমেষ কথা হয়তো একটু বেশি বলছিল। কিন্তু তার আচরণে ভয় পাবার মতো কিছুই ছিল না। বরং বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য কৃতজ্ঞতাই বোধ করেছিল নিরুপমা।

অনিমেষের কৌতূহলের শেষ নেই। নিরুপমারা রাজপুরে কোথায় থাকে, তাদের সংসারে কে কে আছে, তারা কী করে, ইত্যাদি যাবতীয় খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল। অবশ্য নিজেদের কথাও বলেছিল। তাদের ছোট্ট সংসার। বাবা-মা এবং তারা তিন ভাই। ভাইদের

মধ্যে অনিমেষ সবার ছোট। বাবা ছিলেন ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের অফিসার, বছর কয়েক হল রিটায়ার করেছেন। এক দাদা আই. এ. এস. আরেক দাদা ইঞ্জিনিয়ার। চাকরির খাতিরে বউ-টউ নিয়ে তারা বাইরে বাইরে থাকে। অনিমেষ একটা মার্কেন্টাইল ফার্মে ছোটখাট অফিসার। এখনও বিয়ে করেনি। বাবা-মা'র কাছে থাকে। নিরুপমার মতো তাকেও ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি—

কথায় কথায় তারা বাস রাস্তায় এসে গিয়েছিল। অনিমেষ বলেছিল, 'আপনাকে কি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে ?'

এত রাতে একটি যুবকের সঙ্গে বাড়ি গিয়ে উঠলে অনেক রকম কৈফিয়ত দিতে হবে। কৈফিয়তের সবটুকুই যে মা-বাবার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে, এমন কোনো কথা নেই। নিরুপমা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'না না, আপনাকে কষ্ট করে অতদূর যেতে হবে না। আমি একাই চলে যেতে পারব।'

'কষ্ট আর কি।'

'যথেষ্ট কষ্ট। আমার জন্যে আপনাকে এতটা রাস্তা হাঁটতে হয়েছে। তার ওপর আবার যদি রাজপুর পর্যন্ত যান, আমি কিন্তু খুবই বিব্রত হয়ে পড়ব।'

অনিমেষ হেসে ফেলেছিল, 'ঠিক আছে আপনাকে আর বিব্রত হতে হবে না। আমি রাজপুর যাচ্ছি না।'

একটু পর বাস এসে গিয়েছিল। উঠতে উঠতে নিরুপমা বলেছিল, 'আপনাকে আবার অনেকখানি রাস্তা একা একা যেতে হবে।'

'তা হবে।'

'আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব—'

'দিতে হবে না।'

নিরুপমা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগে বাস ছেড়ে দিয়েছিল।

পরের দিনই যে খুঁজে খুঁজে অনিমেষ তাদের অফিসে এসে হাজির হবে, কে ভাবতে পেরেছিল। অবাক নিরুপমা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি!'

অনিমেষ একমুখ হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমিই।'

'কী ব্যাপার? মানে—'

'কাল রাত্তিরে ঠিকমত পৌঁছুতে পেরেছিলেন কিনা, খোঁজ নিতে এলাম।'

'হ্যাঁ। কোনো অসুবিধে হয়নি। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে কী যে হত!'

সেই আরম্ভ। তারপর থেকে প্রায়ই তাদের অফিসে আসতে লাগল অনিমেষ। ছুটির পরও দেখা হত।

আগে আগে অফিস ছুটি হলে হাওড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করত নিরুপমা। ফুটপাথের বাজার থেকে আনাজ-টানাজ কিনত, মাছ কিনত, দরকারি জিনিস টিনিস কিনত। কিন্তু

অনিমেষের সঙ্গে আলাপ হবার পর দমকা হাওয়ায় সব যেন ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল। অনিমেষ কোনোদিন তাকে নিয়ে চৌরঙ্গির ওদিকে কোনো রেস্তোরায় যেত, কোনোদিন যেত ময়দানে, কোনোদিন গঙ্গার ধারে বসে জলচর জাহাজ দেখত।

প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ করত নিরুপমা। কিন্তু অনিমেষের স্বভাবে এমন এক পবিত্রতা, এমন স্বচ্ছ সারল্য ছিল যে তাকে ফেরানো যেত না। তারপর ধীরে ধীরে এতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল নিরুপমা। ছুটির পর অনিমেষের জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকত।

এতকাল তার জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ছিল— শুধু যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ। সংসারটাকে বাঁচাবার জন্য নিয়ত লড়াই চালিয়ে গেছে সে। আর কোনোদিকে তাকাবার সময় পর্যন্ত ছিল না নিরুপমার। কিন্তু অনিমেষের সঙ্গে আলাপ হবার পর সে যেন নিজের অজান্তে এক সুচারু উৎসবের মাঝখানে চলে যাচ্ছিল।

অবশ্য এক একদিন তাল কাটত। নিরুপমাকে অন্যমনস্ক কিংবা বিষণ্ণ দেখলে অনিমেষ বলত, 'কী ব্যাপার, আজ মুখের চেহারা এরকম কেন?'

নিরুপমা বলত, 'বাবার শরীরটা খুব খারাপ দেখে এসেছি।'

অনিমেষ বলত, 'সাবধানে থাকতে বলো। ঠিক হয়ে যাবে।'

কোনোদিন বা নিরুপমা বলত, 'ছোট ভাইটাকে নিয়ে আর পারছি না, একেবারে বয়ে যাচ্ছে।'

অনিমেষ বলত, 'কেন স্কুলে দাওনি?'

কবে থেকে তারা পরস্পরকে তুমি বলতে শুরু করেছে, নিজেদেরই খেয়াল নেই। নিরুপমা বলত, 'দিয়েছি।'

'তবে?'

'বাড়িতে শাসন করবার লোক নেই। বাবা-মাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। আমি সারাদিন বাড়ি থাকি না, ও যা খুশি করে বেড়াচ্ছে।

অনিমেষ পরামর্শ দিত কিভাবে ভাইটাকে ভাল করা যায়।

কোনোদিন বা নিরুপমা বলত, 'মেজ বোনটাকে নিয়ে ভারি বিপদে পড়েছি।'

'কেন?'

'অন্য জাতের একটা ছেলের সঙ্গে খুব বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে।'

'জাত-টাত দিয়ে আজকাল কেউ মাথা ঘামায় না।'

'আমরাও ঘামাই না।'

'তা হলে বিয়ে দিয়ে দাও।'

'বিয়ে দেবার মতো ছেলে নয়; অতি যাচ্ছে তাই। এক পয়সা রোজগার করে না। বিয়ে দিলে সারা জীবন মেয়েটাকে কাঁদতে হবে।'

অনিমেষ মাথা নাড়ত, 'তা বটে।'

নিরুপমা বলত, 'বোনটাকে নিয়ে কী যে করব।

এইভাবেই বছরখানেক কেটে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন অনিমেষ বলেছিল, 'তুমি তো আশ্চর্য মেয়ে!'

'এতদিনের আলাপ আমাদের। কই, একদিনও তো তোমাদের বাড়ি যেতে বললে না।

অনিমেষ এমনভাবে বলেছিল যে তাকে বাড়ি না নিয়ে গিয়ে পারেনি নিরুপমা। বাবা তার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করেছিল। মা কিন্তু একটা কথাও বলেনি, যতক্ষণ অনিমেষ ছিল তার দিকে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। সে চলে গেলে নিরুপমাকে নিয়ে পড়েছিল মা, 'ছেলেটার সঙ্গে তোর আলাপ হল কী করে?'

নিরুপমা ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়েছিল, 'হয়ে গেল।'

'রোজ দেখা হয়?'

নিরুপমা এবার মিথ্যেই বলেছিল, 'মাঝে মধ্যে হয়।'

পলকহীন অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মা বলছিল, 'যাই কর আর তাই কর, একটা কথা সবসময় মনে রেখো। সমস্ত সংসারটা কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।'

নিরুপমা উত্তর দেয়নি।

যাই হোক তারপর থেকে মা প্রায় অনিমেষের কথা জিজ্ঞেস করত। নিরুপমা কোনো প্রশ্নের জবার দিত, কোনোটার দিত না। আসলে স্পষ্ট করে কিছুই বলত না।

আরো একটা বছর পর অনিমেষ বলেছিল, 'এভাবে আর চলে না, বুঝলে? ভাবছি কাল-পরশু তোমাদের বাড়ি যাব।'

নিরুপমা জানতে চেয়েছিল, 'কেন?'

'তোমার মা-বাবার কাছে গিয়ে তাঁদের মেয়েটিকে চেয়ে নেব।'

এস্রাজে দ্রুত ছড় টানার মতো নিরুপমার বুকের ভেতর দুরন্ত বেগে কী একটা বয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর সে বলেছিল, 'না না, মা-বাবাকে এ সব কথা বলতে হবে না।'

আহত সুরে অনিমেষ বলেছিল, 'কেন বিয়েতে তোমার আপত্তি আছে?'

'আমার নেই। তবে মা-বাবার দিক থেকে আপত্তি উঠবে।'

সেদিন আর কিছু বলেনি অনিমেষ। দিন দুই পর আবার কথাটা তুলেছিল সে,'বাড়িতে যখন আপত্তি তখন আপাতত না জানিয়েই বিয়েটা হয়ে যাক। পরে জানানো যাবে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে আপত্তি থাকলেই বা আর কী হবে?'

অনিমেষ এমনভাবে বলেছিল, যে নিরুপমা না বলতে পারেনি। সেইদিনই তাকে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে বিয়ের নোটিশ দিয়েছিল অনিমেষ। স্থির হয়েছিল, দিন পনের পর বিয়েটা হবে। বিয়ের তারিখে অন্য সব দিনের মতোই অফিসে চলে আসবে

নিরুপমা। সেখান থেকে সাক্ষী টাক্ষী এবং অনিমেষের সঙ্গে সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে চলে যাবে। তারপর যথারীতি লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরবে।

বিয়ের দিন সকাল থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল নিরুপমা। বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে স্নান করেছে, খেয়েছে। তারপর ভাল করে চুলটুল বেঁধে একমাত্র দামি সিল্কের শাড়িটা পরেছে। চোখে কাজলের টান দিয়েছে, মুখে পাউডার বুলিয়েছে।

মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করেছিল। বলেছিল, 'কোনোদিন তো এত সাজিস না। হঠাৎ আজ এত সাজগোজের ঘটা!'

নিরুপমা উত্তর দেয়নি। বেরুবার সময় সে নিজের অজান্তেই যেন মা আর বাবাকে প্রণাম করেছিল।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মা তীক্ষ্ণ গলায় বলেছিল, 'কখনও তো অফিস যাবার সময় প্রণাম করিস না। আজ কী হল? তোর ব্যাপার স্যাপার কিন্তু আমার ভাল লাগছে না।'

মা-বাবাকে না জানিয়ে জীবনের এতবড় একটা ঘটনা ঘটাতে শেষ পর্যন্ত তার মন সায় দিচ্ছিল না। অনেকক্ষণ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিয়ের কথাটা বলে ফেলেছিল সে।

মুহূর্তের জন্য সমস্ত বাড়িটায় শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। ছোট ভাইবোনগুলো নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে ছিল ; তাদের চোখের পাতা পড়ছিল না। হঠাৎ মা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, 'তোর মনে এই ছিল সর্বনাশী, সংসার যে এবার ভেসে যাবে।' কাঁদতে কাঁদতে কপাল চাপড়াচ্ছিল মা।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর মা রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছিল। আর তখন বাবা নিরুপমাকে ডেকে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে বলেছিল, 'তোর মায়ের কথায় কিছু মনে করিস না মা। অভাবে অভাবে ওর মাথার ঠিক নেই।'

নিরুপমা মুখ নিচু করে বসে ছিল।

বাবা আবার বলেছিল, 'যা, সেন্টুকে নিয়ে কলকাতায় চলে যা। বিয়ে টিয়ে হয়ে গেলে অনিমেষকে নিয়ে এখানে চলে আসবি। আমি আশীর্বাদ করছি তোরা সুখী হবি। আর হ্যাঁ, আমার কাছে পাঁচশ টাকা আছে। আমি অক্ষম। কিছুই তো দিতে পারব না তোদের। ওই টাকাটা দিয়ে তোর একটা শাড়ি আর অনিমেষের জন্য একটা ধুতি কিনে নিস—' বালিশের তলা থেকে খানকতক নোট বার করে নিরুপমার হাতে দিয়েছিল বাবা।

আধফোটা গলায় নিরুপমা বলেছিল, 'কিন্তু—'

'আর কিন্তু না মা। তোর বিয়ে দেওয়া ছিল আমার কর্তব্য। তার বদলে তোর রক্ত চুষে খাচ্ছি। কী করব, ভগবান আমাকে মেরে রেখেছে যে, মনে কোনো দুঃখ না রেখে কলকাতায় যা মা।

একরকম জোর করেই ছোট ভাই সেন্টুকে সঙ্গে নিয়ে নিরুপমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাবা। সাইকেল রিকশায় স্টেশনের দিকে যেতে যেতে অনিমেষের মুখটা একেবারেই মনে করতে পারছিল না নিরুপমা। বাবা মা ভাইবোনেরা যেন দল বেঁধে বার বার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল ; আর পাষাণভারের মতো বুকের ভেতরে কিছু একটা অনুভব করছিল সে। মনে হচ্ছিল, পেছন থেকে অস্তিত্বের শিকড় ধরে ওরা টানছে।

হঠাৎ কী এক প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল। চিৎকার করে নিরুপমা রিকশাওলাকে বলেছিল, 'গাড়ি ঘোরাও, আমি বাড়ি যাব।'

বাড়ি ফিরে নিরুপমা অনিমেষকে একটা চিঠি লিখেছিল, 'আমাকে ক্ষমা করো।'

তারপর আহ্নিক গতির নিয়মে দিনের পর দিন কেটেছে। বার্ষিক গতিতে পাক খেয়ে বছরের পর বছর এসেছে। এদিকে নিরুপমার কালো চুলে ধূসর ছোপ পড়তে শুরু করেছে। মসৃণ ত্বক শিথিল হয়ে গেছে। কপালে-গলায় ঘাড়ের কাছে সরু সরু অসংখ্য রেখা ফুটেছে।

এখনও সকালবেলায় খেয়েদেয়ে রাজপুর থেকে সেকেণ্ড ট্রেনে কলকাতায় আসে নিরুপমা, ফেরে সেই লাস্ট ট্রেনে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ লাউড স্পিকারে ঘোষিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। রাত আটটা বেজে পঁয়ত্রিশে রাজপুর লোকাল ছাড়বে।

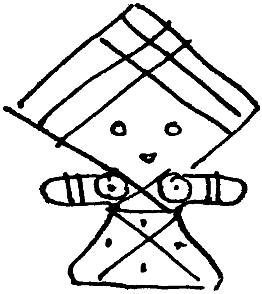
নিরুপমা চমকে উঠল। দেখল, এখনও অনিমেষরা দাঁড়িয়ে আছে। তারপরেই চোখ গেল স্টেশনের ঘড়িটার দিকে। এখন সাড়ে আটটা। আর মাত্র পাঁচটা মিনিট হাতে আছে।

আরেকবার অনিমেষদের দেখে বোঝাই ব্যাগগুলোর ভারে ঈষৎ ঝুঁকে ঝুঁকে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে চলল নিরুপমা।

পরেও হয়তো অনিমেষের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু নিজের গোপন দুঃখময় অতৃপ্ত বাসনার মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হবার আগেই অদৃশ্য ঘোষিকার কণ্ঠস্বরের মতো কোনো অমোঘ নির্দেশ নিরুপমাকে তার অসীম দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেবে!

একটি বিকেলের অপমৃত্যু

শচীন দাশ



একরকম ছুটতে ছুটতেই স্টেশনে এসে ট্রেনটা ধরতে হল। একে এতটা রাস্তা, তার ওপর মাঝামাঝি আসতে না আসতেই টায়ার পাংচার। ট্যাক্সিটা একদম মুখ থুবড়ে পড়ল। শেষে-টায়ার-ঠায়ার পাল্টে পড়িমরি করে যখন স্টেশনে এসে দাঁড়াল ট্রেন ছাড়ার আর বেশি দেরি নেই তখন। তবু শেষ রক্ষা যে টিকিট কেটে অন্তত ট্রেনে উঠতে পেরেছি। নাহলে পরের ট্রেন ধরে কলকাতা পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় রাত বারোটা। কাল আবার দশটায় মিটিং। এরিয়া ম্যানেজারের ঘরে বসে ধীরেসুস্থে রিপোর্টটা দিতে হবে।

জায়গার জন্য এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল ডানদিকে জানলার পাশের সিঙ্গল সিটটা ফাঁকাই পড়ে আছে। ফাঁকা ঠিক নয়, একটা ব্রীফকেস শুধু সেখানে দাঁড় করানো। কী ভেবে ওখানে গিয়েই দাঁড়ালাম। সামনে আসনসোল, যদি এক-আধটু পিঠ ঠেকাবার সুযোগ পেয়ে যাই। না পেলে এই চারটে থেকে রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত দাঁড়ানো যে কী দুসংহ ব্যাপার তা অন্তত বার দুই বুঝতে পেরেছি আমি। যাই হোক ওখানে দাঁড়িয়েই এপাশে-ওপাশে নজর রাখছি সেই সময়েই একটা ঘটনা ঘটল। আমার সামনে ঠিক জানালার ওপরেই একটা মুখ ভেসে উঠল। কাইণ্ডলি, ওই ব্রীফকেসটা দিন না। আমি পাশের কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছি—

জানালা দিয়ে ব্রীফকেসটা গলিয়ে দিয়েই আমি ধপ করে বসে পড়লাম। এরই নাম কপাল। কী জানি এখন একটা লটারির টিকিট কাটলে হয়তো লেগেও যেতে পারত! নাহলে সকাল থেকে যেভাবে গেরো লেগেছে, তার উপর নোয়ামুণ্ডি থেকে ধানবাদে আসতে গিয়ে ট্যাক্সির যা হাল হয়েছিল তাতে তড়িঘড়ি স্টেশনে এসে যে ট্রেনটা ধরতে পারব তা ভাবিনি। এখন পাওয়ার ওপরে আরও খানিকটা প্রাপ্তিযোগ!

সিটে বসে ব্যাগটা খুলে সবে দু'একটা ম্যাগাজিন বের করেছি সেই সময়েই একটা গলা ভেসে এল।

আপনার কাছে কি কোনো বাংলা ম্যাগাজিন আছে?

চোখ তুলে তাকাতে গিয়েই চমকে উঠলাম। আমার ঠিক উল্টোদিকেই এক ভদ্রমহিলা বসে। পরনে দামি একটা লক্ষ্ণৌ চিকনের শাড়ি, ধবধবে সাদা, কিন্তু তাতে অসংখ্য সাদা সুতোরই কাজ, গায়ে সাদা রঙেরই ব্লাউজ, এমনকি গলার ঝুটো মুক্তোর মালাটাও সাদা। কেবল ওরই ভেতরে ঘন রেশমের মতো বাদামি চুলের পাশাপাশি এক টুকটুকে ঠোঁট আর

চোখের তারায় নীল আভা। আশ্চর্য, এতক্ষণ যে কেন চোখ পড়েনি কে জানে! কী জানি হয়তো সিটের জন্য এপাশে ওপাশে খোঁজ করতে গিয়ে আর এদিকে তাকানো হয়নি। অথবা তাড়াহুড়োয় চোখের রিফ্লেক্সই হারিয়ে গিয়েছিল। না হলে কয়েক মিটারের মধ্যে এমন একজন সুন্দরী মহিলা, অথচ সেখানে চোখ যাবে না তা কী করে হয়? বরং স্বাভাবিক নিয়মেই আগে সেখানে চোখ যাবে। আর দেখব না দেখব না করেও মাঝেমধ্যেই সেদিকে তাকাতে হবে। এমন তো হয়েছে কতবার। অথচ আজ কী যে হল চোখেই পড়ল না মহিলাকে!

সে যাই হোক, ম্যাগাজিন যখন চেয়েছে একটা তখন তো দিতেই হয়। কিন্তু কোন কাগজটা দেব। সঙ্গে তো রয়েছে দু'তিনটে ম্যাগাজিন। একটা সিনেমার, একটা সাহিত্যের ও একটা পাঁচমেশালি, নানা ধরনের গালগল্পে ভরা। সাধারণত ট্যুরে বেরোলে দু'তিনটে ম্যাগাজিন কিনে ফেলি আমি। কী করব, যেখানে-সেখানে ঘুরি। হোটেলে থাকলে সময় কাটে, তাছাড়া পথেও বেশ ভালো সঙ্গী। দিব্যি পড়তে পড়তে চলে যাওয়া যায়। আজও তাই কিনেছিলাম। কিন্তু সেগুলোই যে ফিরতি পথে এভাবে অস্বস্তি এনে দেবে তা কে ভেবেছিল!

একটু ইতস্তত করছিলাম, ঠিক তখুনি ও তরফের গলাটা আবার কানে এলে।

অবশ্য যদি অসুবিধে হয় তা হলে থাক। বরং—

না না, অসুবিধের কী। এবারে আমি সচকিত, নিন না যেটা ইচ্ছে। আসলে কোনটা দেব ভাবছিলাম।

হাত বাড়িয়ে দেবার আগেই একটা সুগোল ফর্সা হাত এগিয়ে এল। সে হাতের মণিবন্ধে কালো চামড়ার স্ট্র্যাপে বাধা ঘড়ি একটা, আর ম্যানিকিউর করা কোমল আঙুলগুলোর মাথায় গাঢ় খয়েরি রঙের নেইল পালিশ।

মুগ্ধ হয়েই তাকিয়েছিলাম। মেয়েটি হঠাৎই মুখ তুলে হাসল।

এটাই নিলাম। পড়া হয়ে গেলে না হয় পাল্টাপাল্টি করে নেব—

সিনেমার ম্যাগাজিনটা রেখে বাকি দুটো ফেরত দিয়েই জিজ্ঞেস করল, আপনি কতদূর যাবেন?

খুবই সহজ সরল ভঙ্গী এবং বেশ আলাপি। কলকাতায় যাচ্ছি জেনেই সেই ভঙ্গীটাই আরও আন্তরিক হয়ে উঠল, ও তবে তো ভালোই হল। আমিও কলকাতায় ফিরছি।

কলকাতায় কোথায়?

মেয়েটি কী ভাবল। বলল তারপর, উত্তর কলকাতায়। একবারে সেই বাগবাজারের কাছাকাছি। আপনি?

মনের সেতারে কিসের একটা সুর বেজে উঠল। বললাম, টালা।

মেয়েটি মুহূর্তেই ঝলমলে। চোখ তুলে হাসল, মানে যেখানে সার্কাস হয়? সত্যি আপনাদের কী মজা না!

কেন! মজা কেন? হেসেই পাল্টা জিজ্ঞেস করে বসি, বাড়ির পাশেই সার্কাস আসে বলে?

ঠিক তাই। জানেন, আমি এরকম পাশে থাকলে না রোজই সার্কাসে যেতাম।

সার্কাস বুঝি খুবই ভালো লাগে আপনার?

টেনে টেনে উচ্চারণ করতেই আমি জানালাম কিন্তু এখন আর ওখানে সার্কাস আসে না জানেন তো।

কেন?

কেন কী? জানেন না সার্কাসে এখন পশুর খেলা দেখানো বারণ।

তা হোক না, অন্য খেলা দেখাবে—

হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে তাতে তো টিকিট ভালো বিক্রি হয় না তাই বোধহয় আসে না। তবে এলে চলে আসবেন।

সে কি আর হবে?

কেন! না হওয়ার কী আছে? পা যখন আছে তখন চলে এলেই তো হয়।

না না, হয় না। থাকি পরের কাছে। আমার ইচ্ছে হলেও কি তাদের ইচ্ছের সঙ্গে মেলে নাকি?

মেয়েটি যেন হঠাৎই একটু বিষণ্ণ। ম্যাগাজিনে চোখ রেখে সে বিষণ্ণতাকে ঢাকার চেষ্টা করছে।

বললাম, তা ঠিক, তবু নিজের কেউ হলে না হয় একরকম হয়। কিন্তু......

হ্যাঁ, সে তো বটেই। কিন্তু নিজের বলতে তো.....

সে থামতেই আমি যোগ করলাম, কেন কেউ নেই বুঝি?

মেয়েটি চমকে উঠল। পরে নিঃশব্দে ঘাড় নেড়েই একসময় বলে উঠল, না কে আর রইল! ছেলেবেলায় বাবা মারা গেছে। তারপর মা। আর মায়ের পরেপরেই ওই দূর সম্পর্কের এক মাসির কাছে মানুষ।

বললাম, স্যরি। না জেনে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না।

না না, এতে মনে করার কী আছে! তা ছাড়া আপনিই বা কী করে জানবেন। বলেই আবার আগের মতোই যেন স্বতঃস্ফূর্ত মেয়েটি। যত না ম্যাগাজিন পড়ে তার চেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতেই যেন উৎসাহ বেশি। ফলে মনে মনে আমিও এগোলাম।

এবং এই একটাই দোষ আমার! সুন্দরী মেয়ে দেখলেই হল, চট করে তার প্রেমে পড়ে যাই। সামনে তলিয়ে দেখি না। এভাবে কত যে মেয়েকে ভালোবেসেছি মনে মনে, আবার কত যে মেয়েকে ভুলে গেছি তার হিসেব নেই। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল

না। টের পেলাম আমার ভালো লেগে গেছে। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, আস্তে আস্তে সে মুগ্ধতাই এখন ভালোলাগার গভীরে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জীবনে যদি এমন একজনকে পেতাম।

ভাবলাম। ভেবেই আবার মনে হল, ধুর ছাই—কী সব আবোলতাবোল ভাবছি। রাস্তায় আলাপ, রাস্তাতেই শেষ হয়ে যাবে জানি, আর এমন তো হয়েছে কতবার, ভুলেও আর তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। অবশ্য দু-একজনের মোবাইল নাম্বার যে নেই তা নয়, আছে। এই তো সল্টলেকের মৌমিতা, এন্টালির পারমিতা, পার্কসার্কাসের শ্রাবণী কিংবা ল্যান্সডাউনের দেবযানী, এই চারজনের কেউ কেউ তো মাঝে মাঝে ফোনও করে। কিন্তু আমিই ঠিক যোগযোগ করি না। আসলে ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাই না। নাম্বারগুলো হারিয়ে যেতে যেতে হয়তো একদিন মোবাইল থেকেই উধাও হয়ে যাবে! আবার নতুন কোনো নাম্বার ঢুকবে সেখানে।

কিন্তু এবারের ব্যাপারটা বুঝি একটু আলাদা। দেখেই কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছি। এই প্রথমই মনের মধ্যে যেন কীসের সুর। আর সুরটা যেন ধমনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কীসের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দেহে মনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অবস্থাটা কাউকে বোঝাবার নয়। তবে না বুঝলেও ইতিমধ্যে যে দু-চারজন করে অনেকেই আমাদের দিকে চোরাগোপ্তা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে উল্টোদিকের জানালার পাশের ওই তরুণ।

বইয়ের দিকেই মন দিয়েছিলাম। হঠাৎ যুবতী বলে উঠল, আচ্ছা আপনার নাম কি অসীম?

আমি চমকে উঠলাম।

কী করে জানলেন?

ঠোঁট টিপে চাপা হাসির ভেতরেই উত্তর এল, বলুন তো কী করে জানলাম?

পাল্টা প্রশ্নেই ততক্ষণে অবশ্য আমার মনে পড়ে গেছে। এবং ওটাই তো আমার বাজে অভ্যেস। বই কিনেই ফস করে তাতে নাম লিখে ফেলি। ওই ম্যাগাজিনটাতেও যে লিখেছি তাতে আর সন্দেহ কী!

জানাতেই মেয়েটি হেসে ফেলল. আপনি বুঝি প্রায়ই বই কেনেন?

হ্যাঁ, তা কিনি। তবে আমি ছাড়া আর ও বই কেউ পড়ে না।

কেন আপনার.....

থেমেই গেল মেয়েটি।

কী হল থামলেন কেন? বললাম, বলুন না কী বলছিলেন—

নাহ, কিছু নয়।

ততক্ষণে আমি আবার বলেও ফেলেছি, যাকগে কায়দা করে আমার নামটা তো জেনে নিলেন, কিন্তু আপনার নাম....নামটা কিন্তু এখনো জানা হল না?

যুবতীর মুখ শুকনো। মুখের হাসিও যেন হঠাৎ মিলিয়ে গেল। চোখ ম্যাগাজিনে রেখে ম্যাগাজিনের ছবিই যেন ততক্ষণে আস্তে আস্তে উল্টে যাচ্ছিল সে। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, ছবি সে দেখছিল না। ভাবছিল অন্যকিছু।

কিন্তু কী ভাবছে ওই যুবতী! তবে কি বাড়ি থেকে পালিয়েছে? হতে পারে। আজকাল তো আকছার হচ্ছে এসব। না হলে সামান্য একটা নাম, জিজ্ঞেস করাতে মেয়েটি অমন থমকে গেল কেন? কেনই বা অমন চারপাশে তাকাল। অবশ্য আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। সিজোফ্রেনিয়ার কেসও হতে পারে। আর এসব ক্ষেত্রে এরা তো পালিয়েও যায় মাঝেমাঝে। অথবা হয়তো বা নিছকই ভেতরের কোনো বাধা।

ভাবছিলাম অনেককিছুই। আর ভাবতে ভাবতেই বলে উঠলাম, থাক। অসুবিধে থাকলে বলবেন না।

এ মা, না না— তা কেন! মেয়েটি এবার যেন আড়ষ্ঠ চোখেই তাকাল, অসুবিধের কী আছে। সামান্য তো নাম। আসলে......

চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল— যেন লজ্জা পেয়ে, নামটা আমার তেমন সুন্দর নয়। শেফালি। শেফালি বসু।

হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। এমন সুন্দরী মেয়েকে বুঝি এ নামে মানায় না। এ সুন্দরের আরও অনেক নাম হতে পারতো। অর্পিতা, সঞ্চিতা, সোমদত্তা, সায়নী কী সঞ্চারি। কিন্তু তা না হয়ে.....

কিন্তু জানালাম, কই খারাপ নয় তো। শেফালি তো সুন্দর একটি ফুল। সুন্দরের সঙ্গেই সুন্দরকে মানিয়েছে। ঠিক ভোরের শিশিরের মতোই।

বলছেন। মেয়েটির মুখে হাসি। কিন্তু যেন একটু ম্লান। পড়ন্ত বেলার মতোই বুঝি বিষণ্ণতা সেখানে ছড়ানো। জানালা দিয়ে দৃষ্টিটা ভাসিয়ে দিয়েই জানাল, আমার মায়ের খুব পচ্ছন্দের ছিল নামটা। বাবা অবশ্য ডাকত শেফু বলে। সরস্বতী পুজোর দিন পাড়ার ক্লাবে প্রতিমা এসে না পৌঁছুলে দাদু বলত, প্রতিমার আর দরকার কি, আমার শেফুকে নিয়ে যাও....সত্যি কি যে দিন ছিল....

বলতে বলতে মেয়েটির চোখে স্বপ্নের ছবি।

আমাদের গ্রামের পাশেই ছিল এক নদী। বর্ষায় ছোট্ট ছাগল ছানার মতো ছুটতে ছুটতে রোজ কোথায় যে চলে যেতাম আমরা তার খবরও পেতাম না। তবে বারবারই ছুটে যেতাম নদীর কাছে। যেতে যেতে তার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বও পাতিয়ে ফেলেছিলাম। বিড়বিড় ফিসফিস করে কত যে কথা হত তখন তার সঙ্গে। নদী সে কথার উত্তরও দিত। কলকল ছলছল করে। ফলে আমরাও ছুটতাম তার পাড় ধরে ধরে।

মা কিন্তু একদিন বারণ করল। বলল, ওরে একা যাস না। ভরা বাদলায় কোথায়ও মরে পড়ে থাকবি। কিন্তু আমরা হাসতাম, বলতাম, ধুর আমাদের সঙ্গে নদী আছে না?

বলতে বলতে ছুটতে ছুটতে বালি আর বড়ো পাথরের চাঁইয়ের ওপরে গিয়ে বসে পড়তাম। কিন্তু বসতে না বসতেই শুনতাম বাবার গলা, শেফু-উ.....শেফুরে—

ছুটে এসেই বাবা আমার হাত ধরে আমাকে নিতে যেতেন বাড়ির দিকে। আর যেতে যেতেই ভয় দেখাতেন।

নদীর সঙ্গে থাকা অত ভালো নয় মা। নদী কিন্তু ধরে নিয়ে যাবে একদিন। সত্যি, কী যে দিন ছিল আমাদের!

মেয়েটির চোখে যেন জল। দু-ফোটা মুক্তোর বিন্দুর মতো হয়ে বুঝি চোখের কোলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু লুকিয়ে সে নিল সেই চোখের জল।

আমি বাইরে তাকালাম। বাইরে এখন বড় বড় বাড়ি। লম্বা আকাশ সমান চিমনি। গলগল করে তা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সামনে বোধহয় কোনো স্টেশন। কোন স্টেশন বলুন তো?

চোখ তুলেই জানালাম, দুর্গাপুর। কেন চিনতে পারছেন না?

কী করে পারব! আপনাদের মতো কি রাতদিন ঘুরি?

তবে তো একা বেরোন ঠিক হয়নি আপনার। কাউকে সঙ্গে আনলেন না কেন? ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট। কতরকম ঝামেলা।

বললাম। বলেই আবার ভাবলাম, না এনে অবশ্য ভালোই করেছো। সঙ্গে কেউ থাকলে কি আর তোমার সঙ্গে এমন জমিয়ে বসতে পারতাম। এতক্ষণে শুধু দেখেই হয়তো দুধের স্বাদ ঘোলে মিটত।

ও মা, তাই তো হচ্ছিল। মেয়েটি এবারে খানিকটা সরে এল, যেখানে গিয়েছিলাম তারা তো আমার সঙ্গে একজনকে দেবেই। আমিই জোর করলাম। জানালাম, এখান থেকে উঠব, হাওড়ায় নামব। আবার হাওড়া থেকে উঠব বাড়িতে গিয়ে নামব। এই তো রাস্তা, এর জন্য আবার.....

একবার থেমে বলল, আচ্ছা হাওড়ায় কখন পৌছুবে বলুন তো?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জানালাম, ঠিক ন'টা কুড়ি। অবশ্য লেট যদি না করে। আর যদি লেট করে.....

করলে? মেয়েটির মুখ শুকনো। একবার এপাশে ওপাশে তাকিয়ে বলল, তাহলে? কী হবে! আপনি একটু আমার সঙ্গে যাবেন?

মনে মনে পা বাড়িয়েই ছিলাম। কিন্তু বুঝতে দিলাম না সেটা। একটু থেমেই জানালাম, আমার তো তাড়া আছে....তা ঠিক আছে অসুবিধে হবে না তেমন। আপনাকে পৌঁছে দিয়েই না হয় আমি চলে যাব।

ও তরফের চোখে দেখি কৃতজ্ঞতার ছায়া।

শুধুই কি কৃতজ্ঞতা? মনে মনে ভাবলাম, আমার মতো মেয়েটিও কি প্রেমে পড়েনি? কী জানি! মেয়েদের মন, বোঝা ভারি শক্ত। হয়তো পড়েছে, হয়তো বা পড়েনি!

একজন কফিওয়ালা যাচ্ছিল। ডেকে দাঁড় করিয়ে দুটো কফি নিতেই ও তরফে মৃদু আলোড়ন, আবার এসব কেন?

কিছুই না। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল তাই একটু কফি বললাম।

কফি!

হ্যাঁ, নিন খারাপ লাগবে না। হাত বাড়িয়ে কফিটা নিতে গিয়েই বুঝি একটু স্পর্শ হল তার আঙুলের সঙ্গে। মেয়েটি কি চমকে উঠল?

কফিওয়ালা চলে গিয়েছিল। ফেরার সময় দামের জন্য হাত পাততেই দেখি মেয়েটি তার ব্যাগ খুলেছে। বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই সেই সুরেলা কণ্ঠ।

পান খাবেন?

পান!

আমি চমকে উঠেছি ততক্ষণে।

মনটাও যেন মুহূর্তেই দমে গেল। সে কিরে বাবা, পান খাওয়ারও অভ্যেস আছে নাকি? গেঁয়ো না শহুরে! কিন্তু দাঁতগুলো তো ধবধবে সাদা। একদম মার্বেল পাথরের মতো। নাহ্। এ শালা, সিজোফ্রেনিয়ার কেস না হয়ে যায় না।

হাত ঢুকিয়ে ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা স্টিলের নকশা কাটা বাকসো বের করে আনল মেয়েটি। কিন্তু আমার চোখ কপালে ওঠে আর কী! ভেতরে ছোটছোট অসংখ্য পানের খিলি!

ইস্, কী বিচ্ছিরি নেশা রে বাবা। তাছাড়া, বিয়ে বাড়ি ছাড়া কোনো যুবতীকে পান খেতে দেখেছি বলে মনেও পড়ে না। তাছাড়া মেয়েদের মুখে পান কিংবা সিগারেট আমার সহ্যেরও বাইরে। এ ক্ষেত্রেও তাই। বাকসো খুলে একটা খিলি তুলে আনতেই আমি সাবধানে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

কী হল পচ্ছন্দ হল না?

মাথা নেড়েই হাসলাম, না পান আমি খাই না।

এ মা এটা সেরকম পানই নয়। মঘাই পাতার সঙ্গে বেনারসী মশলা আর বড় এলাচ। বাস। চুন নেই, খয়ের নেই। এর স্বাদই আলাদা। খেয়ে দেখুন না?

নেব না নেব না করেও একটা তুলে নিলাম। আর আশ্চর্য, মুখে দিয়েই টের পেলাম তার অপূর্ব স্বাদ। সমস্ত জিভ থেকে যেন দেহেমনেও ছড়িয়ে পড়ছে।

তা হোক, তবু একজন সুন্দরী যুবতীর মুখে কচর কচর করে পান চিবানো, দৃশ্যত ব্যাপারটা শোভন নয়। তা ছাড়া কেমন অশ্লীলও মনে হয়। চুপ করেই ছিলাম। শেফালি বলল, আগে ছিল না বুঝলেন। কলকাতায় এসে এই বিচ্ছিরি নেশাটা হয়েছে। এত চেষ্টা করছি তবু ছাড়তে পারছি না—

পারবে পারবে। মনে মনে বললাম। সবই পারবে, যদি আমার সঙ্গে তোমার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমিই তোমাকে আমার মনের মতো করে গড়ে নেব। অবশ্য তোমার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে নয়। কেননা আমি মানুষের মৌলিক অধিকারে বিশ্বাস করি।

ভাবতে ভাবতে কতদূর গিয়েছিলাম মনে নেই। খেয়াল হল হঠাৎ ও তরফের প্রশ্নে।

এটা কোন স্টেশন আসছে বলুন তো?

তাকিয়েই দেখি বর্ধমান। ঠিক আটটা পাঁচেই প্ল্যাটফরমে ঢুকছে। তার মানে আর এক ঘন্টা পনের মিনিট। ঠিক মতো চললে ওই সময়ের মধ্যেই হাওড়ায় পৌঁছে যাব।

খানিকটা দাঁড়িয়েই ট্রেন আবার ছুটল। তারপর ঠিক ন'টা কুড়িতেই হাওড়া।

শেফালির মুখে দেখি খুশির আলো। তাকিয়েই বুঝলাম, বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছে এতক্ষণে। ট্রেন পৌঁছুতেই যেন অনেক সহজ। মনের অশ্বস্তি কেটে গেছে নিমেষেই।

বুকের ভেতরটা আমার চিনচিন করে উঠল।

অবশেষে পৌঁছেছি। ট্রেনও এমন কিছু দেরি করেনি। কিন্তু পথের সম্পর্ক এখানেই না শেষ হয়ে যায়। এর আগেও তো হয়েছে কতবার। তবে মন খারাপ হয়নি। তাদের নাম্বার ছিল। নতুন করে শুরু করার সুযোগ একটা ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শুরুটা হয়ে গেছে অথচ ঠিকানাই এখনও জানা হয়নি।

কী জানি, নিজের ওপরেই যেমন নির্ভরতা দেখছি তাতে আমার সাহায্যের কথা হয়তো ভুলেই যাবে এক্ষুণি।

ঢাউস চামড়ার ব্যাগটা নামিয়ে চটপট বেরোবার উদ্যোগ নিচ্ছি, ফর্সা হাতটা আমার দিকে আচমকা এগিয়ে এল।

এই যে ম্যাগাজিনটা। বেশ মানুষ তো আপনি!

কেন?

কেন কী, একসঙ্গে যাবেন বললেন অথচ নিজে নিজেই বেশ রওনা হচ্ছেন!

না না, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলাম, মনের আবেগটা ভেতরে চেপে রেখেই বোকার মতো হেসে ফেললাম, চলুন... আস্তে আস্তে চলুন। যা ভিড়!

কিসে যাবেন?

কিসে আবার! সাধারণত হাওড়া থেকে ফেরার সময় ট্যাক্সিই নিই আমি—

ট্যাক্সিতে আর কথা হল না তেমন। এতক্ষণের সহজ ভাবটাও যেন মিলিয়ে গেছে ও পক্ষের। চোখে মুখে কেমন একটা ক্লান্তি।

কী হল! হঠাৎ এমন চুপচাপ?

আলাপটা ঝালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবার সন্তর্পণে শুরু করি।

সামান্য হেসেই সামান্য উত্তর, দু'তিনদিনের জন্য বেরিয়েছিলাম। বেশ ছিলাম। আবার এসে খাঁচায় ঢুকছি।

খাঁচা!

হুঁ। ঘাড় ফিরিয়ে জানাল, খাঁচাই তো। আমার আর ভালো লাগে না জানেন—

তাই—! তা কিসে এখন ভালো লাগত?

কী বলতে যাচ্ছিল, শুনতে আর পেলাম না। তার আগেই এক জায়গায় বড় একটা বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তড়িঘড়ি বলে উঠল, বাস বাস— বেধে বেধে। এই তো এই এখানেই....

এখানে?

হ্যাঁ, এই এখানেই আমাকে নামিয়ে দিন। ঠিক চলে যেতে পারব। ভেতরের গলিতে আর আপনাকে ঢোকাব না—

ট্যাক্সি দাঁড়াতেই চটপট সে নেমে গেল। হাত তুলে বিদায় জানাতে যাচ্ছিলাম হঠাৎই আবার সামনে এগিয়ে এল।

সত্যি, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব। আপনি আমার জন্য কত কষ্ট করলেন—

কই আর কষ্ট!

আপনাকে আমার চিরদিন মনে থাকবে।

হঠাৎ কী যে হল, নেমে দাঁড়িয়েই বলে ফেললাম, চলুন এতদূর একসঙ্গে এলাম, তা বাড়ির দরজায় না হয় পৌঁছে দিয়ে আসি—

ও মা আপনি যাবেন?

আপনি বললে যাব। বলছেন না তো? আমি ভাবলাম আপনার বোধহয় আপত্তি আছে—

এ মা, আপত্তি করব কেন, ছি ছি। আমি ভাবলাম...

কী ভাবছিল সেকথা শোনার আর সুযোগ হল না। দু'তিনটে বাড়ি পার হয়ে একটা বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছুতেই আমার পায়ের তলায় যেন ভূমিকম্প শুরু হল। একটা হারমোনিয়ামের সুর.... কিছু কথাবার্তা ও খিলখিল হাসির মধ্যেই কানে এল যেন : ও মাসি, মাসি— তোমার বকুল ফিরে এয়েচে গো!

দু-পা তলিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎই কে আমাকে উদ্ধার করল, বাবুজি.... আমার ভাড়াটা—

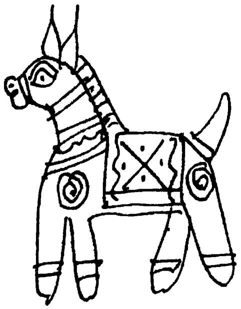
তাকিয়ে দেখি ট্যাক্সিওয়ালা। হাতে খইনি নিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

কিন্তু আমি তখনো বিমূঢ়, বিস্মিত, হাঁ হয়ে তার দিকেই তাকিয়ে আছি।



সৃষ্টি

শেখর আহমেদ



সুরমা সেনগুপ্ত। সুরমা। সুর্মা। কাগজে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে নিজে ভ'রে উঠি, নিজেই অতৃপ্ত হই। আঁকিয়ে নই আমি। হাতের লেখা আমার কোনোকালেই দৃষ্টিনন্দন নয়। পড়াশোনার তালে তালে যতটা হস্তলিপি ঘষা মাজায় মুক্তাক্ষরের অধিকারী হওয়া যায় ততদূর এগোনোর কপাল আমার হয়নি। হাইস্কুলের মাঝপথেই অকস্মাৎ বজ্রপাত। যবনিকাপতন চিরকালের মতো। বাপ তো নয়, সাপ। আমার ভাগ্যের কপালে সাঁৎ করে নিদান-ছোবল চড়িয়ে দিব্যি হাওয়া। তারপর আমার গর্ভধারিণী। 'আমায় অকূলে ভাসিয়ে তুমি কোথায় চলে গেলে গোও'— বলে সেই যে চ্যাঁচানি শুরু করলেন, তা থামল বছর ঘুরতেই— একেবারে তাঁর চরণচিহ্ন ধরে হাঁটা দেওয়ার পর। আর আমি শাখামৃগ পড়ে রইলুম চিৎপাত হয়ে। চন্দ্র সূর্য আকাশ বাতাসের দাক্ষিণ্যে। মহা উল্লাসেই থাকতে হল। বাবা মা যুক্তি করে আমার নামকরণ করেছিলেন মহোল্লাস। চার চারটে মরাপুত্র মাটিতে আছড়ানোর পর আমায় জ্যান্ত টেনে আনা। উল্লাসের ব্যাপার নয়?

ছেলেবেলায় হাতুড়ি আর ভোঁতা দা দিয়ে পাথর নিয়ে কারিকুরি করে যেতাম। ধ্যাবড়া শিবের বাহন কিংবা থ্যাবড়া মুখের আদল। বাবা মাকে ডেকে বলতেন, নাও, কলমপেষা ছাপোষা কেরানির ব্যাটা রামকিংকর হবে। রত্নগর্ভা তুমি। তোমার আর ভাবনা কী? এখন থেকে ঠ্যাং ছড়িয়ে পানের বাটা সাজানো অভ্যেস করো। সুখ নয়, তোমার হবে সুখের ওপর শতরঞ্চি, তার ওপর চেয়ার-বেঞ্চি।

রামকিংকরের নাম সেই প্রথম শোনা। একটু উঁচু ক্লাসেব দাদাদের জিজ্ঞেস করে জানলুম, তিনি এক কিংবদন্তী ভাস্কর। পাথর কুঁদে মূর্তি বানানোকে ভাস্কর্য বলে।

বাবা কোনো কথা সহজ করে বলতেন না। এম. এ. পাশ করেও ছোটখাটো সওদাগিরি অফিসে কেরানির জীবনে প্রাণপাত। জীবন সম্পর্কে হতাশা ছাড়া আর কিছু ছিল না। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। এই ব্যাপারটাই আমাকে জেদি করে তুলেছিল। আমাকে রামকিংকর হতে হবে, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো হতে হবে। ভাস্কর্য নিয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত মাস্টারমশাইদের হাতে চড়-থাপড় খেতেই শুধু বাকি, তখন বাবাই তাঁদের নিষ্কৃতি দিয়ে গেলেন।

রাত একটা। শরতের হিম পড়ছে বাইরে। পুজো আসি আসি। এই ক্যাম্পাসে প্রচুর গাছ। যেন জঙ্গল ঘেরা। দোতলার বেশি বাড়ি করার হুকুম নেই। সবাই উচ্চশিক্ষিত। কেউ

বড়ো চাকুরি, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ ভাস্কর, কেউ কবি। শুধু আমি গণ্ডমূর্খ। আমি ম্যাসিওর। ম্যাসাজ করি। আমি অ-কুলীন এদের মাঝে। আমার সঙ্গে কাষ্ঠহাসির সম্পর্ক ওদের। তবু ওরা কত নগণ্য, কত তুচ্ছ আমার কাছে। আমার যা সম্পদ, তার কানাকড়ি ওদের নেই। আমি রূপকার। সাত এর বি প্লটের জগন্নাথ চৌধুরী নামকরা আর্কিটেক্ট। দু-দুটো গাড়ি। বাড়ির গড়ন, চেয়ার টেবিল, সোফা সেট— সব কিছুতেই তাঁর সুচারু শিল্পী ভাবনা প্রকট। নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ওদের কাজ তো মরা বস্তু নিয়ে। কেটে-কুটে, জোড়াজুড়ি দিয়ে দাঁড় করানো। কই, আমার মতো জীবন্ত শরীর নিয়ে কাবিকুরি করুক তো দেখি। গড়ে তুলুক— ইচ্ছেমতন!

পাশের বাড়িতে চড়া কস্তুরী ধূপ জ্বলছে। নেশা যে কত বিচিত্র হয়। সুহাস কুণ্ডুর নেশা ধূপ জ্বালানো। ইয়া মোটা মোটা কঞ্চির মতো কাঠি। বাঙ্গালোর থেকে ভি পি পি-তে আসে ওঁর জন্য। এক একটা স্টিক জ্বলে অন্তত চার ঘন্টা। গন্ধে ম ম করে বাতাস। ভালো লাগে। পুজো পুজো পবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ে সারাদিন।

পুজোর কথা মনে আসতেই মনে পড়ে গুরুদেবের মুখ। মাত্র একটা দিন। দিন নয়, বাত। আলো আঁধারিতে কপিলমুনির আশ্রমের পশ্চিমে একটা গাছেব নিচে দেখা কিছুক্ষণের সেই দুর্মর স্মৃতি। দু'বছর আগেব কথা। ঘুরতে ঘুরতে হাজির গঙ্গাসাগরে। সংক্রান্তির তখনও দু'দিন বাকি। রাতের অন্ধকাবে সমুদ্রের কাছে উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটছি। গাছের নিচে জমাট বাঁধা অন্ধকার থেকে গম্ভীর ডাক এল, বেটা, ইধার শুন।

এগিযে গেলাম। শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডিত এক সন্ন্যাসী। মাথাভরা কালো চুল, কিন্তু জটা নেই। বক্তাম্বরধারী। দেখলাম তাঁর সামনে ইটের উনুনে পিতলের ছোট হাঁড়ি চাপানো। কয়েক টুকরো শুকনো কাঠ। শুধু আগুন জ্বালানোর প্রতীক্ষা। উনি আদেশের সুরে বললেন, জ্বারা ম্যাচিস দে।

তখন প্যান্টের নিচে, মোজার মধ্যে সিগারেট দেশলাই গুঁজে রাখার চল উঠেছে। আমারও ছিল। কিন্তু মাথায় বদ বুদ্ধি চাপল। সাধু সন্ন্যাসীকে কোনোদিনই পছন্দ করি না। বললাম, ম্যাচিস তো নেহী হ্যায।

সাধু তীক্ষ্ণ চোখে চাইলেন আমার মুখে। দূর থেকে আসা আলোর আভায় জ্বলছে যেন চোখের মণি। হিসহিসিয়ে বললেন, নেহী তো তেরা স্টাকি মে কেয়া হ্যায়?

চমকে উঠলাম। অবশ হয়ে মোজায় হাত বাড়াচ্ছি, সাধু প্রবল অসন্তোষে প্রায় কুকুর তাড়ানোর মতো করে উঠলেন, যা যা ভাগ। কেয়া সোচা হ্যায় তু, তেরা ম্যাচিস বিনা আগ নেহী জ্বলেগা?

বলেই সজ্জিত কাষ্ঠের ওপরে সজোরে দুই তালু দিয়ে ঘর্ষণ করলেন। ফস্ করে আগুন জ্বলে উঠল।

হঠযোগ না কি করে যেন আগুন জ্বালানো যায়, শুনেছিলাম। অভ্যাসের ব্যাপার, দৈব কিছু নয়। জানতাম। তবু নড়তে পারলাম না। মাটিতে যেন পা গেঁথে গেছে। সাধুজি বার বার কুকুর খেদানোর ঢঙে আমায় চলে যেতে বলছেন। রাষ্ট্র ভাষায় উত্তম জাতীয় দু'একটা গালমন্দও কপালে জুটছে। আগুনের আভায় তাঁর মুখ যেন কঠিন নির্মম ঘাতকের মতো। কিন্তু আমি নড়তে পারছি না। আমার ভয় করছে না, চলে যেতেও ইচ্ছে করছে না। আমি বিবশ হয়ে গেছি।

আগুন নিভে এল। সাধুজি অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বললেন, নেহী যায়েগা? তো, হাত মুহ ধো লে। বলে জলের ঘটি দেখিয়ে দিলেন। আমি এগিয়ে গেলাম। মুখে হাতে জল দিয়ে জুতো খুলে বসলাম। সাধুজি দু'টো পাতায় ভাগ করলেন ভোগ— লে, খা লে।

অমৃত। জীবনে এত সুন্দর কিছু খাইনি। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ভেতরে ভেতরে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। হু হু করে বদলে যাচ্ছি। মুখ ধুয়ে বসলাম তাঁর পায়ের কাছে। সাধুজির কণ্ঠে এখন অপার স্নেহ। মুখ শিশুর মতো সরল। বললাম, সাধুজি, ভগওয়ান ক্যায়া হ্যায়? দেখা হ্যায় আপনে?

উনি বলতে শুরু করলেন। পুরাণ থেকে শুরু করে বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহিব, ওল্ড টেস্টামেন্ট ....

আমি শুনছি। কিছু বুঝছি কিনা জানি না, কিন্তু শুনছি। যেমন করে সমঝদার শ্রোতা সুরবাহার শোনে। চেয়ে আছি ওর মুখের দিকে অপলক। যেমন করে নবজাত শিশু তার মায়ের দিকে চেয়ে থাকে।

কথায় কথায় এও বেরিয়ে এল, বন্ধনের জীবনে উনি মাত্র তিনটে এম. এ. একটা পি এইচ ডি, আর একটি ডি লিট-এর মতো সামান্য বিদ্যাচর্চা করেছেন। একথা বলে একটু লজ্জিত হলেন। আমার সব কিছু জেনে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী হতে চাই জীবনে?

আমার অবশ-চেতনা কথা কইল। বললাম, আমি তাঁর চরণে আশ্রয় চাই।

সাধুজি হাসলেন,— বাবা বিশ্বনাথজি কা চরণোঁ মে স্থান লে বেটা। আমি কে? পড়ে আছি গাছতলায়। খাওয়া কবে জোটে, কবে জোটে না।

তাঁর আশ্রয়ে কোন আহার জোটে, সে অমৃতের সন্ধান তো আমি পেয়ে গেছি। আমাকে আর ভোলানো সহজ নয়। আমি নাছোড়বান্দা।

উনি বোঝালেন। দুনিয়ার পিয়াস না মেটা পর্যন্ত, দুনিয়াদারির বাইরে আর এক পিয়াস আপনি না জেগে ওঠা পর্যন্ত সে পথ তার জন্যে নয়। তাতে একূল ওকূল দু-কূল নষ্ট হয়। আমার ভাস্কর হওয়ার অতৃপ্ত স্বপ্নের কথা শুনে একটু চুপ করে রইলেন। কী যেন ভাবলেন সামান্য সময় তদগতভাবে। তারপর বলে উঠলেন, কেয়া, মূর্তি বানায়গা? পাত্থরো কা? ছোড় দে। ইয়ে লে।

ঝোলার মধ্যে হাত গলিয়ে বের করে আনলেন এক জোড়া দস্তানা, —জিন্দা ইনসান কা শরীর বানায়গা তু। য্যায়সা তেরি মর্জি। পহন লে। যা, ঘর যা।

পশম পশম। ভেতরটা উষ্ণ। লোমশ প্রাণীর শরীরের মতো। হাতে গলাতেই সারা শরীরে শিহরণ। আনমনা হয়ে ফিরে গেলাম অস্থায়ী ধর্মশালায়। নিশি-জাগা ঘুম ঘোরে তিনি, চোখ মেলতেই তিনি। ঘুম ভেঙে অনেক বেলায় ছুটে গেলাম গাছতলায়। নেই চতুর্দিকে গিজ গিজ করছে অসংখ্য মানুষ। কাতারে কাতারে এসে জড়ো হচ্ছে। সাধুজি নেই। সারাদিন হন্যে হয়ে ঘুরলাম। স্নান নেই, আহার নেই। খুঁজে বেড়াচ্ছি রাতের অন্ধকারেও। নেই। দস্তানা দুটো বুকে জড়িয়ে রাতের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলাম। সাগরের ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউ, সমুদ্রের বাতাস হা হা করে কাঁদছে।

আমি ম্যাসিওর। ফিজিওথেরাপিস্ট। কিংবা অন্য কিছু। শরীর আমার হাতে কথা বলে। দু বছরের মধ্যে আমার বাড়ি হয়েছে। ঋণ কিছু করতে হয়েছে বটে। শোধও করে দেব। গাড়িও কিনব একদিন। আমি কেন অন্যের তাচ্ছিল্যকে গুরুত্ব দেব? আমার মতো অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা ওদের আছে?

এত রাতে সাইরেন বাজিয়ে কোথায় পুলিশের গাড়ি ছুটে যায়। আমিও নড়ে উঠি। ছি-ছি, এ কী করছি? গুরুজি বলেছিলেন, অহঙ্কার গ্রাস করলে দস্তানার গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। গুরুজির কোনো ছবি নেই। এক মানসপটেই যতটুকু ধরে রাখতে পেরেছি। যখন খুব মন কেমন করে, দস্তানা দুটোকে বুকে জড়িয়ে তাঁর ধ্যান করি। তাঁকে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি তখন। উঠে গিয়ে দস্তানা দুটো বের করি। চেপে ধরি বুকে। তখন মিষ্টি সুরে টেলিফোন বাজে। জানি কার টেলিফোন। নিয়মিত রুটিন হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর থেকেই প্রতীক্ষা শুরু হয়। এক হাতে বুকে চেপে রাখা দস্তানা, অন্য হাতে রিসিভার,— হ্যালো?

— মহল! এখনও ঘুমোওনি?

কী সুন্দর সংক্ষেপ করে নিয়েছে আমার নামটা। কী মিষ্টি। যা বিতিকিচ্ছিরি নাম রেখেছিলেন বাবা।

— না সুরমা। তুমি কী করছ?

— আমি? আমি তোমায় ফোন করছি। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। অদ্ভুত সুরেলা ঝঙ্কার ওর হাসিতে। যতবার শুনি, ততবারই চমৎকৃত হই। আসলে স্বরটাই ওর অসাধারণ। যেদিন প্রথম টেলিফোনে ও আমাকে কল দিয়েছিল, সেদিনই মুগ্ধ হয়েছি। আজও ঘোর কাটেনি। এত মধুর কণ্ঠস্বর কারও আর আছে কিনা জানি না। হয়তো বা পাখিরাও লজ্জা পায়।

আর এত কদর্য রূপ কারও হয়, তাও জানতাম না। ঠিকানা মিলিয়ে যখন বাড়িতে হাজির হয়েছি, দারোয়ান ড্রয়িংরুমে বসিয়ে মালকিনকে ডাকতে গেছে, বসা ঘরের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত থেকেছি। কিন্তু শিউরে উঠেছি তাঁর আবির্ভাবে। থ্যাবড়া নাক, কুঁৎকুতে দুই চোখ,

চ্যাটালো বুক, পুরুষের মতো গোলগাল কোমর, পুরু ঠোঁট। শুধু রংটুকু বাদ দিলে সবই কদাকার। কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে এ সব তো আর চাপা পড়ে না উৎকণ্ঠা ছেড়ে তখন চলে আসার জন্য অস্থিরতায় ভুগছি। আমি পেশাদার শরীর-শিল্পী। রূপগুণের বিচার করা আমার উচিত নয়। কিন্তু এখানে যে এক কল্পনা নিয়ে এসেছিলাম। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের তীব্র বিরোধ সইতে পারছি না। তাঁর প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সুন্দর করে দিতে হবে। কেউ নেই, শুধু অগাধ ঐশ্বর্য ছাড়া।

— অসম্ভব। বলে উঠে চলে আসছিলাম। উনি পথরোধ করে দাঁড়ালেন। কেঁদে ফেললেন। এত ঐশ্বর্যের টানেও কোনো যোগ্য পুরুষ তাঁর দিকে ফিরে তাকায় না। আমিও যদি মুখ ফিরিয়ে নিই—

হাসি পেল। এত থেকেও মানুষ কত কাঙাল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল পেশাদারি মন। এক ধরনের চ্যালেঞ্জও। বললাম, বেশ। পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে।

— দেব

— দু'মাস সময় লাগবে।

— রাজি।

— একটিই শর্ত। এই দু'মাস আপনি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পারবেন না।

— তাই হবে।

শুরু হয়ে গেল আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। গুরুজির মুখ স্মরণ করে তাঁর দানে দু'হাত ঢেকে স্পর্শ করলাম সুরমা সেনগুপ্তর শরীর। প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে তুলি টিকোলো নাক। দু'চোখের কোণ টেনে আয়ত করে তুলি। একটু একটু করে জেগে ওঠে দ্বীপ।

করতালুর চাপে একটু একটু করে বসে যায় মাংসল উদর। কঠিন নিষ্পেষণে কোমর কৃশ হয় সিংহিনীর মতো। ধীরে অতি ধীরে। দু'হাতের অঞ্জলিতে একটু একটু জেগে ওঠে দুটি অনাবৃত বুক, শতদলের মতো। ও চেয়ে থাকে নিষ্পলক। ওর নিশ্বাস দ্রুততর হয়। শরীরে পুরুষ স্পর্শের শিহরণ ছড়ায়, বুঝতে পারি। ও মুগ্ধ হয়ে আমাকে দেখে। আমার দস্তনার যাদু। আমি ওকে দেখি না, দেখি আমার সৃষ্টিকে।

তারপর কবে যেন শুরু হল ওর ফোন করা। শুরু হল 'তুমি'। শুরু হল ওর ফোনের জন্য আমার প্রতীক্ষা। আর স্বপ্ন দেখা। আমি নতুন কোনো কাজ হাতে নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কাজের সময়ে আমি শিল্পী। কিন্তু রাতজাগা শীতল এই প্রহরে কে আমি? আমি ধ্যানী। ধ্যান করি তিলোত্তমার, আমার নিজের হাতে গড়া তিল তিল করে।

— মহুলা, কথা বলছ না কেন?

কানে সুর—তরঙ্গ নয়, সু, আমার সুর্মা, আমার সৃষ্টি। এ নাম এখনও ওকে জানাইনি। কাল বলব, কাল। আমার সব কথাই যে কালকের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

— ঘুমোও সু, ঘুমিয়ে পড়ো।

— আমার যে ঘুম আসছে না। এখনই নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

— না, আর তো মাত্র কয়েক ঘন্টা। কালই তো শেষ টাচ।

— তবে, আমার সঙ্গে গল্প করো।

— না, অবুঝ হয়ো না। জান তো, আয়না দেখার পর আর আমি হাত দেব না। শেষটুকু ভেবে নিতে দাও। সব খুঁটিনাটি। ঘুমোও, ঘুমিয়ে পড়ো।

— আচ্ছা, তুমিও বেশি জাগবে না, কথা দাও। ঘুমিয়ে পড়বে, উঁ?

— হুঁ

ফোন ছেড়ে দেয় সুরমা। আমি কাঁপছি। আমি থরথর করে কাঁপছি। প্রতিমার চক্ষুদানের আগে পটুয়া যেমন অস্থির হয়, তেমন দশা আমার। বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল— সু, সুরমা, সুর্মা.....

।। ২।।

অনেকদিন পর এঘরে ঢুকে পুরোনো গন্ধটাকে খুঁজে পাচ্ছি। অনেকদিন পর এঘরে এলাম, বলা ভুল। মাঝে মধ্যেই এসেছি সামান্য সময়ের জন্য। কিন্তু এমন করে আসিনি, যেমন বাইরে থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরতাম এই ঘরের টানে!

কাঞ্ছা আর দৌলতরাম ছাড়া সকলকে জবাব দেওয়া হয়েছিল। ওরা বাড়িটাকে ঝকঝকেই রেখেছে বলতে হবে। ঘরের দরজা জানলা তকতক করছে। আঙুল ঘষে এক বিন্দু ধুলোও আবিষ্কার করা যাবে না। ফুলদানিতে ফুল। খাটে ফিকে নীল পাতলা চাদর। সম্পদ বোম্বে থেকে ফিরবে সাতদিন পর। ডিভোর্সের কাগজপত্র তার পরে তৈরি করলেই চলবে। চলে আসার আগে ফোনে সে কথা জানিয়ে দিয়ে এসেছি। সত্যি বলতে কি সম্পদ একটুও আশ্চর্য হয়নি। একবারও বিস্ময় প্রকাশ করেনি। শুনে শুধু হালকা চালে বলেছে, ওয়েল। তাই হবে।

আমি জানি কেন ও বোম্বে গেছে। ওর নতুন পার্টনার মিস সহেলির টানে। সহেলি টু টাইম ডিভোর্সি। তাতে কী? এখন ওর সহেলিকে চাই। সহেলির রূপ আছে এবং বিজনেসও। বিজনেস। বিজনেস ছাড়া ও আর কিছু বোঝে না। বুঝতে আমার সময় লেগেছে অনেক। কত বোকা ছিলাম। ভাগ্যিস, আমার প্রপার্টিতে হাত বসানোর আগেই তা টের পেয়েছি। ব্যবসার প্রয়োজনে পার্টিতে আমার হাজিরা, পার্টির খাতিরে আমার আরও ১ পেগ ড্রিংক বাড়ানো, নতুন কন্ট্রাক্টের জন্য মত্ত বিশিষ্ট অতিথিকে গায়ের ওপরে আশ্রয় দিয়ে আমারই সী-অফ্ করতে যাওয়া— এ সবই তো ওর কাছে স্বাভাবিক। এবং আরও বড়ো কন্ট্রাক্টের প্রয়োজনে আরও বড়ো শিল্পপতির অঙ্কশায়িনী হওয়া। আজ সিংহানিয়া, কাল বাজাজ, পরশু দিলওয়াস্তা। কেন নয়? ঠিকই তো, কেন নয়।

ধীরে ধীরে এ পর্যন্ত এগোতে হয়েছে আমাকে। ওর বাক্ চাতুর্য অসাধারণ। ওর অত্যাধুনিক যুক্তির কাছে বারবার আমাকে হার মানতে হয়েছে। মানুষ বিজনেস করে ক্যাপিটাল নিয়ে। ক্যাপিটাল শুধু টাকা নয়। যার যেটা মূলধন— টাকা, ট্যালেন্ট রূপ-যৌবন, কৌশল। শরীরও তো সম্পদ। তবে কেন তা কাজে লাগবে না?

অন্তর রি রি করেছে। কিন্তু ওর চাপাচাপি, ওর অমোঘ যুক্তি। অশান্তি এড়াতে এক পা এক পা করে এগোতে হয়েছে আমাকে নরকের দিকে। আমার এই রূপ, এ আমার অভিশাপ। নিজেকে অভিসম্পাত করেছি রাত্রিদিন। ও আমার রূপকে বিয়ে করছে। আমার সম্পত্তিকে। আমাকে নয়। বারবার বলেছে— সবগুলো বাড়ি আর কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে ওর হাতে তুলে দিই। নরকের শেষপ্রান্ত এতো তাড়াতাড়ি দেখার ইচ্ছে আমার ছিল না।

তবু নরকেরও বোধহয় নেশা আছে। বিকৃতির নেশা। ক্রমশ গ্রাস করেছিল আমাকে। মনে হত ওর ওপরে প্রতিশোধ নিচ্ছি। কিন্তু কার ওপরে প্রতিশোধ? ও তখন সহেলির পিছনে ছুটছে। আমার জন্য শরীরী প্রয়োজনটুকুও নেই। আমার সম্পত্তি হস্তান্তর না করা নিয়ে অশান্তি চরমে। ওর হাতে মারও খেতে হয়েছে। কিন্তু বেঁকে দাঁড়িয়েছি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ করে দিচ্ছিল, আর বেশিদিন নয়।

নরকের পথেরও তারতম্য হয়। ঠেলতে ঠেলতে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে, ওর হুঁশ ছিল না। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল সেদিন, যেদিন ও হনুমন্ত প্রসাদের বাড়ি গিয়ে তাকে সঙ্গে করে আনতে বলল। কু-রূপ কাকে বলে আমার অজানা নয়। আমি নিজে কুশ্রী ছিলাম। কিন্তু এ কদর্য। সাড়ে চার ফুট উচ্চতার মানুষটা আলকাতরার মতো কালো। বয়সে আমার বাবার সমান। মাথা ভরা টাক, কুঁৎকুতে চোখ, দু-ঠোঁটের কষে সাদা দাগ। একটা বড়োসড়ো থলথলে মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। হ্যা হ্যা করে যখন হাসে, থুতু ছিটকে লাগে গায়ে। আচার আচরণ কথাবার্তা— কারও সব কিছু এত কদর্য হতে পারে? এর নাকি ভারত জুড়ে সতেরোটা জুট মিল, সাতাশটা কটন মিল, তিনটে কয়লার খনি। জামার বোতামে, হাতের আঙটিতে, ঘড়ির ব্যান্ডে হীরে ঝলমল করে। একটা কুৎসিত বুড়ো গরিলা যেন সম্ভ্রান্ত সাজতে চায়। প্রথম আলাপেই বুড়ো, চোখ দিয়ে আমাকে গিলতে লাগল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লালার পরিমাণ বাড়ছে। আমাদের ড্রয়িংরুমে নিজের সোফা থেকে উঠে ধপ করে আমার পাশে বসল। সম্পদ জানে, কখন বাঘকে শিকারের টোপ ধরতে দিতে হয়। পাকা শিকারি যে। টুক করে উঠে গেল ঘরের বাইরে। বুড়ো গরিলাটা মুহূর্তে তার থাবা বসাল আমার বুকে। দিন দুপুরে, স্পষ্ট আলোয়। দুর্গন্ধ। ওর গায়ে কোনো গন্ধ ছিল না। কিন্তু বুনো পশুর গায়ের উৎকট গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার। এক ঝটকায় ওর থাবা ছাড়িয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

না, কোনো চ্যাঁচামেচি নয়। সম্পদকে ডেকে সাফ সাফ কড়া কথা শুনিয়ে বেরিয়ে যাওয়া নয়। হনুমন্তপ্রসাদ পাক্কা বেওসাদার কি না। সম্পদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কন্ট্রাক্ট নিয়ে কথা বললেন। আমাকে আমল দিলেন না। যেন কিছুই হয়নি। ভাবলাম, যাক, বেঁচে গেলাম।

ও চলে যাওয়ার পর সম্পদও এ নিয়ে কিছু বলল না। পরদিন তাজবেঙ্গলে বিশাল পার্টি দিচ্ছে সম্পদ। এ সপ্তাহেই আমেরিকায় লেদার এক্সপোর্ট হবে তার। বিকালে আমার ওপরে আদেশ হল— হনুমন্তপ্রসাদের বাড়ি গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার।

অসম্ভব। সেই উৎকট গন্ধটা তাড়া করছে আমাকে। আমি জানি, ওখানে গেলে আগে প্রণামী দিয়ে তবে তাঁকে আনতে হবে। পরিষ্কার হয়ে গেল, সেদিন কেন অত শান্ত থেকেছিলেন তিনি। শিকার আপনি গিয়ে ধরা দেবে তাঁর গুহায়, তবেই না সে অপমানের বদলা! আমি দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম। আর না।

সাপের মতো হিসহিসিয়ে উঠল সম্পদ, যেতেই হবে। পঞ্চাশ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট হাতছাড়া হয়ে যাবে।

যাক। পঞ্চাশ কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট নষ্ট হোক। আমার কী তাতে? সম্পদের মুনাফা হবে। আমি কী পাব? আমি কি কিছু পেয়েছি? সম্পদকে পেয়েছি আজও? পাব কোনোদিন? না সম্পদ মানুষ নয়, সম্পদ স্বামী নয়, সম্পদ ব্যবসাদার। আমি কেন তার পণ্য হব?

ক্ষেপে উঠল সম্পদ। ভেবেছিল আমি তার যন্ত্রে পরিণত হয়েছি। বিশ্বাস করতে পারছে না, আমি রুখে দাঁড়াতে পারি, আমি নারী— ভেতরে ভেতরে কালনাগিনীর বিষ আমার সহজাত।

ও ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। প্রহারের সঙ্গে বর্ষিত হতে থাকল অশ্লীল গালিগালাজ।

সম্পদ রূপবান, সুপুরুষ। সে যেমন, আমিও তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম এশিয়া অ্যাসোসিয়েট্‌স্‌-এর এক্সটেন্ডেড বোর্ড মিটিংয়ে। বাবার একদা পার্টনার মিঃ গুপ্তা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন,— সম্পদ চৌধুরী। ভেরি রাইজিং ইয়ং চ্যাপ। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, কোনো প্রাচীন সম্ভ্রান্ত গ্রীক যেন আধুনিক পোষাক পরে আমার সামনে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে। এতদিন নিজের নতুন পাওয়া রূপের সাগরে ভাসছিলাম। এখন ডুবতে লাগলাম আর এক রূপসাগরে। সম্পদ। আমার স্বপ্নের পুরুষ।

সেই সম্পদকে আমার হিংস্র নেকড়ে মনে হচ্ছে। তার মুখের অশ্রাব্য গালাগালির চেয়েও অসুন্দর, নোংরা। আমার তখন আর একটুও ব্যথা লাগছে না। অবাক হয়ে ভাবছি, মানুষের বাইরের রূপটা কত পলকা। রূপজ মোহের আড়ালে বসে থাকা সত্তা যখন বেরিয়ে আসে নখ-দাঁত নিয়ে তখন সেই তো তার আসল ছবি। তাকে আর ভোলা যায় না।

ও চলে যাওয়ার পর ও বাড়ির পুরোনো চাকর রামেশ্বর এসে কেঁদে ফেলল, আপ চলে যাইয়ে মাঈজি। ইহাঁ আপ মর যায়েঙ্গে।

আমি তার বুকে ছোট্ট মেয়েটির মতো আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। মরুভূমির শুকনো প্রান্তরে কোথাও না কোথাও মরূদ্যান থাকে, যত ক্ষুদ্রই হোক। রামুচাচার ঘেমো অপরিচ্ছন্ন বুকে আমি খুঁজে পাচ্ছি বাবার স্নেহের শীতল সুবাস...

— মালকিন! দৌলতরাম এক গ্লাস সরবত এনে রেখেছে টেবিলে — দই আর অরেঞ্জ ড্রিংকস-এর তৈরি। আমার বড়ো প্রিয়। বাইরে থেকে কাজ সেরে ফিরলে এটা আমার দরকার হয়।

সোফার অনিল দুটো বড়ো সুটকেস দুহাতে বয়ে এনে ঘরে রেখে গেল। দৌলতরাম কিছু একটা আন্দাজ করতে চাইছে, বুঝতে পারছি। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, আজ হী ওয়াপস যাবেন মাঈজি?

— না রে, আমি এখন এখানেই থাকব। বললাম, যেমন করে প্রবাসী মা তার সন্তানকে আশ্বস্ত করে।

দৌলতরাম যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা। হাঁ হয়ে গেছে।

— কাঞ্ছা, হো কাঞ্ছা, মাঈজি ইধার হি রহেঙ্গে অব্‌সে। কাঞ্ছা, আরে হো কাঞ্ছা— আরে শুন ইয়ার—

চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল দৌলতরাম। যেমন করে ছোট্ট ছেলে বিরাট আনন্দের খবর তার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিতে যায়। আমার চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। আমার উপস্থিতি এত খুশি করতে পারে কাউকে? এত নির্মল আনন্দ দিতে পারে? দু-দুবার অ্যাবরসন করাতে হয়েছে আমাকে। আমার অনাগত মাতৃত্ব একটু একটু করে ভিজে উঠছে।

আমি সরবতটায় চুমুক দিলাম। এক নিশ্বাসে পান করে গ্লাস নামিয়ে রাখলাম। আর কী ভালো লাগছে। আমি মুক্ত। আমার পায়ের বেড়ি কেটে বেরিয়ে এসেছি। আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। এ যেন আমি নয়। এ আমিকে আমি চিনি না। নিজেকে বড়ো অচেনা লাগছে। আমি খুঁজে পেতে চাইছি সেই পুরোনো সুরমা সেনগুপ্তকে। সেই কুরূপ মেয়েটাকে।

আয়নার কাছে বারবার জলছবির মতো একটা সাধারণ মুখ ভাসছে। মহল। মহলকে আমার বড়ো প্রয়োজন। কতদিন ধরে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ফোন উইথড্রন। ফোন নম্বর ধরে খুঁজে বের করলাম ওর বাড়ি। এইচ ডি এফ সি দেনার দায়ে ক্রোক করে নিয়েছে। এত বড়ো পৃথিবীর ভিড়ে মহলকে আমি কোথায় খুঁজব? একবার ভেবেছিলাম, কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। পরে মনে হল, না, ও আসবে কেন? না পাই, তা সইব, কিন্তু অবহেলা কি সইতে পারব?

অবহেলা! অদৃশ্য চাবুক আমাকে দংশায়। সে রাতে ফোন ছাড়ার পর আমি ঘুমিয়েছি। কিংবা আধো ঘুম আধো স্বপ্নে বিচরণ করেছি। কাল সকালে মহল আসবে, নবজন্ম হবে

আমার। আমার সব কিছু তার দেওয়া। আমি তাকেই উজাড় করে দেব। আয়না দেখি না। কিন্তু দেখতে তো পাই, আমার কোমর কমতে কমতে সিংহিনীর মতো সরু হয়ে গেছে। আমার বুকে স্থলপদ্ম ফুটেছে। মহলই একমাত্র পুরুষ, যে আমার শরীর ছুঁয়েছে, আমাকে সম্পূর্ণ দেখেছে। কোনো পুরুষ কখনও মন দিয়ে আমাকে কামনা করবে— এ ভরসা আমার ছিল না। মহলের স্পর্শ, তা সে হোক না গ্লাভসের অন্তরাল থেকে— আমাকে শিহরিত করেছে।

মহলের স্পর্শ, তা সে হোক না গ্লাভসের অন্তরাল থেকে— আমাকে শিহরিত করেছে। আমার বুকে, আমার কোমরে, নিতম্বে, জঘনে, জঙ্ঘায়— ও আমার দেহ নদীতে তুফান তুলেছে। কিন্তু নিজে অশান্ত হয়নি। কী শান্ত সংযমে সে বেঁধে রাখতে পারত নিজেকে। নারী তো এই-ই চায়। আমি ডুবে যাচ্ছিলাম, তলিয়ে যাচ্ছিলাম। শুধু রাত্রে টেলিফোনে ওর গলায় আবেশ ফুটে উঠত। যদিও ও নিজে থেকে একদিনও ফোন করেনি। সব আবেগ ধরে রাখতে চাইত নিজের মধ্যে, আড়াল করত। তবু আমি বুঝতাম। আমি যে নারী, আমি যে ওকে ভালোবেসে ফেলেছি ততদিনে।

ভোর ভোর এসে গেল ও। সেদিন ওর ছোঁয়ায় কোনো শক্তির প্রয়োগ ছিল না। আমার নিরাবরণ শরীরের ওপর থেকে নিচে, পরম মমতা বুলিয়ে দিল। কোথাও সামান্য চাপ একটুক্ষণ ধরে রাখা। কোথাও সামান্য টান। তারপর গ্লাভস্ খুলে ফেলল,— যাও, দেখো নিজেকে। ওর গলা কাঁপছিল। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে বুক ওঠানামা করছে। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে ওকে।

ওর সামনে আমার কোনো লজ্জা অবশিষ্ট ছিল না। ওই অবস্থায় ছুটে গেলাম দেওয়ালে ঝোলানো বেলজিয়াম গ্লাসের সামনে। এক টানে সরিয়ে দিলাম পর্দা। নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে চাই, নিজের খুঁটিনাটি সবটুকু।

স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। এ কে? এ কি আমি? এত রূপ, এই ফাগুন আগুন অঙ্গ, এ কি আমার? আমার পিছনে মহলের প্রতিবিম্ব। মহল আমার কাঁধে হাত রেখেছে। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার কর্ণমূল ছুঁয়ে যাচ্ছে। মহল ফিসফিস করল,— সুরমা, সু, সুর্মা, আমি— আমি তোমাকে ভালোবাসি— আমি— ছিটকে সরে গেলাম আমি। আর এতদিন পর একরাশ লজ্জা গ্রাস করল আমাকে। তাড়াতাড়ি কাফ্তানটা পরে নিলাম। মহল অদ্ভুত বিস্ময়ে চেয়ে আছে। আমি ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চেক-বই বের করলাম। খসখস করে লিখে ফেললাম।

— এই নাও, তোমার পেমেন্ট পঞ্চাশ হাজার।

মহল বোবা হয়ে গেছে।

— নাও। ভয় নেই, বাউন্স হবে না।

মহল বিড়বিড় করল,— আমি, আমি কি টাকার জন্য— না সু, তুমি আমার তিলোত্তমা, সৃষ্টি। সু, আমি তোমাকে—

হা হা করে হেসে উঠলাম আমি,— ভাবলে কী করে মহল? তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্যটা ভুলে গেছ? নাও, পাগলামি কোরো না।

আমার হাসি পাচ্ছে। আমিই বা কোন খেয়ালে ওকে কামনা করেছিলাম— ওই অশিক্ষিত গরিব একটা ভ্যাগাবন্ডকে?

ওর দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে, শূন্য হয়ে যাচ্ছে। যেন মাটি হারিয়ে ফেলছে পায়ের তলায়। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাতে চেকটা গুঁজে দিলাম— আজ সন্ধ্যাতেই তোমার বাড়িতে একটা ভালো গিফট পৌঁছে যাবে। ভেবো না সস্তা কিছু। ওয়েল ডান মহল। য়্যু হ্যাভ—

ওর চোখ জ্বলে উঠল। আমার কথার মাঝখানেই ও চেকটাকে ছিঁড়ে দু-টুকরো করল। তারপর কুচিকুচি। উড়িয়ে দিয়ে নিজের ছোট্ট ব্যাগটা তুলে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

আমি কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে ছুটে গেলাম ড্রেসিং টেবিলের সামনে। সরালাম সে আয়নার পর্দা। সাজের জিনিসগুলো বের করলাম। ছুটে গেলাম আলমারির সামনে, কোন পোশাকটা পরব? কী যে করব বুঝে উঠতে পারছি না। তুচ্ছ এক ম্যাসিওরকে নিয়ে ভাবার অবকাশ আমার আছে?......

ফোন বাজে কেন? এ বাড়িতে এখন আমি থাকব, এ তো কারও জানার কথা নয়।

— হ্যালো?

— সুরমা? আমি প্রতীক। বাড়িতে ফোন করে মনে হল, তুমি এ বাড়িতেই—একবার দেখা করতে চাই—

— সরি প্রতীক!

নামিয়ে রাখলাম। প্রতীক সম্পদের আগে আমার পাণিপ্রার্থী ছিল। ইন্ডাস্ট্রিয়্যালিস্ট। জানত, আমার সঙ্গে সম্পদের বনিবনা হচ্ছে না। ঠিক লক্ষ রেখেছে। না, কারও সঙ্গে দেখা করব না। নিজেকে গুটিয়ে রাখব খোলের মধ্যে শামুকের মতো।

কাঞ্চাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে দৌলতরাম। দুজনের মুখে খুশির ঝিলিক, নতুন রোদ্দুরের মতো ঝলমলে। কাঞ্চা বলে, কী রান্না হবে মাঈজি?

— যা খুশি। যা তোদের মন চায়

খুব খুশি হল ওরা। দাঁড়িয়ে আছে দুজনেই। মনে হল কিছু বলতে চায়। বললাম, কিছু বলবি?

—মাঈজি, মাটির দিকে চোখ রেখে বলল দৌলতরাম, লখন আর শিউরাম বলছিল কী, ওদের নতুন বাড়ি ভালো লাগছে না। আপনি হুকুম করলে ওরা আবার এখানে—

হেসে ফেললাম,— আচ্ছা খবর দে।

— বহুত মেহেরবানি মাঈজি। পুরোনো সঙ্গীদের ফিরে পাওয়ার আনন্দে ওরা অধীর। তাড়াতাড়ি যেতে চায়। আমারও খুব ভালো লাগছে। হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার মতো।

— শোন। ওদের পিছনে ডাকলাম, ঘুরে তাকাল ওরা।

— আচ্ছা, সেই ম্যাসিওরবাবু আর কখনও আসেনি? খুব মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলাম।

— নেহী তো!

— ফোনও করেনি?

— নেহী।

— পথেঘাটে যদি কখনও দেখা হয়—

— একবারও তো নজরে এল না। কাঙ্গা, তু দেখেছিস?

— না তো।

— আচ্ছা, তোরা যা।

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। ফিরে পাওয়ার সুখ মুছে যাচ্ছে। আমি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। না, অসহ্য এ রূপ। আমি চাই না। এ অভিশাপ আমি দূর করে দিতে চাই। মহল, তুমি কোথায়? তোমাকে আমার বড়ো প্রয়োজন।

।। ৩।।

কুসুমবরণ সূর্য তখন নিজেকে মেলে ধরার আগে পৃথিবীকে দেখে দিচ্ছে চুপি চুপি। বাবুঘাটে নিত্য স্নানার্থীদের ভিড়। একটা বড়োসড়ো খড়ের নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে হুগলির দিকে। একদল শ্মশানযাত্রী শবদাহের শেষে এখানে স্নান সেরে ঘুমিয়েছিল বোধহয়। রাতে বাড়ি ফিরতে নেই। তারা আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসছে। শরৎ শেষের স্নিগ্ধ শীত। নদীর বাতাস একটু প্রবল। ও পাড়েও ব্যস্ততা। দূর থেকে দেখা যায়।

নিত্যকার অভ্যাসমতো সুরমা সেনগুপ্ত এসেছে নদীর ধারে। ফর্সা হওয়ার আগেই। ঘি-রঙা শাড়ির ওপরে পাতলা তসরের চাদর জড়ানো। বাতাসে চুল উড়ছে। রেলিঙে ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে নদীর বুকে। সত্যিই কি তাকিয়ে আছে? দৃষ্টিভরা নিঃসীম শূন্যতা। ডানা মেলে উড়ে গেছে কোন সুদূরে।

এই সাত সকালে এক অন্ধ ভিখারি তার বেহালায় ছড় টেনেছে। করুণ রাগিণী গুমরে গুমরে উঠছে। সুরমা চঞ্চল হল। পিছন ফিরে তাকাল। অতন্দ্র প্রহরীর মতো নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল ড্রাইভার অনিল। এ ইঙ্গিত তার পরিচিত। সে এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে।

বামে ভিক্টোরিয়া, ডানদিকে পি জি হাসপাতালকে রেখে ছুটে চলেছে বিশাল ডাটসন গাড়ি। গদিতে ডুবে আছে সুরমা। দৃষ্টি তেমনই স্থির, উদাসীন। ড্রাইভার অনিল নির্দিষ্ট পোশাকে সুসজ্জিত। মাথায় টুপি। পোশাকের আড়ালে নিজের সত্তাকে সেও যেন হারিয়ে ফেলেছে। যন্ত্রমানুষের মতো চালকের আসনে বসে নিঃশব্দে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

এত সকালেও জ্যাম। রবীন্দ্রসদনের মুখে এক সার ট্রাক জট পাকিয়ে ফেলেছে। অনিল গাড়িটাকে বাঁদিক ঘেঁষে দাঁড় করায়। স্টার্ট বন্ধ করে। সুরমার কপালে সামান্য ভাঁজ। ওই পর্যন্ত। কৌতূহলী হয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে না। নির্বিকার অনিলও।

— বলবেন ম্যাডামা, স্টেটস্‌ম্যান, টেলিগ্রাফ, আনন্দবাজার—

সুরমা মুখ ঘোরায়। বাঁদিকের দরজার কাছে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা একটা মুখ। চোখে চোখ পড়তেই সট করে সরে যায়। চকিতে সোজা হয়ে উঠে বসে সুরমা। লোকটা দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের দিকে। বগলে একগাদা খবরের কাগজ।

সুরমা চিৎকার করে ওঠে,— অনিল ওকে ধরো— যেভাবেই হোক ধরো ওকে!

অনিল দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। ছুটতে থাকে ওর পিছনে। লোকটা আরও জোরে ছুটছে। অনিল কি পারবে? উৎকণ্ঠায় থমথম করছে সুরমা। চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে ওরা। দরজা খুলে সুরমা বেরিয়ে আসে।

হাসপাতালের মেন গেটের কাছে ওকে ধরে ফেলেছে অনিল। জাপটে ধরে আছে। লোকটা ছটফট করছে, কিন্তু ছাড়াতে পারছে না নিজেক। অনিল খুবই শক্তিমান। লোকটা চিৎকার করছে,— ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন।

ফুটপাথের ওপর চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল রাত জেগে ক্লান্ত রোগীর পরিজনরা। কিছু মুটে মজুর। ছুটে আসে ওরা। জটলা বেঁধে যায়। নানা জনে মন্তব্য করছে— এ ব্যাটা হকার নিশ্চয়ই ওর টাকা গেঁড়িয়েছে— এ শালা ড্রাইভার সাত সকালে মাল খেয়েছে মাইরি—

সুরমা পৌঁছে গেছে। লোকটা যেন আরও মরিয়া হয়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

— সিন ক্রিয়েট কোরো না মহল। দু'মাস তুমি আমার জন্য প্রাণপাত করেছ। আজ পাঁচটা মিনিট তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। শুধু পাঁচটা মিনিট।

মহল শান্ত হয়ে যায়। সুরমা ইঙ্গিতে অনিলকে বলেন ওকে ছেড়ে দিতে। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করে। হতভম্ব মানুষজনের সামনে দিয়ে মহল মাথা নিচু করে অনুসরণ করে সুরমাকে।

কোনো কথা নেই। কাগজের বান্ডিল সামনের গদিতে। মহল বসে আছে সুরমার পাশে। দু'জনের দৃষ্টিই শূন্যতাকে নির্ভর করে আছে। গাড়ি ছুটে চলেছে আবার বাবুঘাটের দিকে।

রেলিংয়ের সেই জায়গাতেই এসে দাঁড়ায় সুরমা। পাশে মহল। বেহালাবাদক ভিখারি বাজিয়ে চলেছে করুণ সুর। নদীর বুকে নবারুণ খেলা করছে।

— মহল, আমি তোমাকে পাগলের মতো খুঁজছি। কোথায় ছিলে তুমি? তোমার বাড়িতেও গেছিলাম।

উত্তর দেয় না মহল। চেয়ে থাকে নদীর বুকে। কোনো ভাবান্তর নেই।

— আমি হেরে গেছি মহল। এ রূপ আমার অভিশাপ। আমার দুর্গ্রহ। আমি সব হারিয়েছি— আমার নারীত্ব, আমার অহংকার—

কণ্ঠ রুদ্ধ হয় সুরমার। মহল চুপ। আগের মতোই।

— এ পণ্য আমি চাই না মহল। তোমাকে আর একটা কন্ট্রাক্ট নিতে হবে। আমাকে আগের রূপে ফিরিয়ে দাও। যত টাকা লাগে, আমি দেব। কিন্তু এ কাজ তোমাকে করতে হবে।

মহলের ঠোঁটে দাড়ি-গোঁফের মাঝখানে এক চিলতে করুণ হাসির রেখা।

— মহল, মহল প্লিজ। আর কোনোদিন কোনো অনুরোধ করব না তোমায়।

মহল মাথা নাড়ে। সুরমা দেখতে পায়, একটা বড়োসড়ো দীর্ঘশ্বাস।

— আমি আর পারি না সু।

কত দূর থেকে কথা বলছে ও? কতদূর? অধীর হয়ে ওঠে সুরমা,— বিশ্বাস করি না। তোমার সেই ম্যাজিক গ্লাভস—

দূরে আঙুল দেখায় মহল নদীর বুকে— ওখানে— তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম এখানেই।

সুরমার ঠোঁট ফুলে ওঠে। দলা পাকানো কান্না ঠেলে ফুঁপিয়ে ওঠে,— মহল, মহল তুমি— আমি কি তোমার এতবড়ো অভিমানের যোগ্য মহল? তুমি জানতে না আমি শূন্যগর্ভা? জানতে না, যে আসল নয়, তারই অহংকার হয় বেশি?

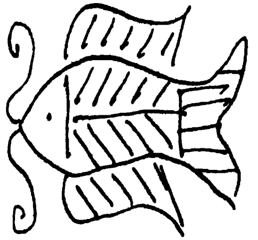
মহলের মুখের হাসি বদলে যাচ্ছে। ঠোঁট কাঁপছে। কাঁপছে দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। কপালে জেগে উঠছে সদ্যজাত দ্বীপরেখার মতো ভাঁজ।

— মহল, ধরা গলায় ফিসফিস করে ওঠে সুরমা,— তবে গ্লাভসের বন্ধন ঘুচে যাক। তোমার দুহাতে, শুধু তোমার মতো করে গড়ে নেবে আমাকে মহল? সুরমা ওর হাত জড়িয়ে ধরে।

মহল মুখ ফেরায় সুরমার দিকে। কাঁপছে দু'জোড়া হাত। দু'জোড়া চোখে টলটলে নদীজল— কে কার প্রতিবিম্ব দেখে?

চন্দ্রকাশে তারা

সৈয়দ রেজাউল করিম



আর মাসখানেক পরে পঞ্চায়েত ভোট। এই গরমে মালদা জেলা খর গরম। অনান্য জেলার হালও একই রকম। সেন্সরসিপের কাজ চলেছে, পুরোদমে— সব জায়গায়। বাঁধা সময়। দশদিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। সরকারী আদেশ। নাওয়া খাওয়া ভুলে তাই এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম, এবাড়ি থেকে সে বাড়ি চযে বেড়াচ্ছি। মুখে টেপ রেকর্ডারের মত বাজিয়ে চলছি— 'আপনার নাম? বয়স? কি করেন? স্বামীর নাম? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধাক্কা খেলাম জীবনপুরের হাটে গিয়ে। যথারীতি মুখগুঁজে ছকে বাধা প্রশ্নগুলো শুরু করে ছিলাম। হঠাৎ কথার ফাঁকে ভদ্রমহিলা বলে বসলেন- 'তোমার নাম সুমন না? তোমাদের বাড়ি হৃদয়পুরে না? তোমার বাবা না স্কুলের মাস্টার?

আমি বিস্ময়ে বিমূঢ়। হতবাকও বটে। টেকনোলজির দৌলতে 'দুনিয়া মুট্টি মে' হলেও, ২৪ পরগণা থেকে মালদার দুরত্ব এতটুকু কমেনি। সেখানকার এক গৃহবধু ২৪ পরগণার একটা যুবককে চিনে ফেলবে, গড় গড় করে চোদ্দ পুরুষের ঠিকুজি বলবে, তাতে হতবাক না হয়ে উপায় কি?

বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে চোখ তুলে তাকালাম। বয়েসের একটু ছাপ পড়লেও চিনতে খুব একটা অসুবিধা হল না। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলার স্বর। এমনকি গালে সেই টোল পড়া খিলখিলে হাসি। চোখ দুটো চকচক করে উঠল আমার, শুধালাম-চন্দ্রাদি না? —'তুমি এখানে'? পরিচিত সেই মিষ্টি হাসি ঝরে পড়ল ভদ্রমহিলার মুখ থেকে। কিছুটা কপট অভিমান করে বলল- 'এতক্ষণে তাহলে চিনতে পারলে?"

চন্দ্রাদিকে চিনতে পারব না, একথা বললে ডাহা মিথ্যা কথা বলা হবে। সেই ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি চন্দ্রাদিকে। চন্দ্রাদির সঙ্গে কতভাব আমাদের। এক সঙ্গে এক্কা দোক্কা খেলা, লুকোচুরি খেলা, বউ বাসন্তি খেলা, কত খেলেছি তার হিসেবে নেই। সেই চন্দ্রাদিকে ভুলে যাব কি করে?

কিন্তু মানুষ ভুলে যায়। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম! কথায় বলে না, চোখের আড়াল তো মনের আড়াল। সেটাই ঘটেছিল। দীর্ঘ কুড়িটা বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই চন্দ্রাদির সঙ্গে। তাই চন্দ্রাদির ছবি ক্রমশঃ ফিকে হয়ে গিয়েছিল মন থেকে। চন্দ্রাদি যখন নিরুদ্দেশ হল তখন আমি ক্লাস থ্রির ছাত্র। চন্দ্রাদি কোথায় গেছে কার সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়েছে তা

জানার মতো বয়স তখন আমার নয়। একটু বড় হয়ে জেনেছিলাম চন্দ্রাদির ভালোবাসার কথা। আর সেই ভালোবাসার টানে কার সঙ্গে চলে গেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি কথাটা। বিশ্বাস হবে কি করে, যার হাতে আমি চন্দ্রাদির চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসতাম, সেই তারাদা তো কোথাও পালিয়ে যায়নি। এখনও সকাল সাঁঝে নিয়ম করে গাঁয়ের ছেলেদের পড়ায়। সময় করে গল্প কবিতা লেখে। পথে ঘাটে উদাস হয়ে চলা ফেরা করে। আনমনে কিসব ভাবে।

কতদিন পরে চন্দ্রাদির সঙ্গে দেখা। চোখে মুখে তাই খুশীর বান বইছে আমার। বেড়ে গেছে হৃদস্পন্দনের গতি। বুকের স্পন্দন, চন্দ্রাদি বলল— 'বোস। তোর জন্য একটু চা করে আনি।' আমি কাজ আছে বলে আপত্তি করলাম। কিন্তু সে আপত্তি ধোপে টিকল না। চা-এর জন্য বসতেই হল আমাকে।

চন্দ্রাদির বাড়িটা বেশ ছিমছাম। কোথাও কোন বাহুল্য নেই। যেমন রঙের কারুকার্য তেমন অতুলনীয় তার ডেকোরেশন। ঘরের ঠিকমাঝ খানটায় ড্রইংরুম। দুপাশে দুটো শোবার ঘর। একপাশে কিচেন রুম অন্য পাশে বাথরুম। সামনে প্রশস্ত বারান্দা। বাগানে ফুটে আছে দেশ বিদেশের রঙ বেরঙের নানা ফুল।

চন্দ্রাদি চা বিস্কুট নিয়ে এল। দু জনের জন্য। বলার অপেক্ষা না করে ট্রে থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিলাম। পরিমান মত চিনি দুধ মিশিয়ে নিলাম তাতে। তারপর গভীর আমেজে চুমুক দিলাম। আর মনে মনে ভাবলাম চন্দ্রাদি বেশ সুখেই আছে। স্বামী পুত্র সংসার নিয়ে, পরক্ষণে খটকা লাগল মনে। মাথায় সিঁদুর, হাতে লোহার বেড়ি না হয় প্রমাণ করে স্বামীর অস্থিত্ব, কিন্তু পুত্রের প্রমাণ?

জিজ্ঞেস করতেই হাসিতে ফেটে পড়ল চন্দ্রাদি। এক সময় হাসি থামিয়ে বলল পেটের না হলেও তুই তো আমার ছেলে। তুই আমার বন্ধুও। চন্দ্রাদির গলার স্বর ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম ছেলে পুলে না থাকার অভিমান তার গলায়। কথাটা বলে যে ভালো করিনি তাও বুঝলাম মর্মে মর্মে। তাই প্রসঙ্গ পাল্টাতে বললাম- 'তারাদার খবর রাখো চন্দ্রাদি?'

আমার কথা শুনে —— লাজে মুখ টিপে হাসল চন্দ্রাদি। ...... একটা ধমক দিয়ে বলল ফের দুষ্টুমি শুরু করছিস?

দুষ্টুমির কি আছে? যুক্তি সহকারে জানাতে চাইলাম— 'মানুষ মানুষের খবর রাখে না? জানা শোনা কোন মানুষের খবর রাখতে দোষ কোথায়?

আমার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল চন্দ্রাদি। একসময় কতকটা উদাস ভাবে তাকিয়ে বলল- 'না রে ওর কোন খবর আমার জানা নেই। পরক্ষণেই পালাটা প্রশ্ন করে জানতে চাইল- 'তুই কোন খবর রাখিস না কি?'

আবেগের মুখে লাগাম দিতে পারলাম না আমি। নির্লজ্জ বেহাহার মত বলে বললাম—

'চন্দ্রাদি! তোমার জন্য লোকটা আজও বিয়ে করেনি। উদভ্রান্তের মত পথে ঘাটে ঘোরাফেরা করে। অথচ তুমি.......।'

আমার মুখে হাত চাপা দিল চন্দ্রাদি। বলল- 'আমাকে দেখে তোর ঘেন্না তো? নিশ্চয়ই ভাবিশ তোর চন্দ্রাদি কত স্বার্থপর। নিজের সুখের জন্য সে সব কিছু করতে পারে। কিন্তু কতটুকু জানিস আমার সম্বন্ধে? কতটুকু বুঝবি আমার বুকের জ্বালা? কি করে জানবি কোন চক্রবুহের মধ্যে পড়ে.................।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় চন্দ্রাদি। তার গাল বেয়ে নিশব্দে গড়িয়ে পড়ল বুক ভেজা কান্না। সে যন্ত্রণা কিসের তা বোঝার মত বয়স হলেও পরিমাপ করতে পারলাম না, কতটা ব্যথা, কতটা অনুশোচনা কার জন্য? যার জন্য শুনে কেনই বা মাক্ষিকার মত ঝাঁপ দিয়েছিল চন্দ্রাদি? আত্ম সুখের জন্য কেনই বা.......।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমার চোখ দুটো হঠাৎ আটকে গেল দেওয়ালে। অবাধ্য চোখ দুটো তখন দোলা খাচ্ছে, কার ছবি দেখছি আমি!

আমার অবস্থা দেখে চন্দ্রাদি বরাবরের মত ভ্রু নাচিয়ে বলল— 'ওমন ভাবে হাঁ করে দেখার কি আছে? আমার পাশে যার ছবিটা দেখাছিস ওটা আমার বর।'

বিস্ময়ের অবধি ছিল না আমার। কি বলছে চন্দ্রাদি! আমার অফিস বশ ওর স্বামী। গর্বে ভরে গেল আমার বুক। সাহেবের মত লোক খুব একটা দেখা যায় না। যেন গল্প কাহিনীর দেবদূত। ঈশ্বরের বরপুত্র। এ রকম সাহেব লাখে একটা মেলা ভার। বিবেক, বিচার বোধ, মানবতাবোধ কোন কিছুরই অভাব নেই তার আচার আচরণে। মনে হয় এসব মানুষেরা আছে বলেই আজও দিন দুনিয়া চলে, না হলে পৃথিবীটা শেষ হয়ে যেত এতদিনে। আবেগে আপ্লুত হয়ে তাই বললাম— 'সত্যি চন্দ্রাদি, তুমি ভাগ্য করে জন্মেছিলে। না হলে আমার বশের মত লোক তোমার ভাগ্যে জোটে?'

আমার কথা শুনে গর্বে ভরে উঠেনি চন্দ্রাদির বুক। আত্মতৃপ্তির উজ্জলতায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেনি তার মন। আমি টের পেলাম ওর থমথমে মুখ দেখে। মনে হল চন্দ্রাদির চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে আগুনের হলকা। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝরছে ঘৃণার হলাহল। কিন্তু কেন? কেন এই ঔদ্বত্য চন্দ্রাদির? আমি বুঝতে পারলাম না এটা কিসের ক্ষোভ, কিসের অভিব্যক্তি চন্দ্রাদির?

জিজ্ঞেস করলাম চন্দ্রাদিকে। কিন্তু কোন জবাব দিল না। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উল্টে আমাকে জিজ্ঞেস করলে— 'একটা চিঠি দেব, তারাকে দিতে পারবি?' মাথা নেড়ে বললাম- 'কেন পারব না? তুমি দিয়েই দেখ না—, ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।

চন্দ্রাদি খুশী হয়ে বলল— 'আমি জানি তুই পারবি। তোর উপর আমার অগাদ বিশ্বাস আছে। কিন্তু ভাই সাবধান। এই বয়সে আমার মাথায় যেন কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিস না।'

আমি বললাম- 'সে সব কথা তোমার ভাবতে হবে না। আগে চিঠিটা দাও তো দেখি।'

আমার কথা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল চন্দ্রাদি। দুলে দুলে হেসে এক সময় বলল— 'দুর পাগল। এখন কখন চিঠি লিখব? চিঠিটা তো ভেবে লিখতে হবে। তার জন্য তো সময় চাই। তারপর একটু থেমে বললল— 'আমার তো আর ভাবনা নেই। তুই তো আমার বরের অফিসে কাজ করিস। তাই না? তোকে আমি কদিন পরে ডেকে নেব।'

সারাদিন গাধার মত খেটে কোয়াটারে ফিরলাম সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। কিন্তু মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না চন্দ্রাদির কথা। চন্দ্রাদির ভালবাসার কথা। একটা পনের বছরের নাবালিকা মেয়ে আজ মাঝবয়সি নারী। তার বিয়ে হয়েছে। কুড়ি বছর ধরে সংসার ধর্ম করছে। কিন্তু সে আজও ভুলতে পারেনি তার মেযেবেলা কার কথা। ভালবাসার কথা। তার মনের মনিকোঠায় আজও যত্ন করে তুলে রেখেছে তার চাওয়া পাওয়া, তার ভাব ভালোবাসার হিসাব নিকাশ। তুষের মত আজও তার বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছে সেই ভালবাসার আগুন। কেন যে এমন হয়। কি কারণে হয়। তা আমার জানা নেই।

আমার কেবল মনে হল চন্দ্রাদি তার সাংসারিক জীবনে খুব অসুখী। আর তার নিরানন্দের কারণ হল আকাশ সাহেব। যদিও চন্দ্রাদি খোলসা করে কিছু বলেনি। তবুও তার রক্ত চক্ষু, তার আচার আচারণ বলে দিয়েছিল তার মনের অনেক না বলা কথা। চন্দ্রাদির ভালোবাসার পথে আকাশ সাহেব যে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে কথা চন্দ্রাদি না বললেও আমার বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি। এটাকে সন্দেহ বাতিক বলুন, ঈর্শা প্রবনতা বলুন, কিংবা অন্য যাই খুশি বলুন, আমি ওটাকে মেয়েদের সহজাত গুণ বলে মনে করি। তারা শুধু মুখ দেখে বলে দিতে পারে একটা মানুষের মনোভাব, তার স্বভাব চরিত্র, আশা নিরাশা, দুঃখ বেদনার প্রতিটি মুহুর্ত। আমার মুখে বোধ হয সেরকম কিছু ছবি ফুটে উঠেছিল। গিন্নি শুধালো 'অমন মনোযোগ দিয়ে কোন রূপসীর কথা ভাবতে ভাবতে আসছো?'

লজ্জায় জিভ কাটলাম আমি। বলতে গিয়েও গলার কাছে আটকে গেল কথাটা। কি জানি, শুনলে অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে গিন্নি। কারণ চন্দ্রাদিকে ও কখনও দেখেনি। চন্দ্রাদির গল্পও শোনেনি। তাছাড়া তাদের বাল্যপ্রেমের গল্প যদি রসালো হয়ে মেয়েমহলে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে মরা ছাড়া অন্য কোন গতি থাকবে না চন্দ্রাদির। আর তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াব আমি। সে যত বড়ই আপনজন হোক, একথা কখনও বলা যায় না। তাই আমি চুপচাপ ছিলাম। আমার নিস্তব্ধতা দেখে গিন্নি আবার শুধালো— 'কি গোপন প্রেম নাকি?'

প্রশ্নের উত্তরটা বেশ রসালো করেই দেওয়া যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াবে তা পরিমাপ করতে না পেরে, খানিকটা ইচ্ছে করেই মিথ্যা বললাম। 'অফিসে ছুটি চাইলাম, দুজনে দার্জিলিং যাব বলে। কিন্তু ভোটের বাহানা করে ছুটি দিল না। বলোতো কার না মনে রাগ হয়?'

গিন্নি সে কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। আর আমি হাতের

ব্যাগটা রেখে জামা কাপড় ছাড়লাম। বাথরুমে মুখহাত পা ধুয়ে খানিকটা ফ্রেস হলাম। হাল্কা একটা পাজামা পাঞ্জাবী পরে ঝুল বারান্দায় গিয়ে বসলাম, একেবারে নবাবি মেজাজের ইজি চেয়ার গা হেলান দিয়ে। গিন্নি এল। হাতে ধরিয়ে দিল গরম চা। একটা লম্বা চুমুক দিলাম কাপে, আমেজ এসে গেল। সেই সময় গিন্নি মুখ ভারি করে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল— 'জানতাম, তুমি বলবে না।' বড় বিস্বাদ ঠেকল মুখে। পরিমানের থেকে বেশি চা পড়লে যা হয় আরকি। একটু তিতকুটে ভাব। মুখটা গেল বিগড়ে। গিন্নি কি বুঝল কে জানে। ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলে গেল রান্নাশালে।

শনি, রবি দুটো দিন মানভঞ্জন করতেই কাটল। ছুটির আমেজটাই বরবাদ হল। অফিস থেকে দুদিন ফোন করেছিল। ফোন ধরিনি। গিন্নি নির্দ্ধিধায় বলে দিল বাড়িতে নেই। কিন্তু, আজ তো সে কথা বললে কেউ শুনবে না। তাই সকাল সকাল দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে, দুটো মুখে দিয়ে ঠাকুরের নাম করে বের হয়ে পড়লাম।

অফিসে পৌছলাম ঠিক সাড়ে দশটায়। অবাক হয়ে গেলাম কর্মসংস্কৃতির বহর দেখে। ছোট বড় সব বাবুই এসে গেছে অফিসে। তারা মুখ গুঁজে কাজ করছে। আমাকে দেখে গোল গোল চোখে তাকালো সবাই। মুখ তেরচা, যেন রূপালী পর্দার হিরোকে দেখছে। মনে মনে আমি তখন বেসামাল। কিছুটা অপরাধীর মত ভয়ে জড় সড় হয়ে এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছি। বঙ্কিমবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখলেন আমাকে। তারপর শুদ্ধ ভাষায় শালার সঙ্গে বাবু লাগিয়ে সম্বোধন করে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে অফিস বসের চেম্বার দেখিয়ে বললেন- 'জামাইবাবু খুঁজছেন। হঠাৎ বঙ্কিমবাবুর এহেন রসিকতা কেন? অফিসে ঢুকতে একটু দেরি হয়েছে তাই'! মাথায় যখন ঘুর পাক খাচ্ছে এরকম অনেক প্রশ্ন ঠিক তখনেই মনে পড়ল চন্দ্রাদির কথা। তার সঙ্গে আকাশ সাহেবের সম্পর্কের কথা। তা বলে অফিস কাছারিতে এরকম শব্দ ব্যবহার মাথায় লাগল খুব। দুটো কথা শুনিয়ে দিতে হবে। হাতের এ্যাটাচিটা রেখে রাগত ভাবে ঢুকলাম আকাশ সাহেবের চেম্বারে। কিছু বলার আগেই সাহেব হাসিহাসি মুখ করে বললেন, 'আপনি যে আমার বড় কুটুম তা তো বলেননি কোনদিন।'

আমি চুপচাপ। রাগ হজম করছি মনে মনে। আকাশ সাহেব বললেন, আপনার দিদি আপনাকে স্মরণ করেছেন। দয়া করে গাড়িটা নিয়ে একবার ঘুরে আসুন। না হলে আমার চাকরী থাকবে না। বসের রসালো কথায় আমি না হেসে পারলাম না। যাব না বলে গাঁই গুঁই করছিলাম। কিন্তু কোন কথা শুনতে চাইল না বস্। একরকম জোর করেই আমাকে গাড়িতে তুলে দিল।

অফিস থেকে জীবনপুরের হাটে চন্দ্রাদির বাংলো বড় জোর পাঁচ কিলোমিটার পথ। পৌছে গেলাম দশ মিনিটের মধ্যে। গাড়ির আওয়াজ শুনে চন্দ্রাদি বাইরে এলো। আমাকে নামতে দেখে অনুযোগের সুরে বলল এত দেরী- করলি যে?' আমি বললাম 'দেরী কোথায়,

অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই একরকম জোর করেই পাঠিয়ে দিলেন বস্‌। একেবারে যমদুতের মৃত্যু পরওয়ানা জারি করার মতো।' আমার কথা শুনে চন্দ্রাদি হাসলো। সেই টোল পড়া হাসি। হাসাতে হাসতে বললো, তুই সেই আগের মতো আছিস। বদলাসনি একটুও।

আমি বললাম, 'ওসব ছেঁদো কথা রাখো চন্দ্রাদি। তাড়াতাড়ি দাও। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'তোরা যে, কত কাজের মানুষ তা আমার ভালোই জানা আছে।' আসল কথাটা পাড়তে অবজ্ঞার সুরে ধমকে দিল আমাকে। তারপর বলল, 'হাত-পা জ্বালিয়ে যে রান্না করলাম তা কি নষ্ট হবে?' আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'আবার আমার জন্য রান্না করতে গেলে কেন?' চোখ গোল গোল করে চন্দ্রাদি বলল, 'বারে তোকে দিয়ে কাজ করাবো, পারিশ্রমিক দেব না। তা আবার হয় নাকি?' অগত্যা খেতে বসতে হল আমাকে। ঝালে ঝোলে অম্বলে কি যে রাধেনি চন্দ্রাদি তা খুঁজে পেলাম না। অফিসে আসার আগে যা খেয়েছিলাম তার দ্বিগুণ খেলাম আবার, শুধু রান্নার স্বাদে। অপূর্ব রান্না করে চন্দ্রাদি। তারিফ করার মতো।

পাক্কা আধা ঘন্টা লাগল খেয়ে উঠতে। হাত ধুয়ে মুখে মুখশুদ্ধি নিয়ে চন্দ্রাদিকে বললাম, 'তোমাকে দেখে আমার খুব হিংসে হয় চন্দ্রাদি। সত্যি তুমি কপাল করে জন্মেছিলে। তোমার সুখ ঐশ্বর্যের শেষ নেই। শুধু ভগবান যদি মুখ তুলে........।' কথাটা শেষ করতে দিল না চন্দ্রাদি। বলল, 'মহাভারত পড়েছিস?'

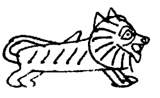
কি কথার কি প্রসঙ্গ। ধান ভাঙতে শিবের গীতের মতো। বলতে গেলাম চন্দ্রাদির ছেলেপুলের কথা চন্দ্রাদি বলল মহাভারতের কথা। কেন যে চন্দ্রাদি মহাভারতের কথা তুলল তা বুঝতেই পারলাম না। বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাই তাকিয়ে ছিলাম চন্দ্রাদির মুখের দিকে। চন্দ্রাদি কি বুঝল কে জানে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে নিজেই বলল, 'মহাভারতে অম্বা, অম্বালিকার নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবি। ওরা মনে প্রাণে কখনও চায়নি। তবুও বেদব্যাস হাজির হয়েছিল ওদের ঘরে। মিলনকালে ভয়ে চোখ বুজেছিল অম্বিকা আর পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল অম্বালিকা। তার ফল, ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব, পাণ্ডুর পাণ্ডুত্ব।' এতক্ষণে আমার মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা। চন্দ্রাদি তাহলে ইচ্ছে করেই মা হতে চায়নি। অবাক হলাম চন্দ্রাদির মানসিকতা দেখে, তার মনের দৃঢ়তা দেখে। প্রায় বিশটা বছর সংসার করছে চন্দ্রাদি কিন্তু আজও ভুলতে পারেনি আকাশ সাহেবের বিশ্বাসঘাতকতার কথা, তার সর্বনাশের কথা। আমি পরিমাপ করতে পারছিলাম না কোনমতেই, কিভাবে চন্দ্রাদি নির্বিবাদে সংসার জীবন করে চলেছে আকাশ সাহেবের সঙ্গে।

আমি বললাম— 'অনেক হয়েছে চন্দ্রাদি, এবার চিঠিটা দাও মানে মানে কেটে পড়ি।'

চন্দ্রাদি আর দেরী করল না। আমার সামনেই বালিশের তলা থেকে চিঠিটা বার করল। চিঠিটা খুলে একবার মনে মনে পড়ে নিল। তারপর খামে ভরে মুখটা বন্ধ করল। খামের উপরে তারাদার নাম ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিল।

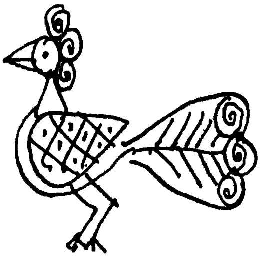
আমি পা বাড়ালাম অফিসের দিকে। সামনের সপ্তাহে মা-কে দেখতে একবার হৃদয়পুরে যেতে হবে। ওই সময় তারাদাকে চিঠিটা দিয়ে দেওয়া যাবে। মনে মনে এইসব কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে ডাকল চন্দ্রাদি। কি ভেবে কে জানে? আমি কাছে যেতেই চিঠিটা চাইল। সুবোধ বালকের মতো তখন চিঠিটা দিলাম। ভাবলাম চন্দ্রাদি হয়তো কোথাও ভুল টুল লিখেছে তা সংশোধন করে দেবে। আমার সেই ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিল চন্দ্রদি। আমার চোখের সামনেই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলল চিঠিটা। আমার বোধগম্য হল না হঠাৎ চন্দ্রাদি এরকম কাজ করল কেন? চিঠি দেওয়ার জন্য ডেকে চিঠি না দেওয়ার কারণটাই বা-কি? তাহলে কি আমাকে অবিশ্বাস করছে চন্দ্রাদি? মাথার মধ্যে এমন-ই অনেক প্রশ্ন তখন ভিড় করছে। দুটো কথা শুনিয়ে দেব বলে মুখ তুলতেই দেখি চন্দ্রাদির থমথমে মুখ, ঝড় বৃষ্টিব আগে পৃথিবীটা যেমন থমথমে দেখায় ঠিক তেমন-ই।

হঠাৎ চন্দ্রাদি একটা কাণ্ড করে বসল। আমার হাত দুটো ধরে কাতর স্বরে বলল—'তোর তারাদাকে বলিস, সে যেন চন্দ্রার কথা ভুলে যায়। তার চন্দ্রা মরে গেছে অনেক আগে। এখন সে আকাশের চন্দ্রা। সে চন্দ্রা আর যাই হোক 'রাধা' হতে পারবে না।



হুল

শোভন শেঠ



প্রেম বড় বিদঘুটে ব্যাপার। যে প্রেমে পড়েছে সেই জানে। কি সাংঘাতিক সব ব্যাপার-স্যাপার ঘটে যায়। প্রেম নীরবে এসে বিদ্ধ করে। তারপর ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। প্রেমের ফাঁসে প্রাণ হাঁসফাঁস করার অবস্থা হয়। এই যেমন সুন্দরের জীবনে হয়েছে। এমন জানলে কি সুন্দর প্রেমে পড়ত?

প্রেমের পথও বিচিত্র, ঘোরালো। কখনও সে আসে সরলগতিতে। আবার কখনও বক্রগতিতে। প্রেমে পড়া মানুষ আর বঁড়শি গেলা মাছ দুজনায় কোনও তফাত নেই। সুন্দরের এমন বঁড়শি গেলা মাছের মতো অবস্থা। ছটফট করছে। এমন জানলে কে টোপ গিলত! সুন্দর কি যে করে হায়!

সুন্দর সুশ্রী, সুন্দর। ফর্সা টিকালো নাক। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইট। বয়স আঠাশ। একটা বহুজাতিক সংস্থায় হাজার কুড়ি টাকার চাকরি করে। ভবিষ্যত ব্রাইট। কিন্তু বিধি বাম। ভগবান ব্যাটা একচোখা। কোনও মানুষকেই তিনি একসঙ্গে সব কিছু দেন না। একটা না একটা ঘাটতি রাখবেনই। সুন্দরেরও তাই। সব আছে। ফ্ল্যাট, ব্যাঙ্কে টাকা। বাবা ছোটবেলায় মারা গেছেন। মা বছর দুই হল গত হয়েছেন। এতে সুন্দরের কোনো ক্ষোভ নেই। এ অতি স্বাভাবিক। কিন্তু একচোখো ভগবান তার প্রেমের পথে কাঁটা ছড়িয়ে রেখেছেন। সে কলেজ লাইফে দু দু'বার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু দুটি প্রেমই তার কপালে চাঁটি মেরে কেটে পড়েছে।

সুন্দর প্রথম প্রেমে পড়ে কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়। কলেজের ক্যান্টিনে প্রতিদিনই বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করত। স্বপ্নেন্দু, বিকাশ, তিথি, জয়িতা সঙ্গে থাকত।

তিথি হঠাৎ একদিন বলল, এই সুন্দর, তুই কখনও প্রেমে পড়েছিস?

না রে, এখনও সেই সৌভাগ্য হয়নি।

ধ্যাৎ, বিশ্বাস হয়না। তুই ডুবে ডুবে জল খাস। খিলখিল করে হেসে উঠল তিথি।

হাসির কী হল শুনি? সুন্দর জ্বলে উঠল।

হাসব না! তুই এতো হ্যান্ডসাম! স্বপ্নালু চোখ, এতো সুন্দর লাল ঠোঁট। যে কোনো মেয়েই তোর প্রেমে পড়ে যাবে।

লজ্জায় সুন্দরের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। কি অসভ্য মেয়ে রে বাবা! এতোটুকু লজ্জা নেই। অবশ্য এসব নামী কলেজে যারা পড়ে তারা একটু এরকমই হয়।

জয়িতা খিলখিল করে হেসে উঠল। মজা পেয়েছে।

স্বপ্নেন্দু আর বিকাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একমুখ হাসি ছড়াল। আই লাভ ইউ সুন্দর, আই লাভ ইউ, তিথি হঠাৎ সুন্দরের আঙুল ছুঁয়ে বলল, কাম অন, একটা ডেটিং হয়ে যাক। সিনেমা না হয় রেস্টুরেন্ট।

সুন্দরের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক হানল। সেও মনে মনে তিথিকে পছন্দ করত। তিথিকে তার মনের কথা জানাতে পারেনি। কিন্তু তিথি যে এভাবে সবার সামনে প্রপোজ করবে ভাবতে পারেনি।

বিকাশের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে মুখে তুলে তিথি বলল, ওঃ গুড বয়, ভয় পেয়ে গেলে নাকি! যাক্‌গে আজ না হয় আমিই খরচা করব।

স্বপ্নেন্দু বলল, কি রে সুন্দর, যা তিথির সঙ্গে ঘুরে আয়।

আসলে স্বপ্নেন্দু, বিকাশ, জয়িতা সবারই বান্ধবী আছে। শুধু তিথি আর তার ছিল না। হৃদপিণ্ডের দোলাচলটা স্বাভাবিক গতি পেতে সুন্দর তিথির হাত ধরে বলল, চল তবে ঘুরে আসি।

সেই প্রথম প্রেমে পড়ল সুন্দর। মাস তিনেক মন্দ কাটল না। কিন্তু হঠাৎই একদিন কলেজে ক্যান্টিনেই তিথি তার বিয়ের কার্ড ধরিয়ে দিয়ে জানাল, তার দিদির ননদের মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আগামী রবিবার বিয়ে। তারা সবাই যেন যায়।

সবেমাত্র গরম কাটলেটটায় মুখ দিয়েছিল সুন্দর। বিষম খেল। ধাতস্থ হয়ে বলল, তুই তাহলে আমার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করেছিলি। তিথি হাসতে হাসত বলল, দুর মাইরি! তুই বড় সিরিয়াস। ভালোবাসা এরেই কয়। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে তার ইয়ারলি ইনকাম বারো লাখ। বিয়ের পরেই আমি মুম্বই চলে যাব।

বাই— বলে তিথি কোমর বেঁকিয়ে চলে গেল।

সেই প্রথম প্রেমেও ইতি পড়ল সুন্দরের।

তারপর থার্ড ইয়ারে দেবলীনার সঙ্গে আবার প্রেমে পড়ল সুন্দর। এবারেও দেবলীনাই এগিয়ে এলো। সুন্দর প্রথমটা ইতস্ততঃ করেছিল। কিন্তু মানুষের মন বড় বিচিত্র। বিশেষ করে রোমান্টিক মন। সুন্দরের মন রোমান্টিক। সুন্দররা বার বার ঘা খেয়েও আবার প্রেমে পড়ে যায়।

সুন্দর স্ট্যাটিসটিক্‌সে অনার্স নিয়ে পড়েছে। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। প্রফেসরদের আশা সুন্দর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে পারে। পরীক্ষার আর ছ'মাস বাকি। ঠিক এই সময়েই সুন্দর দেবলীনার প্রেমে পড়ে গেল। দেবলীনা তিথির মতো অতো মড নয়। সুন্দরী কিন্তু বিনয়ী, দরিদ্র ঘরের মেয়ে। প্রফেসর রাখার মতো পয়সা নেই। প্রেম করার সঙ্গে সঙ্গে দেবলীনা তার স্ট্যাটিস্‌টিক্সটাও সুন্দরের কাছে ঝালিয়ে নেওয়া শুরু করে। যদিও দেবলীনা পড়াশোনায় মোটামুটি।

আচ্ছা, তুমি কি বলতো, একদিন রেগে ওঠে সুন্দর।

কেন, কি করলাম। দেবলীনা অবাক।

কি করলাম মানে! তুমি ..... প্রেম করতে এসেও সেই স্ট্যাটিসটিক্সের বই খুলে আছো?

আঃ সুন্দর, প্লিজ, এখানটা বুঝিয়ে দাও, সুন্দরের বুকে মাথা রেখে দেবলীনা আবদার জানায়।

দেবলীনার আদুরে গলায় সুন্দর গলে যায়।

মিডিয়াম দেবলীনা স্ট্যাটিস্টিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পেল। সুন্দর অবশ্যই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

এরপরই দেবলীনা আর কোনো যোগাযোগ রাখল না সুন্দরের সঙ্গে।

সুন্দর এম এস সি'তে ভর্তি হল।

ফোনে ডাকলে দেবলীনা জানায়, তার সময় নেই।

একদিন স্বপ্নেন্দুই জানাল, তুই কি বোকা মাইরি?

কেন, কি করলাম?

গাধা কোথাকার? তুই ওর প্রেম চিনতে পারলি না। ও প্রেমের অভিনয় করে তোর মতো ভালো স্টুডেন্টের কাছে সব শিখে নিলে। এখন ও আবার নতুন লাভার ধরেছে। কেমেষ্ট্রির অনিমেষ। অনিমেষের বাবার চাকরি করে দেবার ক্ষমতা আছে। তবেই বোঝ মাইরি, তুমি কি প্রেমে পড়েছিলে।

প্রেম এতো স্বার্থপর! হতাশ কণ্ঠে সুন্দর বলেছিল।

চিরকালই স্বার্থপর বন্ধু, স্বপ্নেন্দু চলে গিয়েছিল।

সুতরাং দ্বিতীয় প্রেমেও ধাক্কা খেল সুন্দর।

কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। সুন্দরের ক্ষেত্রেও সে কথা সত্যি। দু'দুবার ব্যর্থ প্রেমের বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়েও তৃতীয়বার আবার প্রেমে পড়ল।

তবে এ প্রেম এলো বিচিত্র পথে।

অন্যদিনগুলো কাজে কর্মে কেটে যায়। কিন্তু ছুটির দিনগুলো কিছুতেই কাটতে চায়না। কাজের লোক, রান্নার লোক সব কাজ করে যায়। বাড়িতে সে বড় একা। কতো আর টিভি দেখে সময় কাটে। বিয়ের জন্যে পাত্রী দেখা শুরু হয়ে গেছে। আর প্রেম নয়, বিশুদ্ধ হিন্দু মতে বিয়ে করবে সে।

কিন্তু হাজার হলেও মন তার রোমান্টিক। নারীকণ্ঠ সে শুনতে ভালোবাসে। ইদানীং তার একটা রোগ হয়েছে। ফোনের ডিরেক্টরি থেকে মেয়েদের নামের ফোন নম্বর টুকে রাখে। সেই নম্বরে ডায়াল করে। আবার কখনও মনের ইচ্ছে মতো নম্বরেও ডায়াল করে। কোনো পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়। মহিলাকণ্ঠেরও রকমফের আছে। কণ্ঠ শুনেই বুঝে নেয় সুন্দর— কচি না ধাড়ি।

কখনও কচিকণ্ঠের আওয়াজ পেলেই সুন্দর বলে, আপনার নাম কি? আপনি কে যে

আপনাকে আমার নাম বলব? তারপরেই বাবাকে ডাকতে যায়। সুন্দর রিসিভার নামিয়ে রাখে।

একবার ফোনে কচি কণ্ঠের আওয়াজ পেতেই সুন্দর বলে, হ্যালো— আমি আপনার সঙ্গে ফোনে মিতালি পাতাতে চাই।

হোয়াট! তার মানে?

মানে এই আর কি? যেমন পেন ফ্রেন্ড হয়, এও তেমনি ফোন ফ্রেন্ড। বন্ধুত্ব যাকে বলে। ফোন ফ্রেন্ড-এ লিখতে বা পড়তে হয় না, শুধু শুনতে হয়।

কাঠি দিয়ে কান খুঁচিয়ে দেব হ্যাঁ। কানের বারোটা বেজে যাবে। ইয়ারকি হচ্ছে! আমি বাড়ির বড় বৌ।

উরিব্বাস। ভয় পেয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখে সুন্দর।

এইরকম প্রতি রবিবার আনসান ফোন করে সুন্দর।

একবার এক কচি কণ্ঠের হ্যালো শুনেই সুন্দর বলল, হ্যালো আমি আঠাশ, মাইনে ভালো।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভেসে এলো, কাগজে বিজ্ঞাপন দিন, আমি এনগেজ। দু'বছর চলছে।

একবার কচি কণ্ঠের আওয়াজ পেতেই সুন্দর বললে, হ্যালো, আপনি কি বাইশ? না, আমি বাইশ দুগুনে চুয়াল্লিশ। শরীর চুয়াল্লিশ, গলা বাইশ। প্রতিদিন ভোরে গানের রেওয়াজ করি। তাই গলাটা বাইশ বাইশ লাগে। কোকিলকণ্ঠী। তুমি কে গা, আমার বয়স জানতে চাচ্ছ? যত্তোসব। ফোন কেটে যায়।

শুধু কোকিলকণ্ঠী নয়, কর্কশ কাকের গলাও কম শোনা যায় না।

তা এইরকম এলোমেলো ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে সত্যি সত্যি সফল হল সুন্দর।

হ্যালো, কে বলছেন? আপনার নাম কী?

আপনার নামটা আগে বলুন।

আমার নাম কমলাসুন্দরী।

আমি সুন্দর। কিন্তু আপনার নামটা কি বিশ্রী। কমলাসুন্দরী না রেখে শুধু সুন্দরী রাখুন। ভালো লাগবে।

সুন্দর-সুন্দরী, মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল, জানেন, আপনার গলা শুনেই প্রেমে পড়ে গেছি। আপনি কি সুন্দর তাই না! আমিও খুব সুন্দরী। অমার বয়েস তেইশ। চোখ দুটো টানাটানা। মুখ যেন মাধুরী দীক্ষিত।

আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, সুন্দর হাসতে হাসতে জানাল।

কাল বিকেল পাঁচটায় ভিক্টোরিয়ায় মেন গেটের সামনে আসুন না। পরিচয় হবে। আমার খুব প্রেম করতে ইচ্ছে হয় জানেন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, কি করে চিনব

সবুজ শাড়ি পরে থাকব। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। মাথায় গোলাপ গোঁজা থাকবে।

ব্যাস ব্যাস, ঠিক পাঁচটায়।

পরেরদিন সুন্দর সত্যি সত্যি ভিক্টোরিয়ায় গেল। সবুজ শাড়ি পড়া একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। মাথায় গোলাপ গোঁজা। দূর থেকে মেয়েটির মুখ দেখেই ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। মুখটা ব্যাঙের মতো। মাথায় আধখানা টাক। যমও এর কাছে ফরসা।

উরি বাবা রে— বলে সুন্দর দিল এক ছুট।

কয়েকদিন মনমরা হয়ে থাকার পর আবার এলোমেলো ডায়াল করা শুরু করল সুন্দর।

হ্যালো, কে বলছেন—

গলাটা অতি সুন্দর। সুন্দর মোহিত হল। বলল, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

তাই নাকি? আপনার গলাটাও ভারি মিষ্টি। আপনি কি করেন?

চাকরি।

বয়স কত?

আটাশ।

আমি পঁচিশ। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। আপনার নাম কি?

সুন্দর।

বাঃ, খুব ভালো নাম, আমি অনন্যা।

হ্যালো অনন্যা, আগামী রবিবার দেখা করা যায় না?

হ্যাঁ, কখন, কোথায় বলুন?

রবীন্দ্রসদনে ঠিক রবি ঠাকুরের মূর্তির সামনে দাঁড়াবেন, কিন্তু কি করে চিনব?

আমি গোলাপী শাড়ি পরে যাব। গোলাপী ব্লাউজ। আপনি একটা পিঙ্ক কালারের জামা পরে আসবেন। তাহলে চিনতে পারব।

রবিবারে অনন্যার সঙ্গে আলাপ হল। অনন্যাকে দেখে সুন্দর বিমোহিত। চোখ দুটো কী গভীর। চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কোন অতলে হারিয়ে যাবে। ঠোঁট দুটো যেন চুম্বনের অপেক্ষারত। কাটালো মুখশ্রী। ফর্সা। খুব সাদাসিদে ব্যবহার। কোনো আধুনিকতা নেই। অহঙ্কার নেই। অনন্যা অনন্যাই। সে তিথি নয়, দেবলীনা নয়।

ঘন্টাখানেকের আলাপে মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি বরফের মতো প্রেম জমাট বেঁধে গেল। অনন্যা বাংলায় এম এ। বাবা পাত্র দেখছেন বটে। কিন্তু বাবাকে সে এবার জানিয়ে দেবে পাত্রের সন্ধান সে পেয়ে গেছে।

আবার কবে দেখা হবে সুন্দর?

তোমায় ফোন করব।

একদিন তোমার বাড়ি যাব।

নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আচ্ছা আমাকে দেখে তোমার সন্দেহ হল না আমি তোমায় কিছু মিথ্যে বলছি কি না? আমি তোমায় ঠকাতে পারি কি না?

কখনও নয়, অনন্যা জানায়। তোমার চোখ দেখলেই বোঝা যায়, তুমি ঠকতে পারো, কিন্তু কাউকে ঠকাতে পারো না।

তোমায় ফোন করব।

সপ্তাহের শেষে অনন্যার বাড়িতে ডায়াল করল সুন্দর।

হ্যালো—

সেই মিষ্টি গলা, হ্যালো, অনন্যা—

হ্যাঁ, আমি অনন্য, আপনি—

আরে, আমি সুন্দর, এর মধ্যেই ভুলে গেলে। আগামীকাল রবিবার মেট্রোর সামনে এসো। সিনেমা যাব।

ঠিক আছে, ক'টায় যাবো?

সাড়ে পাঁচটায়। পারলে টিয়াপাখি রঙের শাড়ি পড়ে আসবে। তোমায় ভালো মানাবে।

পরের দিন মেট্রোর সামনে যথাসময়ে চলে এলো সুন্দর। ঠিক পাঁচটার একটু পরে টিয়াপাখি রঙের শাড়ি পড়ে অনন্যা এলো।

এগিয়ে গেল সুন্দর। কাঁধে হাত রাখল অনন্যার। দুদিন আগে অ্যাডভ্যান্স কটিয়েছে।

সুন্দরের চোখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রইল অনন্যা, তোমাকে দারুণ লাগছে। তোমাকেই বা কিসে কম লাগছে! অনন্যার হাতের তালুতে চাপ দিল সুন্দর।

এরপর প্রতি রবিবার সুন্দর আর অনন্যা বেড়ায়। রেস্টুরেন্টে যায়। দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল।

সুন্দর বলল, এভাবে নয় অনন্যা, আর ভালো লাগে না। বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলা ভালো। আগামী রবিবার তোমার বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলব।

ঠিক আছে, আমি বলে রাখব।

পরের রবিবার। অনন্যাদের ফ্ল্যাটে এলো সুন্দর। কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই অবাক হল সে। এ সে কী দেখছে? আয়নায় প্রতিবিম্ব!

সুন্দর বসো, দুটি মূর্তিই একসঙ্গে বলল।

সুন্দরের সব গোলমাল হয়ে গেল। এদের মধ্যে কে অনন্যা?

সুন্দর আমি অনন্যা, আর ও আমার দিদি অনন্যা।

ততক্ষণে অনন্য ও অনন্যার বাবা-মা হাজির।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, অবাক হবার কিছু নেই। এরা দুটিই আমার যমজ মেয়ে। একই রকম দেখতে। কিছুতেই আলাদা করা যায় না। পাঁচ মিনিটের ছোট বড়। অনন্যা

বড়। অনন্য ছোট। নামও প্রায় একই দিয়েছি। দুজনে পোশাক পরে এক। দুজনের কণ্ঠস্বরও এক। দুজনেই বাংলায় এম. এ. পড়েছে।

মা বললেন, অনন্যা আমায় সব বলেছে। তুমি ওকে ভালোবাসো।

মিথ্যে কথা বাবা, দিদি মিথ্যে কথা বলেছে। সুন্দর আমাকে ভালোবাসে, আমিও সুন্দবকে ভালোবাসি।

কিছুক্ষণ পরেই সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল।

একইরকম দেখতে হওয়ার ফলে সুন্দর ঠকেছে। কখনও অনন্যাকে অনন্য ভেবেছে, আবার অনন্যকে অনন্যা। অনন্য প্রথম দিন ফোন পেযেই বুঝতে পেরেছিল দিদির প্রেমিক। আর একইরকম দেখতে হওয়ার ফলে সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে।

অনন্য বলল, আমি সুন্দরকে ভালোবাসি।

অনন্যা বলল, আমি সুন্দরকে ভালোবাসি।

সুন্দর প্রমাদ গুনল। সে যে কি করে। সে একসঙ্গে দুই প্রেমিকার ফাঁদে পড়ে গেছে।

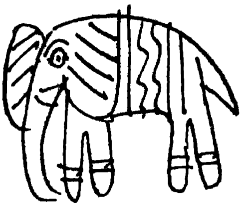
সুন্দর আর সময় নিল না। দ্রুত পায়ে ফ্ল্যাটের বাইরে চলে এলো। পেছন থেকে অনন্য আর অনন্যা ডাকল, সুন্দর—সুন্দব—

সুন্দর সামনে একটা ট্যাক্সি দেখেই হাঁক ছাড়ল, ট্যাক্সি—

ট্যাক্সি দাঁড়াতেই মুহূর্তে ভেতরে উঠে বলল, টালীগঞ্জ—

খরা ও সুবিমলের এক দিন

সৌমিত্র লাহিড়ী



সকালে চায়ের কাপ নিয়ে খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে সুবিমল মহা সমস্যায় পড়ে গেল। এমন জটিল সমস্যা কীভাবে সমাধান করবে ভেবে পেল না। গতকাল অফিস থেকে ফিরে আসার কিছুক্ষণ বাদেই নিতাই তার কাছে কথাটা পেড়েছিল। নিতাইকে মাথা নিচু করে হাত কচলাতে দেখে সুবিমল জিজ্ঞাসা করেছিল, কী রে, কিছু বলবি?

বাড়ি যাব, যদি কয়েক দিনের জন্য ছাড়েন।

কেনরে?

বৃষ্টি পড়ছে দাদাবাবু। বাড়িতে সামান্য কয়েক বিঘা জমি চাষ করতাম। তিন চার মাসের খাওয়া চলে যায়। যদি ছাড়েন—

ঠিক আছে, যাবি। বৌদিকে বলেছিস?

বলিনি। কালকে যাই?

তা-যা আবার আসবি তো, বৌদিকে বল।

হ্যাঁ দাদাবাবু।

সংক্ষিপ্ত কয়েকটি টুকরো কথা। কিন্তু নিতাই চায়ের কাপ নিয়ে চলে যাওয়ার পর থেকে সুবিমল ভেবে ভেবে কুল কিনারা করতে পারছে না। রাতে মণিদীপাকে বলবে বলবে ভেবেও কিছু বলেনি। শুনলে ও রেগে আগুন হয়ে যাবে।

সুবিমল ত্রাণ দপ্তরে উচ্চ পদস্থ অফিসার। বয়সের চেয়েও চাকুরির ভার বেশি। খরা এবার পশ্চিমবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে সাংঘাতিকভাবে গ্রাস করেছে। কয়েক মাস ধরেই খরা নিয়ে সুবিমল চিন্তিত। দীর্ঘ খরার পরে যখন সামান্য বৃষ্টি পড়ছে, আমন প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে। সামনের কয়েক মাস খুব দুঃসহ দিন অতিক্রম করতে হবে। চারধার থেকে ত্রাণকাজ চালানোর জন্য দাবি আসবে, টাকার বরাদ্দ অন্য কীভাবে কী করা যায় তা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে দফায় দফায় বৈঠক চলছে। স্বয়ং মন্ত্রী সাহেব কেন্দ্রের কাছে বিপুল ক্ষয় ক্ষতির হিসেব দাখিল করে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য দাবি করেছেন। গতকালই এম. আই. সি. সুবিমলকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছেন, কেন্দ্রের সমীক্ষক দল আসবে সুবিমলবাবু। আপনি ওদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখান। সুজলা সুফলা শব্দদুটি গ্রাম বাংলার গরিব মানুষের জীবনকে কেমন

বিদ্রুপ করছে তা একটু বুঝিয়ে বলুন। আর হ্যাঁ, একটা নোট তৈরি করবেন ভাল করে। ফ্যাক্ট ফিগারস্ দিয়ে। পরশু ওদের ডিনার দেব, সেখানে কায়দা করে প্লেস করতে হবে।

মন্ত্রী আরও অনেক কথা বললেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে খরা সমস্যা নিয়ে সুবিমলের সঙ্গে আলোচনা করলেন। এতে সুবিমলের একটু গর্বও হয়। মন্ত্রী তাকে নির্ভরযোগ্য ভাবেন। সুবিমলকে আর এক মন্ত্রী রেকমেণ্ড করে পাঠিয়েছিলেন, তাই তিনি নির্ভর করেন। সুবিমলও সাধ্যমতো মন্ত্রীর আশা-আকাঙক্ষা পূরণ করতে চেষ্টা করে। সে কাজের মানুষ।

বাড়ী ফিরে নোটটা তৈরি করবে ভেবেছিল সুবিমল। কিন্তু তা আর হয়নি। তার আগেই নিতাই তাকে বিপাকে ফেলেছে।

সুবিমল নিতাইকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে মানবিক কারণে। যা দিনকাল পড়েছে, বলতে গেলে সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষকেই ত্রাণের আওতায় আনতে পারলে ভালো হয়। সুবিমল তা বোঝে। তাই সে এক কথায় রাজি হয়ে গেছে।

নিতাই যখন বাড়ির কাজকর্ম রান্নাবান্না করতে আসে তখন কথা ছিল সে চলে গেলেও অন্য কাউকে দিয়ে যাবে। এ প্রশ্ন সুবিমলের মাথায় এসেছিল, কিন্তু সে তা করেনি। বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে মাঠে নামার গভীর সম্পর্ক, এখন তার বিকল্প লোক দিয়ে যাওয়ার কথা বলে লাভ নেই।

কিন্তু মণিদীপা ছাড়বে কেন। সে সোফায় ছাবিবশ বছরের লাবণ্যময়ী যুবতী শরীরটা আলতো করে এলিয়ে দিয়ে চায়ের কাপে ঠোঁট লাগিয়ে বলল, নিতাইকে ছাড়া চলবে না। ও সব ভ্যানভ্যানানি আমার ভালো লাগেনা।

'হুঁ'।

হুঁ। তুমি তো 'যা' বলেই খালাস। সংসারটা চলবে কিভাবে শুনি?

সমস্যার জটিলতা এখানেই। সংসারটা চলবে কিভাবে। রান্না করবে কে, বাজার করবে কে, দুধ আনবে 'কে, বাড়ি পাহারা দেবে কে, মণিদীপার শাড়ি ব্লাউজ বডিস থেকে শুরু করে বিছানার চাদর বালিসের কভার পরিষ্কার করবে কে? রাতে মশারি ঝেড়ে পরিপাটি করে টাঙাবে কে? এই সীমাহীন "কে" ছিল নিতাই। মণিদীপাকে বাড়িতে কিছুই করতে হয় না। সে একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে। মন্ত্রী মশাইয়ের একজন ঘনিষ্ঠ লোককে ধরে সুবিমল চাকরিটা করে নিয়েছে। বাড়িতে বসে বসে সময় কাটে না। উপরন্তু লাইফ নেই, মণিদীপার ঝকঝকে তকতকে ফিগারটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কলেজ জীবনে কফি হাউসে কাটত বেশির ভাগ সময়। আধুনিক দুর্বোধ্য কবিতা ও বিলিতি যৌন রসাসিক্ত নভেল নিয়ে বিতর্ক চলত ঘন্টার পর ঘন্টা। বিবাহিত জীবনের প্রথম ছ'মাসেই তার বিরক্তি ধরে গেছে। শক্তি-সুনীল-সমরেশ-শংকর-জাতীয় পদার্থে আর কতক্ষণ ডুবে থাকা যায়! তাই সে চাকরি করছে।

সুবিমল নরম গলায় বলল, কয়েকটা দিন চালিয়ে নাও, ব্যবস্থা একটা হবেই।

তোমার মত মেসের জীবনে আমি অভ্যস্ত নই। 'চালিয়ে নাও' আবার কী। আমি কি এখন হাঁড়ি ঠেলতে বসব?

চায়ের কাপ হাতে আলতোভাবে সোফায় বসলে মণিদীপাকে ভীষণ সুন্দর দেখায়। সুবিমল প্রতিদিন সকালে কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এই মনোরম দৃশ্যে আনন্দ পায় কিন্তু ক্রুদ্ধ মণিদীপার কঠিন চোয়াল ও মুখমণ্ডল যে রাস্তার ধারে কলপারে বৌ-ঝির জল নিয়ে ঝগড়া করার চেয়েও জঘন্য তা এই প্রথম অনুভব করল সুবিমল। এখন মণিদীপাকে বড় নিষ্ঠুর, হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণা বলে মনে হচ্ছে।

ওর যে লোক দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল?

তা ছিল, কিন্তু জরুরী তাগিদ।

জরুরি তাগিদটা কিসের। বাড়ি গিয়ে চাষ করবে না ছাই। ওর আবার জমি কিসের। না খেয়ে মরছিল। বাড়ি গিয়ে বৌয়ের শরীর চাটার শখ হয়েছে বাবুর।

'শরীর চাটার শখ' শব্দগুলো সুবিমলের কান লাল করে দিল। য়ুনিভারসিটিতে পড়া স্ত্রীর মুখে এমন শব্দ শুনে সুবিমলের মন ঘৃণায় রি রি করে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। শুধু আলতো করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল।

নিতাই জিনিসপত্র গুছিয়ে রওনা হওয়ার তাল করেছে। মণিদীপার নিষেধ সত্ত্বেও সুবিমল তার যাওয়া বন্ধ করেনি।

খবরের কাগজেও সেই খরার কথা। তিন কলাম জুড়ে ফেটে চৌচির মাঠের ছবি, তলায় ছোট্ট ক্যাপশান 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে।'

ধুত্তোর বলে সুবিমল স্নান করতে চলে গেল। মণিদীপার ক্রুদ্ধ চোয়াল একটুও নরম হয়নি। মুখের রেখায় রেখায় ছড়িয়ে আছে রাগ ও বিরক্তি।

খাওয়ার টেবিলেও বিশেষ কথাবার্তা হল না ওদের। সুবিমল যাবে বি.বা.দী. বাগে আর মণিদীপা পার্কস্ট্রীটে। দু'জনে একসঙ্গে বের হয়, তাতে মণিদীপার একটু লেট হয়ে যায়। বস্ অবশ্য তাকে কিছু বলে না। মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোক রেকমেণ্ড করে পাঠিয়েছিল। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। সরকারি টেণ্ডার লোন লাইসেন্স কত কী আছে।

মণিদীপার দেরিতে আসা নিয়ে কোম্পানির জুনিয়র একসজিকিউটিভ বসকে একদিন কিছু অভিযোগ করেছিল। কিন্তু কর্তা কান দেননি। শুধু বলেছিলেন, মিষ্টার চ্যাটার্জি, রাস্তায় পাথর দেখলে আমি ফুল ছিটিয়ে দিই, কে বলতে পারে কোন দিন পাথর শিব হয়ে দেখা দেবে না। মিঃ চ্যাটার্জি আর কোন কথা বলেনি। কথাটা মণিদীপার কানেও গিয়েছিল। মণিদীপা অবশ্য ছোট সাহেবের কথার কোন গুরুত্বই দেয়নি। সে জানে কার দৌড় কত দূর।

আজ সুবিমল একটু আগেই বেরিয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল আসবে। সমীক্ষক দলকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে কিছু বাড়তি কথা লিখিয়ে নেবে মনে মনে ভেবেছিল সুবিমল। মন্ত্রীকে খুশি করার সুবর্ণ সুযোগ। কায়দামতো নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে ভবিষ্যতে লাভ হতে পারে। আর কিছু না হোক সল্টলেকে জমির কথাটা পাড়া যাবে।

রাস্তায় গাড়িতে চলতে চলতে সুবিমল গভীর খরায় ডুবে গেল। তথ্যগুলোর ওপর আবার চোখ বুলিয়ে নিল। নোটের কয়েকটা জরুরি শব্দ এক টুকরো কাগজের ওপর লিখে রাখল। আর তখনই খচ্ করে সুবিমলের মনে পড়ল 'জরুরি তাগিদাটা কিসের? বৌয়ের শরীর চাটার শখ হয়েছে বাবুর'।

চাটা শব্দে শরীরটা ঘিন ঘিন করে উঠল আবার। কিন্তু সুবিমল, অস্ফুট স্বরে বলে উঠল শরীর চাটলেই বা ক্ষতি কী? আমি চাটি না তোমার শরীর। শরীর না চাটলে মানব জন্মও তো বন্ধ হয়ে যাবে, সেখানেও তো খরা দেখা দেবে। সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে আবার সেই অস্ফুট স্বরে সুবিমল বলে উঠল, খোঁজ নিলে দেখব হয়ত কলেজ য়ুনিভারসিটির দুচারজন বন্ধুও তোমার শরীর চেটেছে....। এখন তা নাকি মেয়েরাই....

সিগারেটে আবার টান পড়ল জোর। গাড়ি মহাকরণের সামনে থামতেই ঝটপট নেমে পড়ল সুবিমল। নেমেই সোজা চলে গেল মন্ত্রীর ঘরে। নোটের স্কেচটা দেখিয়ে নিল। বৃষ্টিপাতের সর্বশেষ হিসেবটা মন্ত্রীকে জানিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে ফিরে এলো নিজের চেম্বারে। মাথার মধ্যে গজগজ করছে কিছু পরিসংখ্যান। জমির হিসেব, ফসলের খতিয়ান, গরু ছাগলের হিসেব, পঞ্চায়েত কীভাবে কাজ করছে, ত্রাণ কীভাবে চলছে সব নখদর্পণে নিয়ে সুবিমল ডেকে পাঠাল পরেশবাবুকে।

পরেশবাবু নিতাইকে এনে দিয়েছিল। মেদিনীপুরের এক অজ গ্রাম থেকে। পরেশবাবুর বাড়ি সেখানে।

— নিতাই কি ভাগ চাষ করত পরেশবাবু?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, সামান্য চার-পাঁচ বিঘা হবে হয়ত।

নিতাইকে এনে দিয়ে পরেশবাবু সুবিমলের মোটামুটি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। পঞ্চায়েত হওয়ার পর থেকে গ্রামের মানুষ সস্তায় আর বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং গ্রামেই অনেক কাজ হচ্ছে পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে। সেখানেই অনেকে কাজ পায় বলে গ্রাম ছেড়ে শহরে 'কাজের লোক' হয়ে আসার প্রবণতা কমে যাচ্ছে।

নিতাইকে পরেশবাবু অনেক আশ্বাস দিয়ে নিয়ে এসেছিল। এখন নিতাই চলে যাচ্ছে শুনে তার মুখেও চিন্তার ছায়া পড়ল।

'কী হবে পরেশবাবু, মণিদীপা মানে আমার মিসেস আবার এসব কাজ একদম পারে না।

'সে তো পারবেন না স্যার। আমি দেখছি, দুটি দিন চালিয়ে নিন স্যার।

এ রকম কথা শুনলে মণিদীপা হয়ত ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠত, 'চালিয়ে নিন আবার কী?' কিন্তু সুবিমল তা করল না। সে ম্যানেজ করে চলা বোঝে। দিনকাল বদলে গেছে। মন্ত্রী সামলে ইউনিয়ন সামলে সুনাম করা চাট্টিখানি কথা না।

সুবিমল নরম করে বলল, কাইগুলি যদি একটু দেখেন। খুব ট্রাবল দিচ্ছি।

পরেশবাবু চলে যাওয়ার দেড় ঘন্টা পরে কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল নিয়ে খরা দেখতে বেরিয়ে পড়ল সুবিমল। সমীক্ষক দলের একজন অফিসারকে কথায় কথায় খরা কীভাবে তার সংসারেও প্রবেশ করেছে তা বলে ফেলল সুবিমল।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে সমীক্ষক দল দেখল বাংলার খরা। নোট নিল আর বেশির ভাগই সুবিমলের কথায় ডিটো দিল। একটা পরিতৃপ্তির ছাপ ক্রমশ পরিষ্কার ফুটে উঠল সুবিমলের মুখমণ্ডলে।

কিন্তু আবার সেই বাড়ি আর মণিদীপা আর নিতাই। নিতাই নেই, জামা কাপড় খুলে নিজেকেই গুছিয়ে রাখতে হল।

সারা সন্ধ্যা একটা চাপা ক্ষোভ নিয়ে সুবিমল মন্ত্রীর 'খরার ক্ষয়ক্ষতি' বিষয়ক নোট তৈরি করল। এক সময় খাওয়ার ডাক পড়ল। সুবিমল হাত ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল দশটা সাত। তাড়াতাড়ি রেডিওটা চালিয়ে দিল। খবর হচ্ছে। প্রায় এক মিনিট ধরে সমীক্ষক দলের সফর সূচির কথা খবরে বলল।

সুবিমলের নামটাও শোনা গেল। গোঁফের রেখায় একটু মৃদু কম্পন হল সুবিমলের। মণিদীপা নামটা শুনে বলল, আজকাল মাঝেমধ্যেই রেডিওতে নামটা শুনছি যে, একেবারে ভি. আই. পি হয়ে গেলে দেখছি।

ঐ আর-কি।

খাওয়ার টেবিলে পরেশবাবুর সঙ্গে আবার লোক দেওয়ার কথাটা আলোচনা হয়েছে তা বলবে বলে সুবিমল প্রস্তুত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বলা হল না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে নিজে থেকে কথা পাড়তে।

মণিদীপার অপেক্ষায় না থেকে নিজেই মশারিটা টাঙিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল সুবিমল। দরজা লাগানো ঝামেলা মণিদীপার। শোয়ার আগে একটু সময় লাগে তার। কিছু প্রসাধন, কিছু পোশাক বদল করে নরম বিছানায় ঢোকা তার দীর্ঘকালের অভ্যাস। বিয়ের পরে কিছু বাড়তি ঝামেলা বেড়েছে মাত্র। মিনিট পনের পর মণিদীপাও সুবিমলের পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় শুয়ে পড়ল।

পাশাপাশি দুজন শুয়ে আছে নির্বাক। প্রতিদিনের ব্যবহারিক সম্পর্কও স্থাপিত হল না। সুবিমল মন্ত্রীর নোটের বিষয়গুলি মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছে। কাল অফিসে গিয়ে সুস্মিতাকে দিয়ে টাইপ করাতে হবে, দুপুরের মধ্যে মন্ত্রীকে দিতে না পারলে মন্ত্রী ডিনারে কায়দা করে প্লেস করতে পারবেন না। এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

অচলায়তন ভাঙল মণিদীপা— কী, বাবুর রাগ হয়েছে?

মণিদীপার নরম মাখনের মত হাতটা সুবিমলের বুকের লোমের ফাঁকে ফাঁকে ঘুর ঘুর করতে লাগল। মণিদীপার তীব্র আকর্ষণও সুবিমলকে চঞ্চল করতে পারল না। শরীরে কোন অনুভূতি জাগল না।

মণিদীপা আবার আদুরে গলায় বলল, জানো অফিসে একটা কাণ্ড হয়েছে।

কী, নিস্পৃহ গলায় সুবিমল জিজ্ঞাসা করল। অন্যদিন হলে সঙ্গে সঙ্গে সে মণিদীপাকে কাছে টেনে নিয়ে কপট ভয়ের ভঙ্গিতে বলত, কেউ প্রেম নিবেদন করেছে?

কিন্তু সুবিমল কিছুই করল না। আজ সে ক্লান্ত বিরক্ত। তার মাথাব মধ্যে ঘুরছে খরা আর, শরীর চাটার শখ।

আমাদের বেয়ারা কার্তিক, ছুটি চাচ্ছিল কয়েকদিন। সাহেব কিছুতেই দেবে না। শেষকালে আমি গিয়ে বলাতে দিয়ে দিল।

ও, সুবিমল ঠাণ্ডা গলায় বলল।

ওরও নাকি একই প্রবলেম। খরায় সব জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে দেশে। একটু বৃষ্টি পড়েছে, যদি কিছু চাষ করা যায় তাই ছুটি চাই।

তুমি গেলে কেন?

সুবিমলের গলায় সামান্য কৌতূহলের ঢেউ।

এমনি, আসলে তুমি চলে যাওয়ার পর নিতাই অনেক কান্নাকাটি করে ওর ঘরের কথা সব বলছিল। আমার অফিসে চল্লিশ মিনিট লেট হয়ে গেল। অফিস গিয়েই কার্তিকের কথা শুনলাম। সত্যি খরার পর বৃষ্টি নামাতে ওদের চোখ মুখ পাল্টে গেছে।

মণিদীপার মানসিক বিবর্তন সুবিমলকে বিস্মিত করল। সকালে নিতাইকে ছাড়ার সময় যেমন ক্রুদ্ধ হিংস্র মনে হয়েছিল এখন আর তা মনে হচ্ছে না। কেন এমন পরিবর্তন? সুবিমল রাগ করে চলে গিয়েছিল বলে? নাকি কার্তিককে ছেড়ে দিলে সরাসরি কোন ঝামেলা পোয়াতে হবে না বলে?

মধ্যবিত্ত মানসিকতা বড় বিচিত্র, সুবিমল আবিষ্কার করল। কেরনীবাবুরা ট্রাম-বাস সময় মত না চললে দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে দীর্ঘ অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে পরিবহন সংস্থার বাপবাপান্ত করে, আবার নিজের দেরি করে অফিসে আসার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পায় না। মণিদীপাও তাই করল। নিতাইকে ছাড়তে তার আপত্তি কিন্তু কার্তিকের পক্ষ নিতে তার দ্বিধা হয় নি। আবিষ্কারের আনন্দে সুবিমল মণিদীপার চিবুকে একটা চুম্বন করতে গেল, কিন্তু পারল না। কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে উঠল। মাথায় মধ্যে কিলবিল করে উঠল সেই তিনটি শব্দ শরীর চাটার শখ।

প্রাকৃতিক খরায় ভয়ংকর বিপর্যয় কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলকে ঠিকঠিকভাবে বোঝাতে পেরেছে সে। হয়ত কিছু আর্থিক সাহায্যও মিলবে, মন্ত্রী মহোদয় বাহবা দেবেন। কিন্তু, সুবিমল ভেবে পেলনা, মণিদীপার মানসিক খরা দূর করবে কে, শিক্ষার সেই বিশল্যকরণী কোথায় মিলবে।

সুবিমলের নিস্তেজ শরীরে আজ আর আনন্দ নেই। মণিদীপা পাশ ফিরে শুলো।

ভ্রষ্টা

জাহান আরা সিদ্দিকী



মেয়েটিকে ওয়াহিদের নষ্ট মেয়েমানুষ বলেই মনে হয়েছিল। সিনেমা জগতে যে মেয়ে এক্সট্রার কাজ করে সে যে কখনও ভাল থাকতে পারে, এটা তার বিশ্বাস হত না।

ফিল্ম লাইনের মেয়েদের সম্পর্কে বরাবরই ওয়াহিদের একটা বাজে ধারণা ছিল। কখনও কোনোদিন যে ও সে জগতের মেয়েদের সংস্পর্শে আসবে ভাবতেও পারেনি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তাদের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। সেবার সে ভার্সিটিতে এম. এ পরীক্ষা দেবে। লেখাপড়ার চাইতে সে ছিল রাজনীতিতে বেশি সক্রিয়। রাজনীতির চক্রে পড়ে লেখাপড়ার দিকে খুব একটা মনযোগ দিতে পারেনি। রাজনীতিতে এত বেশি জড়িয়ে পড়ল যে একসময় সে একজন ছোটখাট ছাত্রনেতা বনে গেল। সেসময় ছাত্রদের হলে কয়েকটা মারামারির ঘটনায় দুতিনজন ছাত্র আহত হল। পুলিশ হলে হানা দিল। এঘটনায় ওয়াহিদ জড়িত না থাকলেও পুলিশী নির্যাতনের ভয়ে দলের অন্যান্যদের সঙ্গে হল ছেড়ে পালাল। ঢাকার আশেপাশের ছাত্ররা গ্রামে আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে গিয়ে উঠল। কিন্তু ওয়াহিদ বেশ বিপদে পড়ে গেল। তার বাড়ি দিনাজপুর। কমপক্ষে দুদিনের পথ। সে কেবল ভাবছিল ঢাকাতে কোথায় লুকিয়ে থাকবে। এমন সময় সিনেমা জগতের মাশরুর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা।

মাশরুর ভাই বয়সে তার চেয়ে অনেক সিনিয়র হলেও প্রায়ই তারা একসঙ্গে আড্ডা দিত। ফিল্মে ডিরেক্টর হিসেবে অল্প বয়সেই মাশরুর ভাই বেশ নাম করেছিলেন। সব শুনে তিনি বললেন, তুমি এক কাজ করো, মুখে দাঁড়ি গোঁফ লাগিয়ে আমার অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজে লেগে যাও।

চমৎকার প্রস্তাব। ওয়াহিদ এক কথায় রাজি হয়ে গেল। নাম-ধাম বদলিয়ে গোঁফ-দাড়ি রেখে সে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সিনেমা জগতের বেশ কিছু লোকজনের কাছে সে পরিচিত হয়ে গেল। এমন সময় একদিন একটা মেয়েকে তার চোখে পড়ল। শুটিং-এর সময় নায়িকার সখীর ভূমিকায় আর চার পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে সে নাচছিল। ওর প্রতি দৃষ্টি পড়ার কারণটা সম্ভবত ওর রূপ। দলের অন্যান্য মেয়ে তো বটেই এমনকি নায়িকার চেয়েও তাকে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। দীর্ঘাঙ্গী, শ্যামলা রঙ, বড় বড় পল্লবঘন কালো চোখ, চমৎকার মিষ্টি হাসি, সব মিলিয়ে ওর দিক থেকে দৃষ্টি ফেরানো কঠিন।

ওয়াহিদের পাশে মাশরুর বসেছিলেন। ততদিনে তার সঙ্গে ওয়াহিদের ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। দুজনেই মাঝে মধ্যে মেয়েদের নিয়ে টুকটাক রসিকতা করা শুরু করেছিল। মাশরুর মেয়েটির প্রতি ওয়াহিদের মনোযোগ দেখে বললেন, কি ভাই, রেশমীকে তোমার মনে ধরেছে মনে হচ্ছে।

মাশরুর দিকে তাকিয়ে ওয়াহিদ বলল, ঐ সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটির নাম রেশমী বুঝি?

— হ্যাঁ।

— কী করে বুঝলেন আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম?

— কারণ একে বাদ দিলে বাকি আর একটিও মেয়ের দিকে তাকানো যায় না।

— তাহলে ওসব মেয়েকে কেন নিলেন?

— ওদের চেহারা ফটোজিনিক। ছবিতে ওদেরকে সুন্দরই দেখাবে।

নায়িকাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওয়াহিদ বলল,

— আপনার নায়িকাকেও সামনাসামনি খুব একটা সুন্দর দেখাচ্ছে না অথচ ফিল্মে বেশ সুন্দর দেখায়।

— সেজন্যই তো ওরা ক্যামেরা-ম্যানদের সঙ্গে খাতির রাখে। নইলে ক্যামেরাম্যান তাদের চেহারা ছবিতে আকর্ষণীয় করে ফুটিয়ে তুলবে না।

ওয়াহিদ হাসতে হাসতে বলল, এভাবে ব্লাকমেইল করেই বুঝি আপনারা এসব মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করেন?

উনিও হাসতে হাসতে বললেন, কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া যায় না। লাইম লাইটে আনার জন্য ওরা কি আমাদের ক্ষণিকের আনন্দ বিতরণ করবে না?

— এসবই চলে এখানে, তাই না?

— শোনো, সিনেমা জগতে মেয়েদের প্রতিষ্ঠা পেতে হলে অনেক পুরুষকে খুশি করে উপরে উঠতে হয়। যাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু দরিদ্র, বা সাধারণ ঘর থেকে যেসব মেয়েরা আসে তাদেরকে তো দৈহিকভাবে এক্সপ্লয়েট করাই হয়। আর ওরাও এসব জেনে শুনে এগিয়ে আসে।

— কেন?

— খ্যতি, গ্লামার। খ্যাতির নেশায় কত মেয়ে যে স্বেচ্ছায় প্রোডিউসার আর ডাইরেক্টরকে প্রলোভিত করে, তুমি তা বিশ্বাস করতে পারবে না। দোষ তো কেবল ডাইরেক্টর আর প্রোডিউসারেরই হয়। কিন্তু মেয়েরা এমন সব প্রস্তাব নিয়ে আসে যা অকল্পনীয়। আমার নিজের জীবন থেকে বলি, রাতে বহুবার মেয়েদের ফোন পেয়েছি। তারা আমাকে কী বলেছে জানো? প্লিজ আমাকে আপনার ছবিতে একটা রোল দিন। আপনি আমার কাছে যা চাইবেন আমি তাতেই রাজি।' অনেক সময় আমিই কৌশলে ওদের ম্যানেজ করি। বলি, ফটো পাঠিয়ে দিন।

— বলেন কী! এভাবে মেয়েরা বলে?

মাশরুর সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল,

— পুরুষরাও সেসব সুযোগের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করে। সিনেমায় শুধু ডাইরেক্টর কেন, সব লেবেলেই এক অবস্থা। এ লাইনে নারীদেহের ব্যবসাটা খুব বেশি হয়। সত্যি বলতে কি একবার আমি নিজেই পিম্পের মতো আচরণ করেছিলাম। হয়েছিল কি জানো, যে প্রোডিউসার ফিল্মটা করবে সে আমাকে আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল যে ছবির নায়িকাকে তার চাই। ফাইনান্স ছাড়া আমিই বা ফিল্ম বানাই কী করে? ভেবে দেখলাম, নায়িকাও ঐ মার্কা। অযথা আমিই বা হাই মরালিটি নিয়ে বসে থাকি কেন। শেষ পর্যন্ত নায়িকাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ফিল্মটা বানালাম।

— সিনেমা জগতের প্রভাবশালী লোকজন দেখছি এদের ভালই এক্সপ্লয়েট করছে।

মাশরুর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল,

— শোনো, মেয়েগুলো ফিল্মে তাদের চেহারা দেখানোর জন্য এতই ব্যাকুল হয়ে থাকে যে স্পট বেয়ারাটা পর্যন্ত সুযোগ নিতে চায়। একদিনের কথা বলি। হুট করে রুমে ঢুকে দেখি দুজন স্পট বেয়ারা একগাদা মেয়ের ফটো ঘাঁটছে আর ফোন নম্বর দেখে দেখে ফোনে বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আমি যে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছি সে তা টের পাইনি।

— এর কারণ কী?

— ওরা ফিল্ম লাইনের প্রভাবশালী লোক সেজে মেয়েগুলোকে সিনেমায় রোল দেয়ার লোভ দেখিয়ে তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করতে বলছিল। এভাবে তারা হয়তো বেশ কিছু মেয়েকে উপভোগও করে।

— মেয়েগুলো যখন সস্তা পাবলিসিটির জন্য নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিচ্ছে তখন ওদের আর দোষ কী। কথোপকথনের মাঝপথে মাসরুর চেঁচিয়ে বলল, 'কাট।'

নায়িকা ও সখীদের নাচ সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। মাশরুর ওদের কাছে ছুটে গিয়ে হাত মুখ ঘুরিয়ে কীসব নির্দেশ দিতে থাকলেন। রেশমী ইতিমধ্যে মেয়েগুলোর কাছ থেকে সরে এসে এক কোণায় দাঁড়িয়ে রইল। ওর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। স্পট বয় এসে সবার হাতে ঠোঙ্গা ধরিয়ে দিয়ে গেল। মাশরুর কাজ শেষে আবার ওর পাশে এসে বসলেন। ওয়াহিদ মিষ্টির ঠোঙ্গা খুলে মিষ্টি আব সিঙ্গাড়া খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, এক্সট্রাদেরও বুঝি নায়িকা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে?

— অবশ্যই। আর সেজন্য ওরা অনেককে প্লিজ করতে সচেষ্ট হয়।

ওয়াহিদ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি মেলে রেশমীর দিকে তাকিয়ে বলল, এদের সঙ্গে পতিতাদের এমন কী তফাৎ, শুনি? পতিতারা অর্থের জন্য দেহদান করে বেড়াচ্ছে আর এরা খ্যাতি, গ্লামার এসবের জন্য—

— শুধু ওসবই নয়, সেই সঙ্গে প্রাপ্তিযোগও আছে।

ইতিমধ্যে চায়ের কাপ হাতে বয়টা পাশে এসে দাঁড়াল। ওয়াহিদ একহাতে চায়ের কাপটা নিয়ে ফের সেটের দিকে তাকাল। লাইট জ্বলে উঠেছে। মেয়েগুলো সমানে নেচে যাচ্ছে। মেয়েদের অঙ্গভঙ্গির প্রতি চোখ রেখে ওয়াহিদ মন্তব্য করল, এদের পেশায় দেখছি ডবল লাভ। সিনেমা জগতের গ্লামারটা উপভোগ করা গেল আবার ক্যামোফ্লেজের অন্তরালে অর্থ উপাজন করা হল।

— ওদের শেষ বয়সটা কিন্তু বেশ কষ্টের। যৌবন ফুরিয়ে গেলে কেউ ওদের দিকে ফিরে তাকায় না। এমনও অনেক এক্সট্রা রয়েছে যাদের বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষা করে খেতে হয়।

মাশরুমের কণ্ঠে সমবেদনার ছোঁয়া। ওয়াহিদ তাতে প্রভাবিত হল না। তার কথার উত্তরে যুক্তি দেখিয়ে বলল,

— কিন্তু প্রথম বয়সে ওরা নিশ্চয় অনেক টাকা কামায়।

— ফিল্ম জগতের সব এক্সট্রারাই তো কমপ্রোমাইজ করে না। যারা করে সাধারণ পতিতাদের চাইতে তাদের কদর অনেক বেশি। ফিল্মে কাজ করে এ গ্লামারের নেশায় পয়সাওয়ালা অনেক পুরুষই এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক, অর্থবান ব্যক্তি এদের পেছনে টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করে না।

ওয়াহিদ রেশমীর দিকে তাকাল। উজ্জ্বল আলোয় ওর মুখখানা অপূর্ব দেখাচ্ছে। এই মেয়েটি এরকম একটা বাজে পেশায় আছে সেটা বিশ্বাস করতে তার কষ্ট হচ্ছিল। মেয়েটির চেহারায় এমন একটা নিষ্পাপভাব আছে যে ওকে এ লাইনের মেয়ে বলে মনে হয় না। একটু ইতস্তত করে সে বলল, আচ্ছা রেশমীও কি টাকার বিনিময়ে—

মাশরুর সশব্দে হেসে বলল, বুঝেছি তুমি মুখে স্বীকার করছ না বটে কিন্তু ওকে তোমার মনে ধরেছে। তা সঙ্কোচ না করে সরাসরি বলে ফেল, আজ রাতেই আমি ওকে তোমার রুমে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

বিব্রত হয়ে ওয়াহিদ বলল, দেখুন, আমি ঠিক ওভাবে কোনো মেয়েকে নিয়ে ভাবতে পারি না।

— কেন, তুমি কি পুরুষ নও?

আহা তাই বলে অচেনা একটা মেয়ের সঙ্গে এভাবে— দূর, তা কী করে হয়? একটা মেয়ের সঙ্গে প্রথম প্রথম কথাবার্তা হবে, ঘনিষ্ঠতা জমবে তারপর—

মাশরুর হাসতে হাসতে রসিকতা করে বলল,

— তুমি দেখছি নীতিবান পুরুষ। হ্যাঁ, ব্যাপারটাতো আগে লক্ষ্য করিনি। এতদিন হয়ে গেল কোনো মেয়ের দিকে তোমাকে এগুতে দেখলাম না। এখানে বেশীদিন সংযম রক্ষা করতে পারবে না। আর কদিন যাক দেখবে—

মাশরুরের কথার মাঝখানে ওয়াহিদ বলে উঠল,

— আমার তা মনে হয় না।

— এখনই তোমার নজর পড়েছে রেশমীর দিকে। ওর ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিচ্ছ।

— ঐ সুন্দরী মেয়েটি এ লাইনে কেন এল সে ব্যাপারে কি কৌতূহল জাগতে পারে না?

চায়ের কাপটা পাশের টুলে রেখে মাশরুর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছলেন। তারপর ওয়াহিদের দিক ফিরে বললেন, রেশমী আমার ঘরেও কয়েক রাত কাটিয়েছে।

— আপনাকে পটিয়ে নায়িকা হতে চায় বুঝি?

উনি এক মুহূর্ত থেমে কী যেন চিন্তা করে বললেন,

— আমি প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। ওর যখন নায়িকা হবার মত সব যোগ্যতা আছে, তখন ঐ ধান্দাতেই সে নিশ্চয় রাজি হয়েছে। নইলে এ মেয়ে আমার সঙ্গে বিছানায় আসতে রাজি হবে কেন? কিন্তু শুনলে অবাক হবে ও সে লাইনে কোন কথাবার্তাই বলল না। টাকার ব্যাপারে ওকে বরং বেশী উৎসাহী বলে মনে হল। এখানকার যে কজনের কাছে ও গেছে সবাই মোটামুটি মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়েই ওকে নিয়ে গেছে। নায়িকা হবার তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ওর আছে বলে মনে হয় না। ও সে ম্যানুপুলেট করে এতদিনে নায়িকা না হোক অন্তত সহ-নায়িকার ভূমিকাতে উঠতে পারত।

মাশরুরের সঙ্গে কথাবার্তার পর থেকে ওয়াহিদ রেশমীকে কিছুটা উৎসুক দৃষ্টি নিয়েই দেখত। সুটিং এর ফাঁকে ওর সঙ্গে দু চারটে কথাবার্তাও হত। কখনও সে দেখত রাতে সিনেমার হোমরা চোমরাদের গাড়ি করে ও বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা ওকে বাড়িতে নামিয়ে দেওয়ার নাম করে কোথায় নিয়ে যেত অনুমান করা কঠিন ছিল না। ওয়াহিদকে দেখতে পেলে রেশমী সুন্দর একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে সালাম দিত। সে দৃষ্টিতে তাকে প্রলোভিত করার কোনো ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করেনি। একদিন শুটিং সেরে রাতে ওকে নামিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল ওয়াহিদের উপর। গাড়িতে একা রেশমীর পাশে বসে তার অসোয়াস্তি হচ্ছিল। রেশমী কিন্তু সপ্রতিভভাবেই তার সঙ্গে কথা বলতে থাকল। বলল, জানেন, আপনাকে আমার সিনেমা জগতের মানুষ বলে মনে হয় না। ওয়াহিদ চমকে উঠল। ও কিভাবে তার আসল পরিচয়টা টের পেয়ে গেল? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,

— একথা কেন মনে হল?

রেশমী রহস্যের হাসি হেসে উত্তর দিল,

— আপনি এদের মতো নন।

— তুমি কী বোঝাতে চাইছ?

— ও আপনি বুঝবেন না।

গাড়িটা ততক্ষণে পুরোনো ঢাকার একটা সংকীর্ণ গলিতে প্রবেশ করেছে। অসংখ্য রিক্সার

মাঝে তাদের গাড়িটা বার বার থমকে যাচ্ছিল। ওয়াহিদ মনে মনে একটু বিরক্ত হল। কিন্তু রেশমীর দিকে তাকিয়ে সে বিরক্তি ভাবটা আর রইল না। রাস্তার বাতির আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। সুটিং-এর সময় ও যে উগ্র মেকআপ করেছিল, বাড়ি ফেরার আগে সেটা উঠিয়ে নিয়েছে। মেকআপহীন চেহারাটার মধ্যে স্নিগ্ধ একটা আভা চোখদুটোতে আশ্চর্যরকমের সরলতা। কে বলবে এই মেয়ে বিভিন্ন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে অর্থ উপার্জন করে? ওকে দেখলে মধ্যবিত্ত ভদ্র কোনো পরিবারের মেয়ে বলে মনে হয়। বয়সও খুব বেশি হবে না। খুব বেশি হলে উনিশ বিশ। এই বয়সে মেয়েটি এই লাইনে এসে নিজেকে অধঃপতনের পথে ঠেলে দিয়েছে। অথচ ওর নায়িকা হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। স্রেফ অর্থের লোভে এপথে এসেছে।

— আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি বরং এখানেই নেমে যাই। বাকি পথটা হেঁটে বা রিক্সার চলে যাবে।

গাড়িটা বেশ কিছুক্ষণ যানজটে আটকে থাকায় লজ্জিত মুখে বলে রেশমী। অজান্তেই ওয়াহিদের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, না না, কষ্টের কী আছে। তুমি মেয়েমানুষ একলা এত রাতে কীভাবে যাবে?

রেশমী যেন চমকে তার দিকে তাকাল। ওব দৃষ্টিতে বিস্ময়, কিছু বেদনাবোধ। ওয়াহিদের কণ্ঠের সহানুভূতির সুর ওকে যেন স্পর্শ করেছে। ওয়াহিদ সেটা অনুভব করে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য প্রশ্ন করল,

-- কে কে আছে তোমার বাড়িতে?

— বাবা, মা আর ছোট তিন ভাই-বোন।

— তোমার ভাইবোনরা কী করে?

— ছোট বোনটা ক্লাশ এইটে পড়ে, বাকিরাও স্কুলে।

— তুমি পড়াশুনা করছ না?

— আর হল কই। ক্লাশ নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম।

এটুকু বলে বেশমী হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল। গভীর চিন্তার রাজ্যে ও চলে গেছে। এই মুহূর্তে ওয়াহিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ও যেন সচেতন নয়।

— তোমার বাবা কি চাননি তুমি লেখাপড়া করো?

ভাবনার রাজ্য থেকে ফিরে এসে রেশমী বলল,

— বাবার খুব শখ ছিল আমি বড় হয়ে স্কুলে কিংবা কলেজে পড়াব।

— তাহলে পড়া ছেড়ে দিলে কেন?

মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ যেন শুনতে পেল ওয়াহিদ।

— আপনার জীবনে আপনি যা হতে চান সেটা কি হতে পারেন? জীবন কি আপনার হাতের মুঠোয়?

রেশমীর উত্তরে একটা ধাক্কা খেল ওয়াহিদ। একেবারে দার্শনিকের মতো কথা বলছে রেশমী। তাইতো, ওয়াহিদ কি কখনও কল্পনা করেছিল রাজনীতির লাইনে এসে সে লেখাপড়া অবহেলা করবে? কত শখ ছিল বড় হয়ে ডাক্তার হবে, বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমাবে। কিন্তু কীভাবে যেন সে পথ থেকে সে সরে গেল। কিন্তু রেশমীর মতো মেয়ে এসব উপলব্ধি করল কীভাবে?

— রেশমী, এতবড় কথা কে শিখিয়েছে তোমাকে?

— শুনুন, আমি হয়তো আপনার মতো অত লেখাপড়া শিখতে পারিনি, কিন্তু যতটুকু দেখেছি সে অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি তো হয়েছে।

— সেটা কী?

— জীবনে ছোট্ট ছোট্ট কিছু ঘটনা আপনাকে কোথায় স্রোতের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সে আপনি নিজেও জানেন না। আপনি অসহায় দৃষ্টি মেলে সব দেখতে থাকবেন, বুঝতে পারবেন কিন্তু করার কিছুই থাকবে না। ওয়াহিদ স্তম্ভিত হয়ে রেশমীর দিকে তাকিয়ে রইল। রেশমীর মুখে নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি। ও হঠাৎ জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ড্রাইভারকে বলল, এখানে নামিয়ে দিলেই চলবে।

ওয়াহিদ বলল, কোন বাড়িটা তোমাদের?

— আর খানিকটা গলির ভেতর ঢুকতে হবে। অত সরু গলিতে গাড়ি ঢুকবে না। আচ্ছা আসি।

বলতে বলতে ও গাড়ি থেকে নেমে গেল। ওয়াহিদ সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে ওর পিছু নিল। রেশমী ফিরে তাকিয়ে বলল, আপনি চলে যান। ওয়াহিদ বলল, আমি তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব। বলা যায় না পাড়ার বখাটে ছেলেপিলে.......

রেশমীর মুখে বিদ্রূপের হাসি।

— আমি অত ভাল মেয়ে নই সে আপনি জানেন। তাছাড়া পাড়ার ছেলেরা আমাকে চেনে, অযথা উত্যক্ত করবে না। বরং গাড়িটা ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে যানজট হবে।

— ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

সেদিন থেকে রেশমীকে ওয়াহিদ যেন একটু অন্যদৃষ্টিতে দেখতে লাগল, মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু রহস্য আছে যা নিদারুণভাবে তাকে অকৃষ্ট করে। পরদিন শুটিং-এর ফাঁকে রেশমী তার কাছে এসে বলল,

গতরাতে আপনি আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে এতটা সজাগ ছিলেন দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমার ব্যাপারে কেউ এতটা দুশ্চিন্তা করবে এ আমি ভাবতে পারিনি।

রেশমীর কথাগুলো ওয়াহিদকে দুর্বল করে ফেলল। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে ওর সঙ্গে সে টুকটাক কথা বলতে শুরু করল। এরই মধ্যে একদিন সংবাদ পেল যে তার দলের

এক নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে ফেলেছে। সে রাতে সিনেমা জগতের একজনের বাড়ীতে বড়সড় পার্টি ছিল। ফুলে ফুলে ছাওয়া লনের পাশের বড় বড় গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মৃদু আলো জ্বলছিল। পাশে ছোট্ট বিদেশি প্রজাতির বাঁশগাছগুলো বসন্তের বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল। কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বা চেয়ারে বসে গ্লাস হাতে গল্পে বিভোর হয়ে গিয়েছিল। বেয়ারা দুজন হাল্কা পানীয় ও মদ পরিবেশন করতে করতে ছুটোছুটি করছিল। আকাশে বড়-সড় উজ্জ্বল চাঁদ। লনের একপ্রান্তে মিউজিক বাজছিল। সব মিলিয়ে রোমান্টিক একটা পরিবেশ। ওয়াহিদ এমনিতেই কখনও অতিরিক্ত মদ পান করত না। কিন্তু সেদিন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকায় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ল। তার কিছুক্ষণ পরই রেশমী এসে তার সামনে দাঁড়াল। আজ হাল্কা গোলাপী রঙের সাদা বুটিওয়ালা জামদান শাড়ি পরেছে সে। গলায়, কানে, হাতে সামান্য গয়না। দীর্ঘ চুল পিঠময় ছড়িয়ে রয়েছে। রেশমীর সৌন্দর্য তার মনের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ওকে ওয়াহিদ বিছানায় নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। ওর দিকে ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে জড়ানো গলায় বলল, রেশমী আজ রাতে তুমি—

তার কথাটা শেষ হল না। তীব্র শ্লেষের সঙ্গে রেশমী বলে উঠল, শেষ পর্যন্ত আপনি, আপনিও সেই একই দলে— ছিঃ। অথচ আমি আপনাকে অন্যরকম ভেবেছিলাম, মন থেকে শ্রদ্ধা করেছিলাম।

রেশমীর দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা। ওর মুখটা রাগে আরক্তিম হয়ে উঠেছে। লজ্জায়, সঙ্কোচে কুঁকড়ে গেল ওয়াহিদ। মদের ঘোর কেটে যেন বাস্তবে ফিরে এল। রেশমী ততক্ষণে তার সামনে থেকে সরে গেছে।

পরদিন সেটে রেশমীর চোখের দিকে সে তাকাতে পারছিল না। গতরাতে মদের ঘোরে নিজের আচরণ স্মরণ করে লজ্জায় মাথাটা নত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রেশমীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার পরও ওর উপর রাগ হয়নি বরং ওর কাছে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল। নানান ছলে সারাটা দিন রেশমীর কাছ থেকে ওয়াহিদ দূরে দূরে থাকল। একবার খেয়াল করল রেশমী দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে এমন ভান করল যেন ওকে তার চোখে পড়েনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বেড়ানো গেল না। রেশমী সন্ধ্যার দিকে তার সামনাসামনি এসে দাঁড়াল। ওর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে চোখ সরিয়ে নিল সে। রেশমী মৃদু কণ্ঠে বলল, সরি, গতরাতে আপনাকে ওভাবে কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি। আপনি তো অন্যায় কিছু করেননি। আমি ওধরনেরই মেয়ে। কিন্তু কেন জানি আপনাকে আমি ওরকম ভাবতে পারি না। ওয়াহিদ এতক্ষণে ওর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল,

— তুমি ঠিকই করেছিলে রেশমী। আমি অধঃপতনের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, তুমি শাসন করে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিলে। ঐ কঠোর আচরণটুকু আমার প্রাপ্য ছিল।

কিন্তু অত বড় বড় কথা তো আমার মুখে সাজে না। আমি নিজেই যেখানে—

কথাটা শেষ না করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করল রেশমী। ওর চেহারায় বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

— কেন, রেশমী, কেন তুমি এপথে—

রেশমী গভীর দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকাল। সে চোখের দৃষ্টিতে কী দেখল সেই জানে। মৃদুকণ্ঠে বলল, আজও কি আপনি আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেন?

— গাড়িটা গলিতে আবার যানজট সৃষ্টি করবে না তো?

রেশমী হেসে বলল, আজ আমাকে গাড়ি ড্রপ দেবে না। বাসে করে ফিরতে হবে। আপনি যদি যেতে চান তাহলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

— কখন যাবে তুমি

— আমার কাজ শেষ, এখনই ফিরব।

ওয়াহিদ তাকিয়ে দেখল রেশমী শুটিং-এর পোশাক আশাক ছেড়ে ইতিমধ্যে হলুদ রঙের একটা তাঁতের শাড়ি পরে নিয়েছে। মুখে প্রসাধনের কোনো প্রলেপ নেই।

— চলো বেরিয়ে পড়ি।

— আপনাকে আর একটু কষ্ট দেব। ফেরার পথে কাঁচা বাজার হয়ে যেতে হবে।

— ঠিক আছে, আমার সময়ের অভাব নেই।

রেশমী তাকে সঙ্গে নিয়ে কাঁচা বাজারে ঢুকল। আলু, মরিচ, তেল থেকে শুরু করে একগাদা সওদা দুহাতে ঝুলিয়ে বলল, চলুন।

ওয়াহিদ হাতটা ভারী ব্যাগের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ওটা আমাকে দাও।

— আমার অভ্যেসটা নষ্ট হয়ে যাবে। রোজ রোজ তো আপনি আর আমার বোঝা বইবেন না।

জোর করে ওর হাত থেকে খানিকটা বোঝা হাতে তুলে নিয়ে ওয়াহিদ বলল, রোজ তুমি বাজার করো নাকি?

— রোজ সময় পাই কোথায়? দু তিনদিনের বাজার একবারে করে ফেলি। চলুন বাস স্ট্যান্ডে যাই।

— আজ আমি তোমাকে ট্যাক্সিতে নিয়ে যাব।

— অযথা টাকা খরচ করবেন। অবশ্য বাসে যেতে নিশ্চয় আপনার কষ্ট হবে। ঠিক আছে।

সেদিনের মতো ওরা সরু গলির মুখটাতে নেমে পড়ল। ততক্ষণে রাস্তার পাশের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু গলির মুখের ল্যাম্প পোস্টটির বাল্ব নষ্ট। ক্ষীণ আলোতে গলিটা ঠিকমতো চোখে পড়ছে না। মনে হল রেশমী অন্ধকার গলিতে চলতে ফিরতে অভ্যস্ত।

রেশমী সামনের দিকে চলতে চলতে বলল, আপনি আমার পিছু পিছু আসবেন। সাবধানে হাঁটবেন, বাঁদিকে একটা ড্রেন আছে।

ড্রেনটা ওয়াহিদ দেখতে পেল না তবে উৎকট একটা গন্ধ নাকে এসে প্রবেশ করল। আশপাশের জীর্ণ বাড়িঘর থেকে চিৎকার আর চেঁচামেচির শব্দ কানে এল। বেশ কিছুটা হাঁটার পর রেশমী ভগ্নপ্রায় একটা বড় দালানের সামনের গেটে এসে থামল। দালানের প্রজ্বলিত আলোয় এদিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেক পুরানো আমলের দালান। লোহার গেটে মরচে ধরে আছে। রেশমী তার দিকে ফিরে বলল, আপনার খুব অসুবিধা হচ্ছে না তো? আপনাকে এখানে এভাবে আনাটা ঠিক হয়নি।

— তুমি যদি রোজ এ পথ ধরে হেঁটে আসতে পার তাহলে একদিন কি আমি আসতে পারব না?

— ভেতরে আসুন।

গেটের ভেতরে ঢুকে দালানটা পেরিয়ে একেবারে পেছন দিকটাতে চলে এল রেশমী। একটা বিশাল জামগাছের আড়ালে জীর্ণ একতলা একটা ছোট্ট দালান। বাইরের অধিকাংশ জায়গায় সিমেন্টের আস্তর খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। ভয় হয় কখন বাড়িটা ধ্বসে পড়বে। রেশমী এই বাড়িতে থাকে একথা ভাবতে কষ্ট হল তার। ততক্ষণে রেশমীর কড়া নাড়ার শব্দে একটি মেয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ে। চেহারাটা রেশমীর মতো, কিন্তু রঙটা কালোর দিকে। রেশমী ওয়াহিদকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার ছোট বোন রুনা।

রেশমী আর ওয়াহিদের তার হাত থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে রুনা ভেতরে চলে গেল। ঘরের এককোনায় নড়বড়ে একটা টেবিলের সামনে বসে দুটো কিশোর পড়ছিল। ওয়াহিদকে দেখে পড়া ছেড়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। রেশমী তাকে বলল, বসুন।

ছোট্ট ঘরটার এককোণে পুরানো তিন চারটে বেতের চেয়ার রাখা ছিল। তারই একটাতে সে বসে পড়ল। রেশমী কিশোর বয়সী দুজনার দিকে দেখিয়ে বলল, আমার ভাই। তারপর কড়া সুরে ধমক দিয়ে বলল, কিরে তোরা পড়া ছেড়ে ওদিকে তাকিয়ে রয়েছিস কেন?

ঠিক এসময় ভেতর থেকে একজন পুরুষমানুষের কাশির শব্দ পাওয়া গেল। সেইসঙ্গে নারীকণ্ঠে কেউ একজন বলে উঠল, রেশমী ফিরেছিস?

— হ্যাঁ মা।

বলতে বলতে সে পুরনো পর্দাটা সরিয়ে অন্যঘরে চলে গেল। একটু পরই ফিরে এসে বলল, চলুন বাবা-মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

ওয়াহিদ ওর পেছন পেছন পাশের ঘরটাতে ঢুকল। মাঝারি আকারের ঘরের কোণে একটা চৌকিতে একজন মাঝবয়সী লোক লুঙ্গি পরে শুয়ে ছিলেন। ওয়াহিদ সালাম দিয়ে

তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ভালমতো তার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। লুঙ্গির নীচ থেকে তার পায়ের অংশদুটো নেই। রেশমী পরিচয় করিয়ে দিল, বাবা।

ঘোমটা পড়া রেশমীর মা বাজার সওদাগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রেশমী বলল, মা চা দাও এককাপ।

ওয়াহিদ বাধা দিয়ে বলল, আজ থাক, অন্য একদিন খাব।

ওর মা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। রেশমী বলল, ঠিক আছে থাক।

ঘরের ভেতর এক পলক তাকিয়েই ওয়াহিদ বুঝল এই একঘরে রাতে সবাই মিলে শোয়। মাত্র দুটো রুমের মধ্যে এদের বসবাস। ঘরের সবকিছুর মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। রেশমীর বাবা ওয়াহিদকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মেয়েটা আপনাদের ওখানে চাকুরী করে বুঝি? ওকে একটু দেখে শুনে রাখবেন। জানেন কত স্বপ্ন ছিল ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে—

রেশমী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বাবা, এসব কথা এখন থাক।

— তোকে নিয়ে আমার স্বপ্নের কথাটা বলছিলাম।

তিক্ত হাসি হেসে রেশমী বলল, স্বপ্নতো আর কখনও পূরণ হবে না। কী দরকার অযথা সে স্বপ্নের কথা আলোচনা করে।

কিন্তু স্বপ্ন না দেখলে আমি বাঁচব কী নিয়ে? দেখিস তুই, আমার বিশ্বাস আছে তুই অনেক বড় নায়িকা হবি। পড়াশোনা হল না তো কী হয়েছে। ফিল্ম লাইনে তুই ভাল করবি।

— চলুন, ওঘরে যাই।

ওয়াহিদ রেশমীর সঙ্গে পাশের ঘরে এসে বসল। ওর ছোটভাই দুটো ফের পড়া বন্ধ করে আগের মতো তাদের দিকে রইল। রেশমী বলল, আবার পড়া ফাঁকি দিচ্ছিস?

ওয়াহিদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি অন্য একদিন আসব, আজ আসি।

রেশমী তাকে দরজার বাইরে জামগাছটা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, একলা ফিরতে পারবেন তো? কাউকে সঙ্গে দেব?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ওয়াহিদ জিজ্ঞেস করল,

— কীভাবে তোমার বাবার—

— বাবা অফিসের কেরানী ছিলেন। দৌড়ে বাস ধরতে যাবার সময় পা পিছলে পড়ে যান। বাসের চাকাদুটো তার পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়।

— সেই থেকে এ সংসারের সব দায়-দায়িত্ব তুমি বহন করছ, তাই না?

রেশমী উত্তর দিল না। ম্লান আলোতে ওয়াহিদ দেখল ওর চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে চোখে ঘুম এল না ওয়াহিদের। বিছানায় ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করতে লাগল। রেশমীর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। রেশমীর সংগ্রামী কঠিন

জীবন, সংসারের জন্য ওর আত্মত্যাগ সবকিছু মিলিয়ে ওর জন্য কোমল এক অনুভূতি তার মধ্যে জেগে উঠল। ওকে যে নষ্ট মেয়ে ভেবেছিল, সেটা স্মরণ করে এখন সে নিজেকে ধিক্কার দিল। মনে হল ও মোটেই সস্তা মেয়ে নয়। নিজের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে এই বয়সে সংসারের জন্য রোজগারে নেমেছে। এরপর সেটে গেলে ওয়াহিদ ওর সঙ্গে গল্প করত। দু-একজন এ নিয়ে তার সঙ্গে রসিকতাও করত। একদিন দুপুরে ও খাচ্ছিল, ওয়াহিদ হুট করে সেখানে হাজির হল। ওর টিফিন বক্সের দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। দুটো পাউরুটির টুকরো আর আলুভাজি। বেচারি এত পরিশ্রম করে অথচ ভালমতো খেতেও পায় না। কেন জানি রেশমীর সংগ্রামময় জীবনের পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে করল তার। এরপর থেকে সে ইচ্ছে করেই ওর বাবার নাম করে কখনও ছোট ভাইবোনদের জন্য মিষ্টির প্যাকেট কিংবা ফলমূল পাঠাত। প্রথম দু একদিন সঙ্কোচভরে রেশমী এসব গ্রহণ করলেও প্রতিবাদ করে একদিন বলল, কেন আপনি আমার পেছনে শুধু শুধু টাকা খরচ করছেন? বিনিময়ে আমি তো আপনাকে কিছুই দিতে পারব না।

— রেশমী তুমি আমাকে যা দিয়েছ এর বেশি আর কিছু চাইবারও নেই।

রেশমী তার কথাটার অর্থ বুঝল না কিংবা বুঝেও বিশ্বাস করতে পারল না।

— কী দিয়েছি আমি আপনাকে?

— সে তোমায় বুঝে নিতে হবে। সব কথাই কি মুখে বলতে হয়?

রেশমীর মুখে আবার সেই বেদনার ছায়াটা ফিরে এল। কি যেন সে ভাবছে। আঙ্গুলের মধ্যে শাড়ির পাড়টা ক্রমাগত জড়াচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, জানেন, আজ রাতে আমাকে ফটোগ্রাফারটার সঙ্গে শুতে হবে নইলে ও ফিল্মে আমার চেহারাটা খারাপ করে দেবে। ওয়াহিদ ওর দিকে তাকাল। ও হাসছে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে আক্রোশ। ও যেন তার মধ্যে ওর প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে চাইছে।

কিন্তু ওয়াহিদের মনের মধ্যে ঘৃণার বদলে সহানুভূতি জেগে উঠল। কোমলকণ্ঠে বলল, কেন তুমি নিজেকে এত ঘৃণা করো? শোনো, চুরি করলে, ঘুষ খেলে সমাজে আমরা তাদের অত খারাপ বলি না অথচ তোমাদের কাজটাকে সবচেয়ে জঘন্যভাবে চিহ্নিত করি। তোমরা তো কাউকে ধোঁকা দিচ্ছ না বা বঞ্চিত করছ না, স্রেফ কিছু সার্ভিস দিয়ে টাকা কামাচ্ছ। তাও তোমার নিজের জন্য নয়, কতগুলো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে। এতে এত খারাপ বোধ করছ কেন?

রেশমী উত্তর না দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওয়াহিদ জিজ্ঞেস করল, একাজ করতে তোমার খারাপ লাগে তাই না?

রেশমী তিক্ত হেসে উত্তর দিল, এই জঘন্য কাজ করতে কি কারো ভাল লাগে?

— তাহলে কীভাবে—

— বাধ্য হলে অনেক কিছু করা যায়। প্রথম প্রথম মনটা বিদ্রোহ করে উঠত। এখন আর তা হয়না, অভ্যেস হয়ে গেছে।

— সংসারের জন্য এতটা স্যাক্রিফাইস করলে তুমি?

রেশমী ওয়াহিদের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, কেউ সেটা বুঝবে না। কী হত আজ আমি এভাবে উপার্জন না করলে? ছোটবোনটা লেখাপড়া বন্ধ করে হয়তো এই একই পেশায় আসত, ছোটভাই দুটো গুণ্ডা বদমাইশ হয়ে পাড়ায় পাড়ায় মস্তানি করে বেড়াত।

— ঠিক তাই। তুমি নিজের কষ্টের বিনিময়ে ওদেরকে ভালপথে রেখেছে। ব্যাপারটাকে কেন এভাবে দেখতে পারছ না?

— আপনি সত্যি আমাকে ঘৃণা করেন না?

— আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো তো, কী মনে হয়?

রেশমী গভীর দৃষ্টিতে ওয়াহিদের চোখে চোখ রাখল। সে দৃষ্টিতে ওর প্রতি যে অনুভূতি লেখা ছিল সেটা দেখে যেন ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই শুটিংটা এক্ষুনি শুরু হয়ে যাবে।

এরপর যখনই ওয়াহিদ রেশমীর সেটে যেত ওকে দেখে রেশমীর চোখদুটোতে খুশীর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ত। নিঃশব্দে দুজনের মধ্যে চোখে চোখে কথা হয়ে যেত। কিন্তু মুখে কথা হত না। ইতিমধ্যে ভার্সিটির গণ্ডগোল মিটে গেল। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে ঝগড়াটা ছিল নেতারা মধ্যস্থতা করে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। ওয়াহিদের ছাত্রাবাসে ফেরার সময় হয়ে গেল। এর আগের দিন রেশমীকে সন্ধ্যায় বাইরে খেতে নিয়ে গেল সে। রেশমী রেষ্টুরেন্টে বসে সঙ্কোচভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ওয়াহিদ জিজ্ঞেস করল, কী দেখছ?

— যদি আপনার কোনো চেনা লোক এসে দেখে ফেলে?

— কী হবে তাহলে?

— আপনার দুর্নাম হবে না তো?

— ও নিয়ে আমি কেয়ার করি না। কিন্তু আজ তোমাকে আমি একটা কথা বলব।

রেশমী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। ওয়াহিদ তাকে সব কথা খুলে বলল। সে যে সিনেমা জগতের কেউ নয়, বিশেষ কারণে তাকে এখানে এতদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল, সব তাকে খুলে জানাল। সেই সঙ্গে এও জানাল যে এখন তার ফেরার সময় হয়েছে।

রেশমী বিস্মিত দৃস্টি মেলে সব শুনছিল। ওয়াহিদ থামতেই বলে উঠল, আপনার আচার আচারণ দেখে প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল আপনি এ জগতের নন।

— আমি ফিরে যাচ্ছি তবে প্রায়ই তোমাকে দেখতে আসব।

রেশমী একমনে আইসক্রীম খাচ্ছিল, মাঝপথে ওয়াহিদের কথা শুনে খাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছিল। আইসক্রীমের বেশ খানিকটা অংশ গলে বাটিতে জমছিল। সেটা আবার সে খেতে শুরু করল।

— কী ভাবছ রেশমী?

— আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই না?

— কে বলেছে? আমরা সবসময় দেখা করব। আর একটা কথা মনে রেখো, যখনই তোমার কোনো সমস্যা হবে, তুমি আমাকে যোগাযোগ করবে। আমি তোমার পাশে দাঁড়াব।

— কী অধিকারে সে সাহায্য চাইব?

ওয়াহিদ গভীর দৃষ্টিতে ওর চোখে চোখ রেখে বলল, আমার উপর তোমার সব অধিকার আছে।

রেশমীর দুচোখ জলে ভরে উঠল। এই প্রথম সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কান্নায় ওর সমস্ত দেহটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ওয়াহিদ বাধা দিল না। ও কেঁদে যদি খানিকটা হাল্কা হয়, হোক। রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরুবার সময় রেশমী আবদার করে বলল, আমি একটা অনুরোধ করলে রাখবেন?

— বলো।

— এসব রাজনীতি ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দেবেন। রাজনীতি করে যতসব টাউট লোকজন। আপনি অনেক বড় দরের মানুষ, আপনাকে এদের সঙ্গে মানায় না।

— সত্যিই তুমি এটা চাও?

— হ্যাঁ।

— আমি রাজনীতি ছেড়ে দিলাম।

রেশমী যেন তার কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না, খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখদুটো।

— এত সম্মান কেউ আমাকে দেবে কখনও ভাবতে পারিনি।

— এ সম্মান তোমার প্রাপ্য, রেশমী। বাবা মা থেকে শুরু করে অনেকেই চেষ্টা করেছিল এ রাজনীতি ছেড়ে লেখাপড়ার জগতে আমাকে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু পারেনি। অথচ জানো আমি ভাল ছাত্র ছিলাম। ঠিকমতো লেখাপড়া করলে আজ আমি অনেক ভাল চাকরি করতাম। কিন্তু কী ভয়ানক নেশায় যে ডুবে গিয়েছিলাম।

— সে নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন তো?

— পারব শুধু তোমার জন্য।

সত্যিই ভার্সিটিতে ফিরে গিয়ে ওয়াহিদ রাজনীতি ছেড়ে দিল। দলের বন্ধু-বান্ধবরা বেশ অবাক হয়ে গেল। অনেকে ভাবল পুলিশের ভয়ে কিছুদিন লুকিয়ে থেকে তার মধ্যে পরিবর্তনটা

এসেছে। দলের লোকজন জোরাজুরি করল। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকল। এর মাঝে কয়েকদিন রেশমীর সঙ্গে দেখাও করল, কিন্তু পরীক্ষা এগিয়ে আসাতে লেখাপড়ায় ভীষণভাবে মন দিল, তাই রেশমীর সঙ্গে ততটা যোগাযোগ রইল না। একদিন হঠাৎ রেশমীকে দেখার তীব্র বাসনা জেগে উঠল। পড়াশোনার একফাঁকে সেটে গেল রেশমীর খোঁজে। রেশমী সেদিন সেটে আসেনি। স্পট বয়টা বলল, ওনার শরীর খুব খারাপ শুনেছিলাম, কদিন থেকেই তো আসছে না।

ঘড়ির দিকে তাকাল ওয়াহিদ। আজকে লাইব্রেরীতে না গেলেই নয়। আগামী পরশুর পরীক্ষার ব্যাপারে একটা বই সংগ্রহ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু রেশমীকেও দেখার ইচ্ছেটা ত্যাগ করতে পারল না। ভাবল লাইব্রেরীর কাজ সেরে সন্ধ্যার দিকে রেশমীর বাড়িতে যাবে।

ওয়াহিদ বিকেল হলে নিজের রুমে বসে গভীর মনযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছিল। দরজায় টোকার শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল। মাশরুর ভাই দরজার অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তার চোখ মুখ থমথমে। অথচ উনি প্রাণোচ্ছল একজন মানুষ। দেখা হলেই পরিহাসছলে কিছু একটা রসিকতা করেন। আজ রসিকতার ধারে কাছে না গিয়ে সোজা বলে বসলেন, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। ওয়াহিদ রেশমীর বাড়ীতে যাবে ঠিক করেছে। এই অসময়ে আবার এ কি প্রস্তাব? কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা সে তাকে জানাতে চাইল না। এমনিতেই রেশমীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা নিয়ে তিনি রসিকতা করেন। মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে বলল,

— আজ পড়াশুনোর বড্ড চাপ, কোথাও বেরুতে চাচ্ছি না।

— একজন মৃত্যুর আগে তোমাকে বার বার দেখতে চাইছিল, আমার মনে হয় তার মৃতদেহটার পাশে অন্তত তোমার দাঁড়ানো দরদার।

— মারা গেছে! কে?

অবাক হয়ে ওয়াহিদ মাশরুর ভাইয়ের দিকে তাকাল। মাশরুর ভাই তার চেহারার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতে একটু দ্বিধা করলেন। ওয়াহিদের মনের ভেতরটা অজানা আশাঙ্কায় কেঁপে উঠল।

— কথা বলছেন না কেন?

— রেশমী আজ দুপুরে মারা গেছে। খুব দ্রুত মারা গেল, তোমাকে খবর দেওয়ার সময়ও পাইনি। ওয়াহিদের কণ্ঠস্বরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল, কী বললেন?

তার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মাশরুর বললেন,

— তুমি শক্ পাবে জানতাম। ওর প্রতি তোমার অনুভূতির কথা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। মেয়েটি বড় অসহায় আর ভাল ছিল। ওয়াহিদ ততক্ষণে চেয়ারে বসে পড়েছে। মাশরুর ভাই তার খাটের পাশে বসলেন। অনেকক্ষণ দুজনে কেউ কথা বলতে

পারল না। একরাশ নীরবতার পর ওয়াহিদ নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল? মাশরুর ভাই আবার ইতস্তত করছেন। সম্ভবত এমন কোনো কথা যা সঙ্কোচের কারণে বলতে পারছেন না। ওয়াহিদ আবার বলল,

— প্লিজ আমাকে সব খুলে বলুন।

মাশরুর আস্তে করে বললেন, জানই তো কীভাবে ও অর্থ উপার্জন্ন করত। কিন্তু মেয়েটা গর্ভনিরোধ ব্যবহারে সম্ভবত পটু হয়ে উঠতে পারেনি। কোনো এক হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে গর্ভপাত করিয়েছিল। অধিক রক্তপাতে শেষ পর্যন্ত—

মাশরুর কথাগুলো শেষ না করে থেমে গেলেন। ওয়াহিদ তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পুরো ব্যাপারটা তার কাছে এতই অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল যে বাস্তব বলে মনে হচ্ছিল না। মাশরুর আপন মনে বলতে থাকলেন, ওদের সংসারের অবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। ভাবছি ওর ছোট বোনটাকে রেশমীর জায়গায় কাজ দেব।

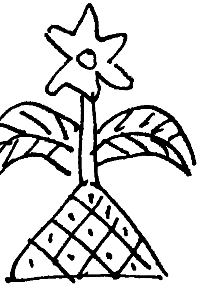
—চলুন যাই।

ওয়াহিদ কেমন ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। মাশরুর তাকে সঙ্গে করে রেশমীদের বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেই দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমার পাশ কাটিয়ে রেশমীর বাড়ি পৌঁছলেন। আজ রাস্তায় অনেক লোকের ভিড়। ভিড় ঠেলে মৃতদেহের সামনে গিয়ে যখন ওরা দাঁড়াল তখন মুখের কাপড়টা উঠিয়ে রেশমীর মুখ দেখানো হচ্ছে।

ওর মুখটার দিকে ওয়াহিদ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন ঘুমিয়ে রয়েছে রেশমী। ওর মুখে আজ নেই বিন্দুমাত্র ক্লান্তির ছাপ। পরম প্রশান্তির ছাপ সে মুখে, ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসি। চোখ দুটো বোজা। এত পবিত্র একটা মৃত মুখ সে আগে কখনও দেখেনি।

আত্মপ্রতিকৃতি

নীলঞ্জন চট্টোপাধ্যায়



ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নলিনী উদাসীনভাবে আকাশ দেখছিল। তার মাথায় এল সেই লাইনটা "আকাশ ছড়ায়ে আছে আকাশে আকাশে—'।

সম্প্রতি ভীষণ মনোযোগ দিয়ে জীবনানন্দ পড়ছে। জয়িতার কাছ থেকে পেয়েছে বইটা। উপহারই বলা যেতে পারে। বইমেলায় সে আর জয়িতা প্রিয় বইয়ের খোঁজে এ স্টল— সে স্টল উড়ে বেড়াচ্ছিল। একটা স্টলে পেয়ে গেল স্বাস্থ্যবান বইটি। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, আব্দুল মান্নান সম্পাদিত "নির্বাচিত জীবনানন্দ।" ....৪৫০ টাকা! বইটা হাতে ধরে অনিশ্চিতভাবে পাতা উলটে যাচ্ছিল। পকেটে তো অত টাকা ছিল না। জয়িতা কীভাবে বুঝল নলিনীর সাধ ও অসহায়তা! নিজের ব্যাগ থেকে ৫টা ১০০ টাকার নোট বের করে জয়িতা দোকানের কাউন্টারের লোকটিকে বলেছিল— নির্বাচিত জীবনানন্দ এক কপি দেবেন। ঐ যে বইটা...।

মোট ৪টে টিউশনি করে জয়িতা। বাংলায় এম. এ. সে। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে চাকরি খুঁজে, চাকরির পরীক্ষা দিয়ে হতাশ। কফি-হাউসের অস্থায়ী তাঁবুর (বইমেলায়) নীচে বসে নলিনী জিজ্ঞেস করেছিল— আটশো টাকা মাসিক আয় থেকে প্রায় অর্ধেক এভাবে খরচ করে ফেললে বই-এর পেছনে। অসুবিধা হবে না?

— টিউশনির টাকায় আমাকে অন্তত সংসার চালাতে হয় না। দাদা-বৌদির আশ্রয়ে এটুকুই যা বাঁচোয়া। যদি পরে টাকার প্রয়োজন হয়, তুমি দেবে না?

— এখনও সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। নলিনী হেসেছিল। কবিতার বইটি নলিনীর হাত থেকে টেনে নিয়ে জয়িতা সূচি-র পরের পৃষ্ঠায় নীচের দিকে বড় বড় অক্ষরে লিখেছিল— 'তুমি তো জানো না কিছু, না জানিলে,/আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ করে'—

নলিনী হেসে বলেছিল— ৫ বছর এ্যাতো গভীর মেলামেশার পর এই লাইনটা লেখা কি ঠিক হল? আর আমাকে গান তো তুমি আজ অব্দি একদিনও শোনাওনি জয়িতা।

— ঐ হল আর কি। — জয়িতা হেসেছিল—এ্যাতো সুন্দর একটা লাইন লিখেছিলেন জীবনানন্দ। .....ইউটিলাইজ করলাম।

গত কয়েকদিন ধরে নলিনী শুধু জীবনানন্দই পড়ে চলেছে। গতকাল রাতে পড়তে পড়তে ঘড়ির কাঁটা ২-টোর ঘরে। জীবনানন্দে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। যেমন এই মুহূর্তে তার মনে এল— 'হাজার হাজার মোটর ইন্ড্রাস্ট্রি/কোটি কোটি মোটরকার/আমার জীবনের স্থিরতা

অবসর শান্তি ও অপেক্ষাকে নষ্ট করতে পারবে না....।' এই কবিতাটি এর আগে পড়েনি নলিনী। এখন এই শান্ত সকালবেলা দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল সে। কিন্তু তার মনে পড়ছিল কেবলই জীবনানন্দের কবিতার লাইন.....। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখল নলিনী, তার বাড়ির সামনে খেলার মাঠের পশ্চিমদিকে একমাথা জটা এবং অজস্র ঝুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কবেকার বটগাছটার নীচে দুজন লোক নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। ওদের একজন বিমলবাবু। নলিনীর বাড়িওলা। আর একজন বেঁটে। থলথলে চেহারা। ভুঁড়ি। শ্যাওলা রং-এর স্কুটারে আসীন। এই ব্যালকনি থেকে খুব দূরে যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে তা নয়। নলিনী তো বেশ শুনতেই পাচ্ছে ওদের কথাবার্তা।

নলিনী শুনছিল.....

— কিছু চিন্তা করবেন না। আগামীকাল ভোরেই আমার লেবাররা এখানে পৌঁছে যাবে। পুরোনো গাছ তো! এদের রুট মাটির অনেক নীচে চলে যায়। তাই ফিলিং-এ সময় লাগতে পারে। তবে দুতিন ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়। আমার লোকগুলো খুব এক্সপার্ট। অসংখ্য গাছ কেটেছে ওরা। ঠিক কায়দা করে— স্কুটারের আসনে বসে থাকা লোকটা বলছিল।

— তাহলে কাল ভোরেই? — বিমলবাবু জিজ্ঞেস করল।

— হ্যাঁ কাল ভোরেই। — ডি. এফ. ও. সাহেবের পরমিশান তো আপনি পেয়েই গেছেন। তাহলে আর ও গাছ কাটার বাধা কোথায়?

— তা তো বটেই।

— তাহলে ঐ কথাই রইল। আগামীকাল ভোর ৫টায় আমার লোকজন কাজে লেগে যাবে। ভোরবেলাতে এসব কাজ করতে সুবিধে...।

— হ্যাঁ। ভোরেই আসুক। আমার অসুবিধে নেই।

— এখন আসি তাহলে?

— আসুন।

ধক্ ধক্ ধক্ ধক্.... পোড়া পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে স্কুটার দূরে চলে গেল। বাঁক ঘুরতেই আর দেখা গেল না।

প্রায় ২৫ বছর হল নলিনীরা বিমলবাবুর ভাড়াটে। এই বাড়িতে যখন প্রথম আসে ওরা, তখন নলিনীর বয়স মাত্র ৭। তার বোন চন্দ্রাতো এই বাড়িতেই জন্মেছিল। দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেল। বাবার মৃত্যু হল এই বাড়িতেই। এখন মা আর বোনকে নিয়ে নলিনীর সংসার। বিমলবাবুর মালিকানায় দোতলা এই বাড়িটার ওপরতলার ভাড়াটে নলিনীরা। নীচের তলায় সুধাকান্তবাবু। এই দুই ভাড়াটের সঙ্গেই বিমলবাবুর সম্পর্ক ভালো নয়। সেই খারাপ সম্পর্ক কোর্টকাছারি অবধি গড়িয়েছে। দুই ভাড়াটেই রেন্ট কন্ট্রোল আফিসের মাধ্যমে প্রতি মাসে ভাড়া পাঠায় বিমলবাবুকে। সুধাকান্তবাবুর মুখেই শুনেছিল নলিনী। সামনের ফাঁকা মাঠ, যার পশ্চিমপ্রান্তে প্রাচীন বটগাছ ;— সেখানে নাকি বহুতল বাড়ি তুলবে বিমলবাবু।

লাখ লাখ টাকায় বিক্রি করবে। প্রোমোটারির ব্যবসাই তো আসল ব্যবসা! আর সেই কারণেই মাঠ পরিষ্কার করতে হবে। কাটা পড়বে বটগাছ। নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে চাইলে নলিনীর চোখ বিষম ধাক্কা খাবে সারি সারি একই ধাঁচের খাঁচার দেয়ালে বা লোহার রেলিং-এ। একটু দূরে উদাসীন দাঁড়িয়ে থাকা ঐ বটগাছটার সঙ্গে কতদিনকার সম্পর্ক! সেই বটগাছ আগামীকাল থেকে আর ওখানে থাকবে না। শুরু হয়ে যাবে বহুতল বাড়ি নির্মাণের কর্মব্যস্ততা! বিমল সিংহ লোকটার অনেক টাকা। দুটো তেলের মিল। তারও পর একজন প্রোমোটার হওয়ার আহ্লাদ....। কত টাকা পেলে ঐ চামারটার মনে হবে— অনেক হয়েছে। আর দরকার নেই।.... নলিনী গেঞ্জির ওপর পাঞ্জাবি চাপায়। পা গলায় স্লিপারে। সিঁড়ি দিয়ে চটির ফটফট। নলিনী এই দোতলা বাড়িটার লাগোয়া বিমল সিংহ-র প্রাসাদের মতন বাড়ির সামনে এসে ডোর-বেলে চাপ দেয়।.....

বেশ কয়েকবার ডোর-বেল বাজানোর পর যে দরজা খোলে, নলিনী জানে, এ বাড়ির চাকর।

— কী চাই?

— বিমলবাবুর সঙ্গে দরকার।

এই লোকটাও নিশ্চয়ই খবর রাখে, বাড়ির ভাড়া বাড়ানো নিয়ে নলিনীর সঙ্গে বিমল সিংহের মামলা চলছে। কেননা সে দরজাটা অল্প ফাঁক রেখে উধাও হয়ে গেল। নলিনী জানে, তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত হবে কিনা, সেটা বিমলের কাছে জানতে গেছে লোকটা। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যাবে?....সেটা ভদ্রতা হবে না। বিমল সিংহ আদৌ সুবিধের লোক না। হয়ত থানাতে অভিযোগই করে এল, নলিনী তার বাড়িতে ঢুকে হামলা করছে...।

— কী ব্যাপার? — বিমল নিজেই। চেক লুঙ্গি। উর্ধাঙ্গ নগ্ন। থলথলে বুকদুটো মেয়েদের স্তনের মতন।

— বটগাছটা কাটিয়ে ফেলছেন নাকি?

— সে খবরে আপনার কী দরকার?

— কতদিনকার গাছ। একধরণের মায়াও তো পড়ে যায়! গাছটাকে বাঁচিয়ে মালটি-স্টোরিড বিল্ডিং তুললে ক্ষতি ছিল খুব?

— আমার জায়গা। আমার গাছ। যা খুশি করব। আপনার তাতে কী? আপনি নিজের চরকায় তেল দিন।

— আর কত টাকা কামাবেন? টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে।

— টাকায় ছাতা পড়লে কী হয়েছে? একি মেয়েছেলে নাকি যে পুরনো হয়ে গেলে কেউ ফিরেও তাকাবে না? টাকায় ছাতা পড়তে পারে। মুড়ে দুমড়ে যেতে পারে। ছিঁড়ে

কিংবা ফেটেও যেতে পারে। তবু তা কেউ না কেউ নিয়ে নেবে। মরা হাতির মতন ছেঁড়া টাকার দামও অনেক।.... আর কিছু বলবেন?

— গাছ কেটে জমিতে বাড়ি তোলা বে-আইনি। আমি বন দপ্তরের কাছে আপনার নামে অভিযোগ....

— চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ডি. এফ. ও লোকটা বিহারের। আমরা বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছি। গাছ কাটার পারমিশান ওই....।

দড়াম শব্দে দরজা মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল।

— শুয়োরের বাচ্চা! —নলিনী দাঁতে দাঁত ঘষে বলে। সে নিশ্চিত যে গালিটা বিমল সিংহের কানে ঢোকেনি!

২

— আজকাল মাঝে মাঝে মরে যাবার ইচ্ছে হয় কেন বল তো?

— ওমা! ওসব আবার কী অলুক্ষণে কথা!— আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে সুগন্ধী ক্রিম ঘষতে ঘষতে জয়িতা বলে।

— আজ হাওড়া ব্রিজে খুব জ্যাম চলছিল। — নলিনী বিছানায় অর্ধশায়িত ছিল। এখন সোজা হয়ে বসে সিগারেট ধরাল। জয়িতা এখনও প্রসাধনে ব্যস্ত। নলিনীর কথা কী ও শুনছে? তবুও নলিনী বলে যায়। যেন নিজেকেই শোনায়।

— বাসে বসে থাকতে থাকতে ঢুলুনি আসছিল। তাই বাস থেকে নেমে পড়লাম। অনেক লোকই জ্যাম সহজে কাটবে না ভেবে হাঁটতে শুরু করেছে। আমিও হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে নীচে তাকালাম। ঘোলা জলের গঙ্গা। যাত্রী-বোঝাই একটা স্টিমার বাগবাজারের দিকে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে এসেছিল— ফাঁকা ব্রিজের মাঝখানে একা দাঁড়ালে হা হা করে ছুটে আসে মৃত্যুবোধ.....

— বাহ্! বেশ লাইনটা তো? কার লেখা? ....জীবনানন্দের?

— জীবনানন্দর লাইন এটা নয়। একজন মাইনর পোয়েটের লেখা। তাকে তুমি চেনো না।

— মৃত্যু নিয়ে জীবনানন্দর কোনো কবিতা নেই?

— এরকম বোলো না। লোকে হাসবে। সারাজীবন মৃত্যু নিয়েই তো লিখেছেন জীবনানন্দ। . ..কয়েকটা লাইন শুনবে?

— শোনাও....

— 'আমরা মৃত্যুর হাতে ভ্রান্ত হয়ে জীবনের সেবা/আধেক তো শুরু করি,/সৌন্দর্যবে হয় তো আধেক/হৃদয় ধারণ করে চোখ বুজে চুপে বসে থাকি...'

— আচ্ছা নলিনী, তুমি কবিতা লেখো না কেন?

— আমি? ....লিখতে পারি না...তাই।

— আগে তো লিখেছ বেশ কয়েকটা। ছোট কাগজে বেরিয়েছে। এখন লেখো না কেন?

— আমার কবিতা গরুতেও খাবে না।

— কোনো ব্যাপারেই তোমার লাগাতার চেষ্টা নেই। বড় হতে গেলে কিন্তু নিষ্ঠা আর ধৈর্য দরকার।

— আমি বড় হতে চাই— তোমাকে কে বলল— জয়িতা?

— তাহলে একেবারে সাধারণ হয়ে যাও। ...naive! তাই বা হতে পারছ কই? হয় খুব বড় আর নয়তো খুব সাধারণ! এই দুটোর যে কোনো একটা হতে পারলে মানুষের সমস্যা অনেক কম হয়।

— খুব জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে? ...নলিনী ঈষৎ ঝুঁকে জয়িতার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনে। জয়িতার ঠোঁট থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ...!

— আজ এক্কেবারে অসভ্যতা নয়। — জয়িতা চোখ পাকিয়ে বলে।

— কেন?

— দাদা অফিস যায়নি। ছুটিতে। বউদি অবশ্য ছেলেকে নিয়ে আঁকার স্কুলে। ...কিন্তু কোনো কারণে দাদা যদি ওপরে উঠে আসে?

— দুর! নলিনী হাসে। — দাদারা ওরকম বোকা নাকি? এ-ঘরে আসার আগে বাইরে থেকে ঠিক জানিয়ে দেবে।

নলিনী জয়িতার ঠোঁটে আলতো চুমু খায়। নলিনী এই মুহূর্তে উঁচু এবং ফুলে ওঠা ঢেউয়ের মাথায়। প্রবল আবেগে সে ছুঁয়েই আছে জয়িতার আঙুলের মতন টস্‌টসে ঠোঁট। বিপর্যস্ত জয়িতা ঠোঁট সরিয়ে নেয়। তখন নলিনীর আতপ্ত ঠোঁট জয়িতার ফিনফিনে কানের লতি ছোঁয়।

— আর কতদিন আমরা এরকম আলাদ আলাদা থাকব?

— আর একটা বছর অপেক্ষা কর। ছোটবোনের বিয়েটা হয়ে গেলেই—

— এই আশ্বাস তো অনেকদিন থেকে পেয়ে আসছি। সময় ফুরিয়ে আসছে, নলিনী। বেলা ছোট হয়ে আসছে। আমাদের বয়স হচ্ছে। দাদার চাকরির মেয়াদও শেষ হয়ে আসছে। বৌদিও আজকাল ভীষণ দুর্ব্যবহার শুরু করেছে। পরের সংসারে এভাবে বোঝা হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। নিজের আয় বলতে তো কটা টিউশনি। কত জায়গায় পরীক্ষা দিলাম। একটাও কল পেলাম না। খুব ফ্রাসট্রেটেড লাগে....।

নলিনী এখন নিজেকে সামলে নিয়েছে।

মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে বিছানায়।

— কী, রাগ হল তো বাবুর? — জয়িতা নলিনীর কাছে ঘেঁষে আসে। তার হাতে আলতো হাত ছোঁয়ায়।

— রাগ কেন হবে? — নলিনী ম্লান হাসে। — তোমার অসুবিধেগুলো আমি কী বুঝি না? এদিকে আমিও হেল্পলেস। বোনের বিয়ে না দিয়ে আমার বিয়ে করাটাও ভালো লাগে না....।

— ছেড়ে দাও ওসব কথা। অন্য কথা বল।

— কী কথা বলব?

— স্বপ্নের কথা। কবিতার কথা।

আমাদের বাড়ির সামনে একটা মাঠ আছে।

— জানি।

সেই মাঠের পশ্চিমদিকে একটা বটগাছ আছে।

— তাও জানি।

— আশ্চর্য! কী করে জানলে?

— তুমিই তো বলছ!

— সেই বটগাছ। অনেকদিনের। পুরনো। কাল সকালে শেকড়সুদ্ধু উপড়ে ফেলা হবে, মেরে ফেলা হবে গাছটাকে।

— কেন? গাছটা আবার কী দোষ করল?

— জমির মালিক, যার বাড়িতে আমি ভাড়া থাকি, ঐ গাছ কাটিয়ে দিচ্ছে! ওখানে হাইরাইজ ফ্ল্যাট উঠবে।

— তাই নাকি? — নলিনী অনুভব করে, জয়িতা এই আলোচনায় তেমন আগ্রহ পাচ্ছে না। — কী গরম! দাঁড়াও ফ্যানের স্পিড বাড়াই....।

রেগুলেটরের কড়াৎ শব্দে ডানদিকে ঘুরিয়ে, ফ্যানের গতি বাড়িয়ে জয়িতা আবার বিছানায় এসে বসে।

— গাছটার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার।

— তাই নাকি? এবার গাছটাকে হিংসে হচ্ছে।

— রাতের অন্ধকারে একটা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, সেও যেন ডালপালা নাড়িয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।... অন্ধকার। কালো রাত। আমি একা। গাছটাও একা। মনে হয় গাছটা ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন বলতে চাইছে আমাকে।....তাছাড়া মানুষ ওরকম হৃদয়হীনই বা হয় কী ভাবে? রান্নাঘরে কিংবা ঘরের তাকের ধুলোয় অপ্রয়োজনীয়, তোবড়ানো কৌটোকেও ছুঁড়ে ফেলে দিতে আমাদের কীরকম মায়া হয়। আর গাছ। সে তো কত ইউসফুল। ছায়া দেয়। বাতাস দেয়। আমাদের নির্জনতার সঙ্গী হয়। অথচ তার প্রতি কোনো সহানুভূতি থাকবে না।....

নলিনী এখন নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

জয়িতার ক্লান্ত লাগছে। তার হাই উঠছে ঘনঘন। নলিনীর কথা এবার স্রেফ অর্থহীন বকবকানি মনে হচ্ছে। জয়িতা জানে, নলিনীর চরিত্রে একধরনের অমানবিকতা আছে। সে কি জয়িতার কাছে আসে শুধু যৌনতার দাবি মেটাতে? ভালোবাসার ক্ষমতা কী নলিনীর নেই?

— কী হল?

— খুব ঘুম পাচ্ছে।

— তাহলে আমি যাই?

— হ্যাঁ।

— আসলে আমার কোনো কষ্টের কথা তুমি শুনতে চাও না।

— তুমি বড় বেশি কথা বল, নলিনী। শুধু কথার ফেনায় জীবন আর ভরে না...।

৩

খট্ খট্ খট্ খট্ খট্ খট্! ঘুম ভেঙ্গে গেল নলিনীর। চোখ খুলেই বুঝল, বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। জানলা দিয়ে রোদের বর্শা ঘরের মেঝেতে পড়ে ভেঙে টুকরো হয়ে আছে।

অনেক মানুষ দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইছে। সে গানের ভাষা অজানা। কিন্তু একটা সুরের দোলা আছে। বিছানায় একভাবে শুয়ে আছে নলিনী। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে সে। আড়মোড়া ভাঙে। একসময় তার মনে হয়, মেদিনী কী কাঁপছে? হুড়মুড় আওয়াজ। ভয়ংকর পতনের আওয়াজ। অজস্র কাক আর পাখপাখালির ডাক! ঠিক ডাক নয়। চিৎকার। হয়তো ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে। তাই আর্তস্বরে চিৎকার করছে কাক আর পাখির দল। তড়াক্ করে বিছানা ছেড়ে ব্যালকনিতে এল নলিনী।

আর-এ-এ?

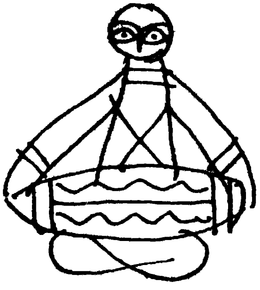
আকাশ যে এ্যাতো বিশাল আর সীমাহীন, এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এর আগে মনে হয়নি তো কোনোদিন?

নলিনী তাকিয়ে দেখছিল।

প্রাগৈতিহাসিক এক বিশাল জন্তুর মতন গাছটা তার শেকড় থেকে আলগা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ভূপতিত গাছটাকে ঘিরে কুলি-কামারিদের উল্লাস, হৈ-চৈ। তাদের কারো একজনের হাতের ধারালো কুঠার থেকে রোদ ঝলসে নলিনীর চোখে!

... একমুহূর্ত নলিনীর মনে হল, নিজের ব্যর্থ, বত্রিশটা বছর মুখ থুবড়ে, হাত-পা ছড়িয়ে অসহায়ভাবে মাটিতে পড়ে আছে, মনটা হু হু করে উঠল তার। ব্যালকনি থেকে নলিনী নিজের ঘরের আড়ালে সরে এল।

চিরযুবা



তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

এই বয়সে মেয়ের বয়সী মেয়েটাকে নিয়ে পালাল। একটি বারের জন্যেও কি মনে পড়ল না তোমার মেয়ে আছে, তার বিয়ে দিয়েছ, নাতি-নাতনী হয়ে গেছে, ছেলেটা স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে যাবে এবার, তারা কি করে এ-বাড়িতে থাকবে, এ-পাড়ায় হাঁটবে, চলবে? কি করে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব এটা একবারও ভাবল না!

কনকবৌদি এক একবার এক একটি তথ্য পরিবেশন করে আর এক একটি তথ্যের মাঝখানে থেকে যায় মুহূর্তের বিরতি। ঠিক বিরতি নয়। সেই মুহূর্তগুলোতে শব্দের পরিবর্তে শুধু ধ্বনি। হাঁ করে বাতাস গিলে নেওয়ার শব্দ। হাপরের মতো বুকটা তখন কনকবৌদির উঠছে আর নামছে। সমরের মনে হচ্ছে গ্যাসবেলুনের মতো যেকোনো মুহূর্তেই কনকবৌদির বুকটা ফেটে যেতে পারে। এতকিছু সে দেখছে, বুঝতে পারছে, অন্তরের অন্তরতম স্থল দিয়ে অনুভব করছে অথচ কিছুই বলতে পারছে না ঠোঁট খুলে। সামান্য সমবেদনা, সান্ত্বনা—কিছুই সমরের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। এরকম কেন হচ্ছে! কেন! কনকবৌদির প্রতি কোনো গভীর আক্রোশ কি তার মনের গোপন কোণে লুকিয়ে রয়েছে? না হলে এমন বেদনার দৃশ্য দেখেও সে নীরব কেন! ঠিকঠাক কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সমর।

চোখের জলে, ঘামে, বিলাপে মাখামাখি কনকবৌদির মুখটা কিম্ভূত হয়ে উঠেছে এখন। সমর মনে করার চেষ্টা করল আচ্ছা ঠিক এই মুখটিকেই একনজর দেখবে বলেই কি সে একসময় বেলগাছিয়া থেকে বাসে চেপে বসত? যশোর রোড ধরে চলতে চলতে বাসটা একসময় ঢুকে পড়ত শ্যামনগরের ভিতরে। ভি আই পি রোড এখন যে জমির ওপরে শুয়ে আছে তখন সেখানে ছিল গাছপালা-ধানক্ষেত আর জলাভূমি। বাসটা সেই সবুজের বুক চিরে চলে আসত এই কেষ্টপুরের মাঠে।

সমরের মনে হতো এই সবুজ শুধু প্রকৃতির মধ্যেই নেই, আছে কনকবৌদির বুকের ভিতরে, ওর দু'চোখ থেকে উপচে পড়া কৌতুকের গভীরে। সবুজ— যেন এক অদ্ভুত প্রাণময়তা লেগে থাকত কনকবৌদির যাবতীয় অস্তিত্বে। অথচ আজ এতগুলো বছর পরে একরকম হঠাৎ করেই কনকবৌদির বাড়িতে চলে আসার পর থেকেই সমরের শুধু মনে হচ্ছে ঐ যাবতীয় পূর্বস্মৃতি আসলে মিথ্যে ছাড়া কিছুই নয়। জীবনের একমাত্র সত্যটি হলো এত ঐশ্বর্য নিয়েও কনকবৌদি তার সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে ধরে রাখতে পারল না।

পরিতোষদা পালিয়েছে আজ থেকে তিনদিন আগে। টুটুনই গিয়ে খবরটা দিয়েছিল সমরকে। আর এখানে আসার পরে কনক, টুটুন— প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে সমরকে ঘটনার কথা বলছে। সমর শুনছিল, আবার শুনছিলও না। ইঁট দিয়ে উঁচু করে রাখা চৌকির ওপরে পা ঝুলিয়ে বসেছে সমর। কনকবৌদি, টুটুন— ওদের মুখগুলোকে পাশ কাটিয়ে সোজা তাকালে এ-বাড়ির সদর দেখা যায়। সেদিকেই তাকিয়েছিল সমর। ভানটা করেছিল এমন যে হ্যাঁ তোমরা বলো, আমি শুনছি। কিন্তু তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়িটাকেই দেখছিল সমর।

দেখছিল উপোরঝোরন বৃষ্টির ছাঁট সামনের পিচ রাস্তায় পড়ে ছিটকে ঢুকছে বাড়ির ভিতরে। সদরে দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের ফ্রেম বসানো আছে ঠিকই। কিন্তু সেদিনের মতো সেটা আজও পাল্লাহীন। সেদিনের টিনের চাল আজও রয়েছে। পাকা দেয়াল আগে যতটুকু ছিল, এখনও সেই একই জায়গায় থেমে আছে। একটু বেড়ে মাথার ওপরে সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই করা ছাদকে ধরার যোগ্যতা পায়নি। টিনের চালের ওপরে বেশ কয়েকবার রঙ অবশ্য চেপেছে। চেপে চেপে রঙের পলেস্তরা এত মোটা হয়ে গেছে যে চালের গা থেকে টিনের শরীর নিয়েই ঝরে পড়েছে। বৃষ্টি অঝোরে হচ্ছে। আর ঐ বিন্দু বিন্দু ছিদ্রগুলোব মধ্যে দিয়ে জলকণারা নেমে এসে ঘরময় এক কুয়াশা তৈরি করেছে। কিরকম এক অস্বস্তিকর পরিবেশ বলে মনে হচ্ছিল সমরের।

টুটুনের চোখে যেন ধরা পড়ে গেল সমর। নিবিড় করে বাড়ি দেখতে থাকা চোখ যখন হঠাৎ করেই ঘরের ভিতরে ফিরে এসেছিল, সমর লক্ষ্য করেছিল টুটুন তাকে কিরকম এক সন্দেহের দৃষ্টিতে জরিপ করছে। হঠাৎ জেগে ওঠা দায়িত্ববোধ থেকে সমর তাই বলে উঠল, এবার তো কলেজে ভর্তি হলি...

টুটুন বন্ধ জানলাটার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ....

কোথায় ভর্তি হলি?

মতিঝিল কমার্স—

আচ্ছা—

সমর একটা সিগারেট ধরাল। আর কি বলতে পারে সে। চোদ্দ-পনেরো বছর পরে হঠাৎ করেই কারুর বাড়ি চলে এসে সে-বাড়ির ছেলের লেখাপড়া নিয়ে আর কতটা সিরিয়াসনেসই বা দেখানো যায়। সমর ধোঁয়া ছাড়ল। মনে পড়ে যাচ্ছিল কনকবৌদি আর পরিতোষদার বিয়ের ঘটনাটা। পরিতোষদা আসলে কনকবৌদির মা আশাদির পিসতুতো ভাই। মামা-ভাগ্নির বিয়েটা তাই কেউ মেনে নিতে পারেনি ও পাড়ায়। এক আড়ালকে সঙ্গী করে নিতে হয়েছিল ওদের। বেলগাছিয়া ছেড়ে কেষ্টপুরের সবুজের গহীনে পালিয়ে এসেছিল।

আজ আরেকটা পলায়ন ঘটেছে। এবার পরিতোষদা পালিয়েছে ঝিকে নিয়ে। এই সংসার আজ তাই বিপন্ন। টুটুনের কাছে খবর পেয়ে সেই বিপন্নতার ভাগীদার হতে কি সমর আজ

চলে এসেছে এখানে? নাকি সেই পুরনোদিনের স্মৃতি রোমন্থনের এক গোপন ইচ্ছের তাড়নায় সমর এসেছে? না হলে ওদের অত ব্যথা কিছুতেই কেন আঁচড় কাটতে পারছে না তার ভিতরে! সমর বোধহয় অসভ্যের মতোই চুপ করে ছিল।

টুটুন তাই নীরবতা ভঙ্গের দায়িত্বটা নিয়ে নিল। বলল, কলেজে তো ভর্তি হলাম, কিন্তু কিভাবে যাবো বল তো....

সমরের বুকের ভিতরে একটা ভারী পাথর যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে গেল। কাঁদতে কাঁদতে গলা বসে গেছে কনকবৌদির। কোনোরকমে শব্দগুলোকে যেন বের করতে পারল ঠোঁট খুলে, বলল, কাল রেশনের দোকানে লাইনে দাঁড়িয়েছি, আমাকে দেখিয়ে কি বলল জানিস! এনার স্বামী কাজের লোকের সঙ্গে পালিয়েছে...

সমর বলে উঠল, রাস্কেল। বলল বটে, তবে মনে মনে। আসলে এতগুলো বছর পরে এরকম একটা ঘটনার মধ্যে উপস্থিত হয়ে সে কি করতে পারে? কি মতামতই বা দেবে!

সমর এবার তাই দৃষ্টিকে ফের সদরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে অসভ্যের মতো উদাসীন হলো।

সমরের দৃষ্টিকে অনুসরণ করেছিল কনক। বাইরে দুরন্ত বৃষ্টি রাস্তায় ছিটকে পাল্লাহীন সদর দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল, বাড়ির এই হাল হবে না, চণ্ডীগড় থেকে যা পাঠিয়েছি সবই তো উড়িয়েছে ঐ মেয়েটার পেছনে...

মেয়েটার পেছনে! অবাক হয়ে বলে উঠল সমর। ঘটনার সঙ্গে নিজেকে না জড়িয়ে পারল না।

কনক বলল, আবার কে, তোদের ঐ শিবানী, কি কুক্ষণেই না মেয়েটাকে এনেছিলাম এ-বাড়িতে....

সমরের মনে পড়ে যাচ্ছিল মুখটা। বেলগাছিয়ার বস্তি থেকে বাসন মাজতে আসত তাদের বাড়িতে। রোগা, শুষ্ক, বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। আশাদিই মেয়ের কষ্ট দেখতে না পেরে গোপনে পাঠিয়ে দিয়েছিল কেষ্টপুরে। পরিতোষদাকে বিয়ে করে পালিয়ে আসার ক'বছর পরে সেই একমাসের জন্যে বেলগাছিয়ায় দেখা গিয়েছিল কনকবৌদিকে। রাস্তায় কনককে দেখে চমকে উঠেছিল সমর। কোথায় গেল ওর অত রূপ! কোথায় গেল শরীর জুড়ে মোহের সেই মায়াজাল। কনককে বোধহয় খুব খাটতে হয়। দীর্ঘ আঙুল সম্বলিত দুটি হাতে কত শিরা জেগে উঠেছে। যেন গাছেদের কঠিন শেকড়। আর ওর দু'চোখের নিচে শুষ্ক ক্লান্ত ত্বকের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিল এত খেটেও কনক তার জীবনে সামান্য ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আসতে পারেনি।

রাস্তায় মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় সমর নিয়মের হাসি হেসে বলেছিল, কেমন আছো?

কনক ম্লান হেসে বলেছিল, এই তো, জানিস তো চাকরি করছি...

সমর একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায়।

ম্লান হাসি তখনও আটকেছিল কনকের ঠোঁটে। বলেছিল নার্সিঙের ট্রেনিং নিয়ে এয়ারপোর্টের মোড়ে একটা নার্সিংহোমে আছি।

সমর কথোপকথন সংক্ষিপ্ত করে আনতে চাইছিল। কনক বলল, তোদের পরিতোষদা তো চিরুনি কারখানার কাজটা ছেড়ে দেওয়ার পরে আর কিছু তো যোগাড় করতে পারল না, আমাকেই তাই বেরোতে হলো....

এরপরেও সমর বলেছিল, ও।

কিন্তু কনক থামতে চায়নি। বলেছিল, কাজ পায়নি ঠিক আছে, কিন্তু ঘরসংসারটা তো একটু দেখবে, তাও নয়, দেখ্ ছেলেমেয়ে দুটো আছে, রান্নাবান্না আছে, ঘরের কাজ, আমি দুটো হাতে কটা দিক সামলাব বল, তাই কাজের লোকের জন্যে মায়ের কাছে এসেছিলাম...

সমর বলেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো ভালো কথা। আসলে সেই মুহূর্তে কনকের সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়ার এক আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সমর। সমর তো সেই মুহূর্তে ওর সামনে কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। যতবারই কনকের চোখে গিয়ে তার দৃষ্টি পড়েছে ততবারই যে সমর দেখতে পেয়েছে এক বিশাল সবুজে থিকথিক করা বৃক্ষ শিকড় সমেত মাটি উপড়ে পড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তার মনে হয়েছিল, আচ্ছা এই কনকই কি সেই কনক যে বেলগাছিয়ায় থাকার সময় পরিতোষদার উপস্থিতিতে সমরের হৃদয়টাকে একটা নতুন ব্লেড দিয়ে চিরে দিত ধীরে ধীরে?

সমর সেদিন হ্যাঁ, হুঁ করে কনকের সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে সে কোথাও পালাতে পারেনি। সেদিন সারাটা রাত অতীতের হাত থেকে বল্লমের খোঁচা খেয়েছিল শুধু।

সব কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সমরের। কনকের মা আশাদির বিয়ে হয়েছিল ও. এন. জি. সি.-র এক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। অনেক দেখেশুনে ভেবেচিন্তেই আশাদির বাবা বিয়েটা দেন। কিন্তু দুর্ঘটনা অপেক্ষা করে থাকলে তাকে এড়ানো যায় না। ক্রেন ভেঙে পাহাড়ের গর্তে পড়ে আশাদির স্বামী মারা গেলেন। কনককে নিয়ে আশাদি বেলগাছিয়ায় বাবার কাছে ফিরে এলেন।

আশাদির পিসির ছেলে পরিতোষদা ও-বাড়িতেই থাকত। কাজ করত ভেটেনারি হাসপাতালের কাছে একটা চিরুনি কারখানায়। আশাদির বাবা, মানে কনকের দাদু মারা যাওয়ার পরে পরিতোষদাই ও-বাড়ির কর্তা হয়ে উঠল। তখন পরিতোষদার কত বয়স হবে— আটত্রিশ, উনচল্লিশ। কপালের দু'পাশ ধরে টাক সবে পেছনে হাঁটতে শুরু করেছে। তবুও যা আছে তা দিয়ে টেরিকাটার এক আপ্রাণ চেষ্টা। সব সময় মুখ ঘেমে আছে। যেন এক কর্মবীর ভাব। একটা মপেড ছিল। সেটায় চড়ে হুশ করে চলে যেত ব্রীজের বাজারের দিকে। বাজার করে ফিরত। কখনও বা হাতে ঝুলত কেরোসিনের জার। সামান্য কাজ। হেঁটে গেলেই হয়। অথচ মপেডে চেপে যাওয়ায় হাওয়ায় চুল এলোমেলো করে এমন ভাবে ফিরল যেন কি

কাণ্ডটাই না ঘটিয়ে এল। দুর্গাপুজোর ফল কাটা থেকে বসন্তের টীকাদান-প্রকল্প, মানে যেখানেই মহিলাসমাজ উপস্থিত সেখানেই পরিতোষদাকে পাওয়া যেত। পরিতোষদার থেকে বয়সে ছোট সমরদের গ্রুপটা পরিতোষদাকে সহ্য করতে পারত না। সমরের দিদি বা অন্যান্য মহিলারা অবশ্য এ ব্যাপারে কথা উঠলে বলত, লোকটা কি হেল্পফুল বল তো....

পরিতোষদা এই সব জায়গায় নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার খেলা, এটাই কি মুগ্ধ করে দিয়েছিল কনকবৌদিকে? সমরের তো আজও, এতগুলো বছর পরেও স্পষ্ট মনে আছে সেইসব দৃশ্য। আশাদির সঙ্গে হয়তো দেখা করতে গেছে সমর। ক্লাবের পুজোর চাঁদাটা নেবে। ইচ্ছে করেই পরিতোষদার কাছে যায়নি। মাতব্বরি দেখাবে। চাঁদা নিয়ে বারান্দা ধরে ফিরে আসছে। বৈঠকখানায় পরিতোষদা আর কনক ক্যারাম খেলছে তখন। তাকে দেখে পরিতোষদার অমায়িক ডাক, কি রে যাচ্ছিস কোথায়, এক হাত খেলে যা....

কনক ওর লাবণ্য উপচে পড়া মুখে, দুটি টানাটানা চোখে সমরকে সরাসরি দেখছে। এই মুহূর্তে চলে যাওয়া যায় না। চলে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া। সমর এগিয়ে গেছে তাই। এতক্ষণ পরিতোষদা আর কনক খেলছিল। এবার তিনজনে। পরিতোষদা ডাবল হাত খেলবে। আসলে ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা করেছে। না হলে কনকও তো ডবল হাত খেলতে পারত। ওর হাত তো ভালোই। আসলে এ-মুহূর্তে কনকের মুখোমুখি সমরকে বসাতে চায় পরিতোষদা। কনকের মুখোমুখি বসিয়ে দিয়ে তার দুর্বলতাকে চাখবে পরিতোষদা।

শুধু তার দুর্বলতাকে চাখা নয়, সেই দুর্বলতাকে পরিতোষদা একটা অদৃশ্য ব্লেড দিয়ে চিরে দিতে চাইত। সমরের হাত ভালো ছিল না। শুধু ডাবল ফাইন করত। কনকের তাই দেখে সে কি হাসি! হাসতে হাসতে বর্ষায় স্ফীত নদীর মতো ঢলে পড়ত পরিতোষদার গায়ে।

ক্যারামে পারেনি, তাই পিকনিকের প্রস্তাব নিয়ে আশাদি-র বাড়িতে গেছে সমর। ভাবটা যেন এরকম— পরিতোষদা তো সর্বঘটের কাঁঠালিকলা, কিন্তু আমরাও কিছু কম যাই না, দীঘাতে পিকনিক অ্যারেঞ্জ করছি ক্লাব থেকে.....

সব শুনে পরিতোষদা জিজ্ঞেস করেছে, কবে যাবি—

তেইশে জানুয়ারি সকালে—

নো। বেশ নাটকীয় স্বরে উচ্চারণ করেছে পরিতোষদা। তারপরে গোঁফের নিচে হাসি ভাসিয়ে বলেছে, তেইশ তারিখ পূর্ণিমা আছে, আমরা বিকেলবেলায় এখান থেকে বেরব, জ্যোৎস্নায় সী-বিচে পিকনিক হবে, সকালে ফিরব....কি ঠিক আছে....

সমর হাঁ হয়ে শুধু তাকিয়ে থেকেছে। বুঝেছে এবারেও পেরে উঠল না। আর শুনতে পেরে কনক তার কণ্ঠস্বরে জীবনের যাবতীয় আবেগ ঢেলে বলে উঠেছে, ইউনিক আইডিয়া! কনকের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছে সেখান থেকে ছোট ছোট অসংখ্য রঙিন প্রজাপতি বাতাসে উড়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা যে মানুষটা এতটাই স্বপ্ন মাখিয়ে দিতে পারত কনকের দু'চোখে, সেই মানুষটারই সংসার করতে গিয়ে কনকবৌদি দু'হাতের চেটোয় সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো জাগিয়ে ফেলল! জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে কেন! স্বপ্নের আড়ালে কি আসলে হত্যার হাতছানি থাকে? সবকিছু কিরকম রহস্যের মতো মনে হয়েছিল। আর সেই রহস্যের ওপর থেকে পর্দা উন্মোচনের জন্যেই যেন অনেকদিন পরে একদিন হঠাৎ-ই বেলগাছিয়া থেকে কেষ্টপুরের উদ্দেশ্যে বাসে চেপে পড়েছিল সমর।

সেই যে অনেকদিন পরে একটি মাসের জন্যে কনককে বেলগাছিয়ায় দেখা গিয়েছিল, তারপর থেকে সময় আবার যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছিল কনকবৌদির সঙ্গে। বেলগাছিয়া থেকে পালানোর সময় যে চিরুনি কারখানায় পরিতোষদা চাকরি করত, তাদের হাজার পনেরো টাকা সঙ্গে করে পালিয়েছিল। সেই কারখানায় যাওয়ার আর মুখ ছিল না পরিতোষদার। তাই কাজের খোঁজে সাত সকালেই মানুষটা হয়তো বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। মৌ স্কুলে, টুটুন স্কুলে। বাড়িতে কনকবৌদি একা। আর সমরও হয়তো চলে এসেছে এমন সময়। আর সমরের মনে হয়েছে এই তো মোক্ষম সময় রহস্য উন্মোচনের। ভিতরের উদ্দেশ্যটাকে একটা আড়াল দিয়ে ঢেকে বলেছে, তোমরা এভাবে ওপাড়া থেকে চলে আসায় আশাদি কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারছে না...

উত্তরে কনক হো-হো করে হেসে উঠে বলেছে, এতে মুখ দেখাতে না পারার কি আছে।

সেই মুহূর্তে কনকের মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে শুধু তাকিয়েই থেকেছে সমর। পরিতোষদা মানুষটার এত ক্ষমতা। কটা দিনই বা মানুষটার সান্নিধ্য পেয়েছে কনক। বড়োজোর ছ'বছর কি সাত বছর। আর এই সামান্য কটা দিনের সান্নিধ্য কনককে তার জন্মদাত্রীকে অস্বীকার করার জোর দিয়ে দিল!

খেপে গিয়ে খেলাটাকে আরও জটিল করে তুলতে চেয়েছে সমর, বলেছে, পরিতোষদাকে তো পুলিশ খুঁজছে—

কেন! অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে কনক।

সমর উত্তরে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেছে, বলেছে, চিরুনি কারখানার মালিক তো পরিতোষদার নামে থানায় অভিযোগ করেছে, যেকোনো দিনই কোমরে দড়ি লাগিয়ে ওকে নিয়ে যেতে পারে—

কথা শেষ করতে করতে সমর ভেবেছে এবার বোধহয় কনককে জব্দ করা গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সেই ভুল তার ভেঙে গেছে। দেখেছে একথার উত্তরেও কনক হো-হো করে হেসে উঠেছে। বলেছে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে রে সমু, ঐ কটা টাকার জন্যে পুলিশের তো আর চোখে ঘুম নেই যে আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরে মরবে...

কনকের কথা থেমে যেত। কিন্তু হাসি থামতে চাইত না। তারপরে কখন যেন চলে আসত চা-বিস্কুট। সেদিনও এমনই চৌকির ওপরে এসে বসত সমর। এক সময় আবিষ্কার করত চৌকির ওপরে কনকের শরীরটা তার শরীরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। কনকের চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা বুকের ওপরে এলোচুলের মাঝখানে ডুবে থাকা মুখ, তার সামান্য নিচে সুডৌল কাঁধ, গ্রীবা যেখানে, সেখানে কখন যেন সমরের মুখ ঝুঁকে পড়েছে। আর সমরের এলোমেলো চুলের গভীরে স্নেহমাখানো আঙুল ডুবিয়ে অদ্ভুত এক সুড়সুড়ি দিত কনক।

ভিতরে ভিতরে চমকে উঠত সমর। আচ্ছা এই কনকই সেই কনক যে তার দুর্বল ক্যারাম খেলা নিয়ে হাসতে হাসতে পরিতোষদার গায়ের ওপরে ঢলে পড়ত? এই যদি ইচ্ছে ছিল তাহলে সমরের থেকে বয়সে অনেক বড়ো পরিতোষদাকে নিয়ে একপাড়া লোকের ঘেন্না মাথায় করে এমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল কেন। সমর বুঝতে পেরেছিল কনক আসলে এক দুরন্ত পাখি যে তার ডানায় ভর রেখে শুধু উড়তে চায়। উড়ে বেড়ানো ছাড়া বেঁচে থাকার অন্য কোনো ভূমিকা নেই। অন্য কোনো মানে হয় না।

আচ্ছা যার উড়ে বেড়ানোর এত শখ, সে আজ অমন করে কাঁদছে কেন! কেন এত বিলাপ! গতির পাশে বিলাপ যে বেমানান। একটু আগে টুটুন বলছিল তার কলেজে যাওয়ার সমস্যার কথা। কনক জানিয়েছিল রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে কিসব ব্যঙ্গ তাকে শুনতে হয়—সেসব কথা। এখন কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, নার্সিংহোমে চাকরিটা পাওয়ার পরে সংসার চলে যেত ঠিকই কিন্তু সুখের মুখ দেখতে পায়নি কখনও। ভগবান যেন মুখ তুলে চাইলেন। চণ্ডীগড় থেকে এক পাঞ্জাবী বুড়ি কলকাতায় মেয়ের কাছে এসেছিল, এখানে এসে স্ট্রোক হলো, আমাদের নার্সিংহোমে তিন মাস মতো ছিল, তা আমার কাজে এত সন্তুষ্ট হলো যে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল, মাসে ন'হাজার টাকা করে দেবে। ঐ শিবানীর জিম্মায় এই সংসার রেখে চলে গেলাম, ওখানে বুড়ির পেচ্ছাপ-পায়খানা যখন পরিষ্কার করতাম, মনকে শুধু একটা কথা বলে সান্ত্বনা দিতাম, যাক্ টাকা তো আসছে, বাড়িটা ঠিকঠাক করতে হবে, মৌ-র বিয়ে দিতে হবে, এত পরিশ্রমের বিনিময়ে সব স্বপ্নই পূর্ণ হবে। মাসে মাসে কত করে টাকা পাঠিয়েছি, আর এখানে এসে শুনি সব পয়সা ঐ মেয়েটার পেছনে উড়িয়েছে, পালানোর আগের দিন সব পয়সা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে গেছে জানিস। সামনের মাস থেকে আমরা কি খাবো বলতে পারিস?

অথচ কনকবৌদির এত অশ্রুপাত, এত বিলাপের শেষেও কোনো কথা খুঁজে পেল না সমর। নীরব, এক বোবা-বোবা দৃষ্টি নিয়ে শুধু তাকিয়ে রইল। দেখল কিরকম বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কনক। ভাবটা যেন এইরকম এবার অন্তত কিছু বলুক সমর। একবারের জন্যে অন্তত ঠোঁট খুলুক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমর চুপ করেই থাকল। শুধু চুপ করেই থাকা নয়, এবার ভিতরে ভিতরে ভীষণ চমকে উঠল ও। মনে মনে হলেও

এর আগে সে পরিতোষদার উদ্দেশ্যে বলে উঠেছে— রাস্কেল। মনে মনে হলেও বলেছে জানোয়ার।

এবার চৌকির ওপর থেকে নেমে পড়ল সমর। কনককে বলল, পরিতোষদার কোনো ছবি থাকলে দাও তো, আর হ্যাঁ ওর চেনা-পরিচিতদের ঠিকানা যা আছে সেগুলোও দাও...

কনকবৌদি আবেগতাড়িত স্বরে বলল, ছবি, ঠিকানা দিয়ে কি করবি...

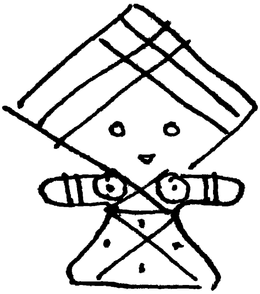
তুমি দাওই না। সমর এমন ভাবে কথাটা বলল যেন ওগুলো পেলেই সে পরিতোষদাকে ওদের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারবে। কনকবৌদি ছবি আনতে চলে গেল ভেতরের ঘরে। এখন টুটুন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সব হারিয়ে যাওয়ার ব্যথা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সমরের দিকে। সমর ওকে কিছুই বলতে পারছে না, বলতে পারছে না বাবাকে অমন খারাপ লোক ভাবিস না, তোরা পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবি না, তোর মাকে দেখিয়ে সবাই বলবে এঁর স্বামী কাজের লোকের সঙ্গে পালিয়েছে— এই সব কথাই ঠিক। কিন্তু তোরা জানিস না এটা তোদের বাবার কোনো নতুন কাণ্ড নয়। তোর মাকে নিয়ে পরিতোষদা যখন বেলগাছিয়া থেকে পালিয়েছিল তখন তোদের দিদিমাও কাউকে মুখ দেখাতে পারেনি।

কনকবৌদি পরিতোষদার ছবি নিয়ে ফিরে এসেছে। সমরের হাতে যখন দিল তখন দু'চোখ থেকে উপচে পড়ছে উৎকণ্ঠা, আবেগ। সমর ছবিটা নিয়ে নিল নীরবে। এবারেও কিছু বলতে পারল না। তার যে খুব বলতে ইচ্ছে করছিল তোমার এ-জীবনের পরিশ্রমের সব সঞ্চয় নিয়ে মানুষটা পালিয়েছে, কিন্তু ঠিক করে বল তো এ ঘটনা কি নতুন কিছু? পরিতোষদা যে চিরুনি কারখানায় কাজ করত তার মালিক আমার কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আমার ছোট কারখানা, এর ভিতর থেকে পনেরো হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল? আমার যে পুঁজিতে টান পড়ে যাবে, ব্যবসা চলবে কি করে! ওসব কথা শুনে সেই সব দিনে তুমি আর পরিতোষদা হো-হো করে হেসে উঠেছিলে। তবে আজ এত বিলাপ কেন! এ-প্রশ্নও করা হয় না সমরের। আর একথাও বলা হয় না যে তোমরা দুজনেই ছিলে দুরন্ত পাখি। কিন্তু উড়তে উড়তে তোমার ডানা আজ ক্লান্ত। অথচ পরিতোষদাকে দেখো। এই ছাপ্পান্ন বছর বয়সেও কিরকম তাজা রয়ে গেছে। যেন তোমার থেকেও ছোট। যেন আমার থেকেও বয়সে ছোট হয়ে গেছে। না হলে ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে পালাল কি করে! ও যে চিরযুবা। ওকে ওরকম ভাবে খারাপ বলো না। ওকে যে আমিই চিনি। আমিই যে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম।

এইসব কথা কিছুই বলা হয় না সমরের। পরিতোষদার ছবিটা বুক পকেটে ঢুকিয়ে কনকবৌদির চোখের ওপরে চোখ রেখে অত্যন্ত উদাসীন স্বরে বলল, আসি।

হিংসে

তপনকুমার দাস



নারুদা!

বিদ্যুৎ আবিষ্ট শরীর স্থবির নিঃস্পন্দ গতিহীন স্তব্ধ হয়ে যায়। পলকহীন চোখে হঠাৎ এ কোন ছবি? রোদ চলকানো চনমনে দিনের দুয়ারে তো ঘুমের মাদকতা নেই। অনেক অনেকদিন আগের চেতন মনে অবচেতনার ঠুনকো দোহাই নয় তো? কিংবা মনের কোনও ভুল? পলাশ রক্তিম ঋতুর কোয়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে পার করা ছত্রিশ বসন্ত ঠেলে ঠেলে জমা হওয়া অনেক ভুলের একটা ভুল কি এখন চোখের সামনে? রুদ্ধবাক মুখের ক্যানভাসে এখন শুধু বিস্ময়ের প্রশ্নবোধক চিহ্ন। কল্পনা আর বাস্তবের জিজ্ঞাসা। দুয়ারে দাঁড়ানো লোকাটা কি সত্যিই নারুদা? কিংবা নারু? অথবা নারায়ণ রায়?

আমাকে চিনতে পারছ না, চিতু?

বাতাসের ইথার ভেদ করে চিত্রার একান্ত গোপন নিজস্ব চিতু নামকরণের শব্দ ধবনিত প্রতিধবনিত রণিত হয়ে হাজার অযুত গুঞ্জন সৃষ্টি করে। শেষ কবে এই শব্দটা কানের কোমল গান্ধার পর্দায় আছড়ে পড়েছিল মনে নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে শব্দটা কানে জল ঢোকা মানুষের মাথায় ঘুরে বেড়ানো শব্দের মতো ধড়ফড় করে ঘুরে বেড়ায়। অবিশ্বাসী চোখের সঙ্গে কানও মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় চিত্রার।

আগন্তুকের সে হুঁশ নেই।

পৃথিবীর অনেক আহ্নিক গতি বদলে বদলে চেহারার রুক্ষ কাঠিন্য তার শরীরে। একমাথা সাদাচুলের ফাঁকে বিশ শতাংশ কালো চুলের দম্ভ ছড়ানো। মুখ জোড়া কদম পাপড়ি দাড়ির তুলোট রংয়ে হারিয়ে গেছে কচুরিপানা শিকড়ের ঘন কৃষ্ণরূপ। চেহারার ঋজু বলিষ্ঠতায় সামান্য ক্লান্তির ছাপ ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি পনেরো বছর পুরোনো নারুদার বাহ্যিক গড়নে।

চিত্রার পাষাণী অহল্যা শরীরটাকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতর পা রাখে নারু। কোনও কাজেই ঠুনকো অনুমতির ধার সে ধারত না কখনও— আজও ধারে না। এই মুহূর্তে, এই স্তম্ভিত স্থবিরতার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা চিত্রার হতবাক মুহূর্তেও না।

আবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। চিত্রার হাতের ধাক্কায়, কপাটের পিঠে কপাট জুড়ে। বন্ধ কপাটের সামনে প্রলম্বিত করিডোর, আঙুলে গোনা পদক্ষেপের দৌরাত্ম্য ছাড়ালেই বসার

ঘর। বসার ঘর মানে সুসজ্জিত কোনো বৈভবের বিজ্ঞাপন নয়— সাদামাঠা সোফা, সেন্টার টেবিল, একটা সানমাইকা জড়ানো প্লাইউডের শো-কেস। তার বুক ভরা কয়েকটা বই। দেওয়ালে চিত্রার হাতের সুতোর ফোঁড়ে ফোঁড়ে ফুটিয়ে তোলা রবীন্দ্রনাথের একটা কাচ বাঁধানো ছবি। ঠিক তার উল্টোদিকে সাদা-কালোর দম্ভে মোড়ানো আর একটা ছবি। রবীন্দ্রনাথের ছবির মতোই সে ছবিরও ফ্রেম জুড়ে ঝুলে আছে মসৃণ কাগজের সাদা মালা।

মেয়েটা কোথায়? কী নাম রেখেছ? কোন স্কুল, কোন ক্লাসে পড়ছে?

এবার সত্যি সত্যি চমকে ওঠে চিত্রা। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের জট মাকড়সার জাল বিস্তার করে ঘোলাটে করে দেয় চোখের দৃষ্টি। নারুদা কিংবা নারু ততক্ষণে ঘরের কোণের একমাত্র ডবল সোফায় নিজের শরীর এলিয়ে পথের ক্লান্তি দূর করায় ব্যস্ত।

চা খাবে? এতক্ষণ পরে নিজের সবাক অস্তিত্ব জাহির করে চিত্রা।

মন্দ হয় না। যদিও এখন স্নান করে ভাত খাওয়ার সময়। টি টেবিলের উপর পড়ে থাকা বাসি খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে নারু কিংবা নারুদা। ঠিক অস্বচ্ছ কোনও পর্দায় নিজেকে আড়াল করার মতো আড়াল করে। চায়ের পরে হয়তো স্নানের অনুরোধ করবে চিতু— তারপর ভাত। মা-মেয়ের সংসারে দুপুরের বাড়তি লোকের ভাত হয়তো হাঁড়িতে নেই। না থাক, একমুঠো চাল রাইস কুকারে ফোটাতে কতক্ষণ? স্নান সারতে সারতেই থালার বুকে মিহি ধোঁয়া ওড়াবে সে ভাত—সাদা সাদা স্বপ্নের দানার মতো।

বাটিতে ফুটন্ত চায়ের জলের পেটে চামচ মেপে চা ছড়িয়ে দেয় চিত্রা। এতদিন পরে হঠাৎ এ কোন অমোঘ তামাশা? ভাঙনের কালবৈশাখি? ভূমিকম্পের তাণ্ডব? সেদিনও তো ঠিক এমনি ভাবেই কূলভাঙা প্লাবনের ঢেউ হয়ে হাজির হয়েছিল নারুদা। হ্যাঁ, তখন নারুদা নামেই ডাকত চিত্রা। সেদিন— চিত্রার সেই তেইশ বছর বয়সের সবুজ সতেজ শ্যামল চরে নারুদার স্বাভাবিক আগমন জীবনের সব পাড়, সব কূল, সব সবুজ, সব সতেজ তোলপাড় ভেঙে দেবে, তা কি সে জানত?

সুকান্ত জ্যেঠুর ছেলে— ভদ্রগোছের একটা মেসবাড়ি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আতিথ্য গ্রহণ করবে হারাধনবাবুর। গ্রীষ্মের ধুলোয় ধূসরিত কিংবা বর্ষার কাদাডোবা রাস্তা ঠেলে জালালখালি হল্ট স্টেশন। সেখান থেকে কলকাতা তিন ঘন্টার পথ। যাতায়াতে সময় খরচ ছ' ঘন্টারও বেশি। তাছাড়া নতুন চাকরি— দেশ বিভাগের আগের বন্ধুত্ব— ভিটেমাটি হারিয়ে গেলেও সম্পর্ক হারায়নি, হারাবে না— প্রমাণ করার জন্যেই ফিরতি পোস্টকার্ডে ঝরঝরে বাংলার অনুমতি পাঠিয়ে ধন্য হয়েছিলেন হারাধনবাবু— চিত্রার বাবা। সুকান্ত জ্যেঠু কিংবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের চোখে না দেখলেও বাবার মুখে শোনা গল্পের ঠাস বুনোট ক্যানভাসে নারুদার পরিচয় অজানা ছিল না চিত্রার। সাতচল্লিশের স্বাধীনতায় বাংলা নামের দেশটা ভারত-পাকিস্তান হয়ে গেলেও দুটো পরিবারের ভেতর চিঠির আদান-প্রদানে ভাগ হয়নি কখনও।

বিনিময় করা সম্পত্তিতে সুকান্ত জ্যেঠুর বাবা জমিদারি গড়েছিলেন নদীয়ার জালালখালিতে। আর আনন্দমোহন ছেলে হারাধনের হাত ধরে এসে উঠেছিলেন বেলঘরিয়ায়— বোনের বাড়ি। স্কুল মাস্টার আনন্দমোহনের যে বৈষয়িক টানের অভাব সে কথা বহুবার উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সুকান্ত জ্যেঠুর বাবা। কিন্তু ফল হয়নি। জীবনের টানাপোড়েনে নিয়ত লড়াই করেই গুছিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। শিক্ষার আলো জ্বালার দেশলাই কাঠি যাঁর হাতে সে কেন অন্ধকার দুয়ারে ঘুরবে মাথা কুঁড়ে? ধন-সম্পত্তি টাকা পয়সা বৈষয়িক উন্নতি তো অবিদ্যার সাধনা। বিদ্যার সাধক কেন পা দেবে অবিদ্যার প্ররোচনায়?

ঠাকুর্দার আদর্শে গড়ে উঠেছিলেন বাবা। বাবার আদর্শে চিত্রা। অজ্ঞান বয়সে মা মারা যাওয়ার পর থেকে দাদা আর বাবার সংসার মায়ের স্নেহে লালন করেও কখনও স্খলিত হয়নি একটুও। অথচ স্খলন শেষপর্যন্ত হলই—

ছাঁকনির পর্দা নিঙড়ে কাপে ঢালতে গিয়ে প্লেটের উপর চলকে পড়ে চা। পরিবেশনের নিয়মে সেটা অশালীন। সুতরাং ধুয়ে মুছে আবার চায়ের কাপ প্লেটের বুকে শহিদ বেদীর স্টাইলে স্থাপন করে বসার ঘরে হাজির হয় চিত্রা।

ধন্যবাদ! আঙুলের সঙ্গে আঙুলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে নিজের কোলের দিকে কাপ-প্লেট টেনে নেয় নারু। তৃপ্তির বিস্ফোরণ ঘটায় চুমুকের আওয়াজে। তারপর চোখ রাখে— সরাসরি চিত্রার চোখে, মেয়েটার কী নাম রেখেছ বললে না তো? জিগ্যেস করা অবশ্য অন্যায়। পৃথিবীতে সম্ভবত এই প্রথম কোনও বাবা জানে না তার আত্মজার নাম।

সমন্বিতা! শান্ত গম্ভীর একটি শব্দের উত্তরে নারুকে নিবৃত্ত করতে চায় চিত্রা। একের পর এক হৃদয়ের কবর খুঁড়ে খুঁড়ে কঙ্কাল টেনে হাজির করানো থেকে বিরত করতে চায় নিজেকে।

সুন্দর! ভারি সুন্দর! তবে বড্ডো কঠিন। আমি বরং সমি বলেই ডাকব— কী বল, চিতু?

আবার চিতু! কানের ভিতর শব্দটার পারমাণবিক বিস্ফোরণ সহ্য করতে পারে না চিত্রা। প্রথম পরিচয়ের দিনে, সেদিনের নারুদা ঠিক এমনি করেই চিতু শব্দটা ঠোঁটে তুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল তার কান লক্ষ করে। শব্দের সেই তরঙ্গ কাঁপতে কাঁপতে কান ছেড়ে মনের গভীরে ঢুকে বাসা বেঁধেছিল— ঘুণপোকার বাসা। চিত্রার তেইশ-বসন্তের জীবনে সেদিন সেই প্রথম কোনো পুরুষ এক অবর্ণনীয় ধাক্কা দিয়েছিল, হাতছানি দিয়েছিল প্রকৃতির নিয়মে— জৈবিক কারণে।

সুমন্ত্র—চিত্রার দাদা তখন শিলিগুলিতে। নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে। একটা কার্ডিয়াক অ্যাটাক সামলে হারাধনবাবুর সামান্য অসহায় অবস্থা। রাতবিরেতে ডাক্তার-কবিরাজ আছে— নারুর মতো এমন জানাশোনা ভরসা কি হাতছাড়া করা উচিত? সবার অলক্ষ্যে নারুদা

একদিন নারু হয়ে গেছিল। গ্রামের ছেলে শিখেছিল প্রেমের সহজপাঠ। চিতু শিখেছিল কিছু মন্ত্র। সত্তর দশকের হারিয়ে যাওয়া গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার মন্ত্র। ভোগবাদি পৃথিবীর বুকে লাথি কষিয়ে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার মন্ত্র। গণতন্ত্রের নামে ব্যালটবাজির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার মন্ত্র। নিরালা নির্জনে নিজের সহকর্মী বিজনকে পাশে বসিয়ে চিত্রার কানে সে সব মন্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব ঢেলে দিত নারু। বলার ভঙ্গিতে তার সম্মোহন। সেই সম্মোহনের ঝড় একদিন ভাষা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চিত্রার শরীরের কানাচে কানাচে। শরীরের সঙ্গে শরীরের নিবিড় বন্ধন স্থাপিত না হলে কি মনের রসে পাক আসে? সাহসী স্বাধীনচেতা না হলে কি বদলে দেওয়া যায় দুনিয়া?

এ তুমি কী করলে, নারু? প্রথম মাসে ততটা ভয় না পেলেও পরের মাসে শিউরে উঠেছিল চিত্রা। বাবা শুনলে আত্মঘাতী হবে। সুমন্ত্র মুখ ফিরিয়ে নেবে ঘৃণায়। আত্মীয়-পড়শীরা মুখরোচক গল্পের প্লট নিয়ে টেবিল টেনিস খেলবে। তার চেয়ে বরং সত্যিকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে এসো আমরা মোকাবিলা করি— আইনের প্রমাণে আমাদের বন্ধন দৃঢ় করি— পূর্ণ করি ভালোবাসা। ভোরের সূর্যের প্রথম আলোয় বরণ করি আমাদের আগামীর আগমন। আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতো চোখের জলে নয়, চোখের দ্যুতি ছড়িয়ে অনুরোধ করেছিল চিত্রা। সেদিনের নারুর কাছে। তার ভালোবাসা, ভালোলাগার নারুর কাছে। তার মন্ত্রগুরু, বাবার বন্ধু সুকান্ত জ্যেঠুর ছেলে নারুর কাছে।

আর নারু?

সব শুনে, সব বুঝে উচ্ছ্বাসিত হয়েছিল। মন ছাড়িয়ে ভালোবাসার বীজ চিতুর শরীরে অঙ্কুরিত হয়েছে— সে কি কম আনন্দের। বিয়ে তো বুজরুকি। ধর্ষণকারী কোনও পুরুষের সামাজিক শংসা পত্র। সমাজের চোখে ছড়ানো ব্যভিচারের ধুলো। বুকের পাপড়িতে প্রজাপতির মতো লেপ্টে রেখে চিতুকে সব বুঝিয়েছিল নারু। আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। শরীরে মনে চিন্তায় ভাবনায় নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে আমাদের যে ভালোবাসা তার প্রমাণই তো তোমাকে শুষে বেড়ে উঠতে চাইছে। এ সবই তো আমাদের মিলিত জয়, গর্ব, অহংকার।

সেই অহংকারের আয়না হাত থেকে পড়ে চুরচুর হয়ে ভেঙে যেতে দেরি হয়নি মোটেও।

রবিবার। অফিস ছুটি। সকালের ট্রেনেই জালালখালি পাড়ি দিয়েছিল নারু। চিতুর অনুরোধে— বাবার অনুমতি সংগ্রহ করতে। সঙ্গে পার্টিরও টুকটাক কাজ। সুকান্ত জ্যেঠুর প্রস্তাব বাবা ফেলতে পারবেন না— নারুকে বুঝিয়েছিল চিত্রা। তাছাড়া, প্রথম অ্যাটাকের পর হারাধনবাবুও যথেষ্ট ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন চিত্রাকে নিয়ে। নারুর সঙ্গে মেলামেশার কাহিনিও হয়তো জেনে গেছেন কিংবা অনুভব করেছেন। আদর্শবাদী শিক্ষক পিতা আনন্দমোহনের আদর্শবাদী অধ্যাপক পুত্র হারাধন উপযাচক হয়ে অবিদ্যার পূজারী বৈষয়িক সুকান্তকে নিজের মেয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠাতে দ্বিধান্বিত হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে মেয়ের ঋতুবন্ধের সংবাদ

কানে পৌঁছলে হয়তো তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তাড়া দিয়েছিল চিত্রা। নারুর যোগ্যতা, দেশকাল সংস্কারের কৌলিন্য— সব বিচার বিবেচনা করে শেষপর্যন্ত হয়তো নাকচ করবেন না হারাধনবাবু—

জালালখালি স্টেশনে নেমে সত্যবাবুর মুখে খবরটা শুনেছিল নারু। কলকাতা থেকে বিজন এসে ঘুরে গেছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে সংগ্রহ করেছে সব খবর। নারায়ণ রায়ের খবর। সুকান্ত রায়ের খবর। সম্পত্তির খবর। ভাগচাষিদের পাওনাগণ্ডার খবর। সামন্ত প্রভুর সন্তান হয়ে বুর্জোয়া বিলাসিতায় ভেসে থাকা নারুর খবর। সত্যদার মুখে শুনেছিল বিজনের উসকানির খবর। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই ধাক্কা দেওয়ার খবর। সে সব খবর বিশ্বাস করেনি নারু। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল। বিজন যে তার হৃদয়ের অংশ। সহকর্মী শুধু নয়, আত্মীয়ের মতো। বিজনকে তো সে নিজের হাত গড়ে তুলেছে। নিজের মনে, নিজের ঢঙে উদ্বুদ্ধ করেছে। মন্ত্র শিখিয়েছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের।

সত্যদাকে ছেড়ে বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে অন্য চিন্তায় ডুব দিয়েছে নারু। বিজনের কী দোষ? পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি তাকে অবিশ্বাস করে? অপ্রকাশ্য একটা পার্টিকে গোপনে সংগঠিত করতে, শক্তিশালী করতে মদত তো সে কম করছে না। অর্থ সামর্থ্য শিক্ষা আদর্শ উজাড় করে ধনী করার চেষ্টা করছে পার্টিকে। অথচ পার্টি তলে তলে গোয়েন্দাগিরি করছে। তার সংসার সম্পত্তিতে সামন্ততান্ত্রিকতার ঘা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নারু, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। হারিয়ে গেল সোনার খাঁচার দিনগুলো। কিন্তু বিশ্বাস করো—

না, কারুর কোনও আবেগ প্রশ্রয় দেওয়ার মানসিকতা এই মুহূর্তে নেই চিত্রার। চায়ের কাপ-প্লেট হাতে তুলে পিছন ফেরে। অতীতকে দেখে হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে চায় না। তবুও হৃদয়ের মাটি সরে সরে যায়। বেদনার ক্ষত দগদগে হয়ে ওঠে। সেদিন জালালখালির ঘটনাটা হয়তো দুর্ঘটনাই ছিল। কিন্তু তারপর?

চিতু! ডান হাতের মুঠোয় হঠাৎ চিত্রার বাঁ হাত চেপে ধরে নারু। আচমকা নাটকীয়তায় ধৈর্য হারায় চিত্রা। এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে মুখোমুখি হয় নারুর— কী চাই তোমার? কেন এসেছ এখানে?

তোমার জন্য, শুধুমাত্র তোমার জন্যেই ছুটে এসেছি। আর এসেছি মেয়েটার জন্য—

না-আ আ! তোমাকে আমি চিনি না। চিনতে চাই না।

বিশ্বাস করো, আমি কোনও অন্যায় করিনি, আবার সোফার পিঠে সওয়ার হয় নারু। সেদিন জালালখালির বাড়িতে পৌঁছেই তো দেখেছিল জনরোষ। তার বাবা সুকান্তবাবুকে ঘিরে একদঙ্গল খালি গায়ের, খালি পায়ের, রোদ পোড়ানো চামড়ায় কঙ্কাল ঢাকা মানুষগুলো কী যেন কৈফিয়ৎ চাইছিল। শব্দ-বাক্যের ঐকতানে সে দাবির এক বিন্দুও বোঝার উপায় ছিল

না। সুকান্তবাবুর মুখে ছিল ন্যাবা মানুষের রঙ, চোখে হিংসার দাবানল আর হাতে সরকারি অনুমোদন পাওয়া বন্দুক। ভিড় ঠেলে একদৌড়ে দাওয়ায় উঠে বাবার পাশে দাঁড়িয়েছিল নারু— দু'হাতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর চেহারা এনে বোঝা এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছিল জালালখালির জনতাকে। বাবার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বন্দুক— বুকে ভরেছিল আত্মতৃপ্তি। এমনি ভাবেই সামন্ত প্রভুদের সব বন্দুক একদিন কেড়ে নিতে হবে......।

ঠিক তখনই ঘটেছিল ঘটনাটা।

এক টুকরো ইঁট উড়ে এসে পড়েছিল নারুর কপাল জুড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগারের পেটে আঙুলের অনভ্যস্ত চাপে নারুর হাতের বন্দুকমুক্ত গুলি কপাল সমেত সুকান্তবাবুর খুলি উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছিল উন্মত্ত জনতার স্রোতে। আর নারু সওয়ার হয়েছিল জনতার কাঁধে। পরের দিন সবগুলো খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছড়িয়েছিল লিভ নিউজ— 'কৃষকনেতা-পুত্রের হাতে জোতদার পিতা খতম'।

খবর পড়ে ঘৃণায় দুঃখে নিজের ভিতর নিজেই কেন্নো হয়ে কুঁকড়ে গোল হয়ে গেছিল চিত্রা। জনতার কাঁধে চেপে নারু ফেরার। অকূল পাথারে ভাসতে ভাসতে বিজনের দরজায় আছড়ে পড়েছিল চিত্রা। নির্দেশ ছাড়াই এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য এক্সপেল করেছে পার্টি। অফিস নারায়ণ রায়কে সাসপেণ্ড করেছে। একটা খবর ঘিরে গড়ে ওঠা সব খবরগুলো সংগ্রহ করে চিত্রা এসে দাঁড়িয়েছিল বাবার মুখোমুখি। কান্না নয়, ভেঙে পড়া নয়, অস্থিরতা নয়— টানাটান ঋজু স্পষ্ট স্বচ্ছ ভঙ্গিতে সব কিছু কবুল করেছিল হারাধনবাবুর কাছে। স্তম্ভিত হারাধনবাবু পরামর্শ দিয়েছিলেন অ্যাবরশনের।

রাত্রেই দ্বিতীয়বার অ্যাটাক হয়েছিল হারাধনবাবুর। পড়শীর সাহায্যে ধরাধরি করে ভর্তি করা হয়েছিল আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। খবর পাঠানো হয়েছিল সুমন্ত্রের কাছে— শিলিগুড়িতে। সকাল হতে না হতেই আই. সি. ইউয়ের সামনে সাহায্যের ডালি হাতে হাজির হয়েছিল বিজন।

তারপর শুধু নাটক আর নাটক। এক অঙ্কের পর দ্বিতীয় অঙ্ক। বাবা আই. সি. ইউতে জ্ঞানহীন বিছানায়। মেয়ে নার্সিং হোমে। দিশেহারা ভাই সুমন্ত্রের একমাত্র সম্বল বিজন।

স্কাউন্ড্রেলটার গলায় যত্ন করে মালা ঝুলিয়ে রেখেছ? বিজনের ছবির ফ্রেম থেকে হ্যাঁচকা টানে হঠাৎ কাগজের মালা ছিঁড়ে ফেলে নারু।

বিজন স্কাউন্ড্রেল? বলতে পারলে? ফুঁসে ওঠা চিত্রা।

নয়তো কী? পার্টিকে এক্সপ্লয়েট করে, আমাদের ভালোবাসাকে ছিনিয়ে নেওয়ার মতলবে—

প্লিজ নারুদা! প্লিজ— যা জানো না—

নারুদা? তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়ায় নারু।

নিজের ঠোঁট, নিজের কানকেও চমকে দিয়ে নিজের অজান্তে হঠাৎ 'নারুদা' সম্বোধন ঠোঁটমুক্ত হওয়ায় অবাক হওয়ার সব সীমা ছাড়ায় চিত্রা। মেঝেয় পড়ে থাকা সর্পিল ভঙ্গির মালা তুলে নেয় দু'হাতের যত্নে। সেদিন কী করেনি বিজন? নার্সিংহোম অ্যাবরশনের অনুমতি পত্রে নিজের নাম ঘোষণা করেছিল হাজব্যাণ্ড বলে। সময়ের গণ্ডি পার হয়ে সোজা রেজিস্ট্রারের দরজা ঘুরে চিত্রার সীমান্তে সিঁদুরের রক্তিম রেখা এঁকে হাজির হয়েছিল আই. সি. ইউয়ের বেডে শুয়ে থাকা হারাধনবাবুর সামনে। নারু তখনও ফেরার। খোঁজহীন খবরহীন অন্ধকার আবর্তে।

সেদিন কী করেনি বিজন?

সুমন্ত্রের সামনে চিত্রাকে আশ্বস্ত করেছিল— ভুলে যাবেন না আপনি নারায়ণের আমানত। হারাধনবাবুকে বাঁচাতে, সমাজের মুখ ঢাকতে আমি শুধু আপনাকে স্ত্রী স্বীকৃতি দিয়েছি মাত্র। পিতৃপরিচয়ের দৈন্য থেকে আপনার আর নারায়ণের সন্তানকে বাঁচাতে রেজিষ্ট্রি করেছি। নারায়ণ ফিরে এলেই আমার দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে।

সেদিন কী করেনি বিজন?

সুমন্ত্রের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হারাধনবাবুর সৎকার করেছে। অভিভাবকের ভূমিকায় তদারকি করেছে সুমন্ত্রের পড়াশুনার। নিজের বাড়ি, বাবা, মা, পরিবার-পরিজন ছেড়েছুড়ে চিত্রার ফ্ল্যাটের এক কোণে আশ্রয় নিয়েছে। সমুর জন্ম ঘিরে মেতে উঠেছে উৎসবের আনন্দে। জনক না হয়েও রাজার বৈভবে পালন করেছে জনকের ভূমিকা। পুরো এক বছর তিন মাস এক ফ্ল্যাটে এক ছাদের নীচে স্বামীর ভূমিকায় নিজেকে স্থাপিত রেখেও কখনও স্বামীর অধিকারে বিব্রত করেনি চিত্রাকে। থানায় থানায়, জেলায় জেলায়, পার্টির গোপন দপ্তরে দপ্তরে খোঁজ করেছে নারায়ণের। জেল, হাসপাতাল, মর্গ, তোলপাড় করে খুঁজেছে— জালালখালির ফেরারীর বিন্দুমাত্র সন্ধানও জানতে পারেনি বিজন।

পনেরো মাস ধরে পনেরো পয়সার একটা পোস্টকার্ডও ছুঁড়ে দেয়নি নারু।

চক্রান্ত! সবই ছিল হারামজাদা বিজনের চক্রান্ত। হঠাৎ বিড় বিড় শুরু করে নারু— বাবার বিরুদ্ধে চাষিদের ক্ষেপিয়ে তোলা, আমাকে ডিফেম করার জন্য পার্টির কাছে সাতখানা বানিয়ে বলা। সব, সব ছিল তার কুচুটে মনের প্রতিফলন। কারণ—

কারণ? বিদ্যুতের চাবুক চোখে ঝলসে ওঠে চিত্রা।

কারণ তুমি। আসলে ভুলটা আমারই— একটু বেশি মাত্রায় বিজন আর তোমার মেলামেশাটা প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছিলাম, নইলে—

কী বলতে চাও তুমি? ক্রুদ্ধ সাপিনীর উদ্ধত ফণা ফুঁসে ওঠে চিত্রার হুঙ্কারে, এই মন এই মানসিকতা নিয়ে তোমরা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে? নিজের বাবাকে গুলি করে ফেরার হলে। একটা প্রেগন্যান্ট কুমারী মেয়ের খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করলে না—

না, বাবাকে আমি গুলি করিনি। ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। ইন্সিডেন্ট। আর সেই ইন্সিডেন্টের যাবতীয় সিচ্যুয়েশন তৈরী করেছিল তোমার ওই প্রেমিক— বিজনের ছবির ফ্রেমে তর্জনী নিক্ষেপ করে নারু।

খবরদার বলছি! বিজনকে অপমান করার কোনও অধিকার তোমার নেই।

তা থাকবে কেন? দিব্যি আছ। কমপ্যাশনেট গ্রাউণ্ডে চাকরি পেয়েছ। পেনশন গ্রাচুইটি— বাপের সম্পত্তি ভোগ করছ। বিজন তো তোমার কাছে দেবতা হবেই, শ্লেষ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় নারু।

অজ্ঞতা আর মনের কুটিলতা তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে, ঘৃণা আর শ্লেষের সমন্বয়ে নারুকে বিদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয় চিত্রা, ফর ইয়োর ইনফরমেশন, জেনে রাখো আমি বিজনের অফিসে চাকরি করি না। বিজনের একটা টাকাও আমি স্পর্শ করিনি কোনোদিন। কারণ সে অধিকার আমার নেই।

ব্রেভো! ব্রেভো! মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথাগুলো উচ্চরণ করলে পাক্কা অভিনেত্রী হতে পারতে। অধিকার নেই? বিয়ে করে স্ত্রী হতে পারলে আর স্বামীর সম্পত্তিতেই যত আপত্তি— দু'হাতের তালুতে তালুতে তালহীন শব্দ ছড়ায় নারু।

বিয়ে করেছিলাম ঠিকই! কিন্তু স্ত্রী হতে পারিনি। বিজনও চায়নি স্বামী হতে, কারণ তুমি—

আমি? বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখের পলক ঠেলে আবার নিজের শরীরটাকে সোফায় এলিয়ে দেয় নারু।

হ্যাঁ তুমি! চিত্রা ভেবেছিল এসব কথা সে কোনদিনও কাউকে বলবে না। তখনও এই মুহূর্তে নারুর সামনে দাঁড়িয়ে সেসব কথা কবুল করতে তার ঘৃণা হচ্ছে। ভাগ্যিস মেয়েটা বাড়ি নেই। সুমন্ত্রের স্ত্রী সরমা আজ সকালেই তাকে মামার বাড়ি নিয়ে গেছে— বর্ধমানে। নইলে এই লোকটার মুখোমুখি হয়ে কী যে কাণ্ড হত কে জানে? সমন্বিতা জানে বিজনই তার বাবা। স্কুলে, বার্থ সার্টিফিকেটে, ইনসিওর পলিসির খাতায় সর্বত্রই বিজনের নাম দখল করে আছে পিতৃত্বের ভূমিকায়। বিজনকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে সে। আজ এই মানুষটা সব কিছু ভেঙে চুরচুর করে দিত। বীজের গর্বে গাছের কাছে ফলাত জনকের অধিকার। শুধুমাত্র বীজ রোপণ করলেই কি মহীরুহ হয়— মাটিতে জল সিঞ্চন করতে হয়— সার দিয়ে পুষ্ট করতে হয় জমির উর্বরতা। দায় নিতে হয়, দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা রাখতে হয়— যা ছিল বিজনের মধ্যে। সুতরাং সমন্বিতার আসল জনক তো বিজনই। সে অধিকার, সে ভাবনা, সে বোধ, সে স্বচ্ছতা থেকে বিজনকে কোনোদিনও বিচ্যুত করবে না চিত্রা। যত ঝড়, যত প্রলোভন, যত চিৎকার, দুঃখ, অশান্তি হোক না কেন!

চুপ করে রইলে যে? তর্কের প্রয়োজনে তর্কের গভীরে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করলেও

নারু তো নিজেকে জানে। চিত্রাকে ভালোবাসার ভিতর কোনও খাদ ছিল না ঠিকই— আজও নেই। থাকলে এমন ঝুলি সম্বলতায় এ দুয়ারে এসে দাঁড়াত না। জালালখালির ঘটনা ছিল অকস্মাৎ, অ্যাক্সিডেন্ট, অজ্ঞতাপ্রসূত। পরশুরাম সে হতে চায়নি— হয়েছিল বাধ্য হয়ে। কিন্তু বিজনের ক্ষেত্রে—

ভুল তার হয়েছিল ঠিকই।

বাবার মৃত্যুর পর জনতার উৎসাহ-উদ্দীপনায় পার্টির নির্দেশে বাধ্য হয়েছিল ফেরার হতে। সুকান্তবাবুর একমাত্র পুত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও মৃত বাবার কোনও কাজে আসেনি সে। কিন্তু চিত্রার সঙ্গে যোগাযোগ করা তার উচিত ছিল। শরীরের খোলসে ভালোবাসার নিদান বয়ে বেড়ানো কুমারী চিত্রার কথা তার ভাবা উচিত ছিল। যদিও যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন আধুনিকতা সেদিন ছিল না— তবুও ছলে কৌশলে বেশে ছদ্মবেশে চেষ্টা করা উচিত ছিল।

এবং তখনই ঘটেছিল বজ্রপাত।

নারু তখন সিউড়ির এক আলো-বাতাসহীন গ্রামে লুকিয়ে ছিল নিজের নাম ধাম পরিচয় বদলে। খবরটা বয়ে এনেছিল পার্টিরই এক কর্মী। খবর তো নয়, বিস্ফোরণ। বিজন বিয়ে করেছে চিত্রাকে। সংবাদ শুনে নিজের ভিতর নিজে কুঁকড়ে গুমরে উঠেছিল— এতবড় স্পর্ধা? ব্যাভিচার? আর সেইদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল প্রতিশোধের। পৃথিবীর আলো-হাওয়া থেকে বিজনকে সরিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা।

তোমার তো অন্তত ভাবা উচিত ছিল। সন্তানসম্ভবা কুমারীদের জন্য দেশে তো নার্সিং হোমের অভাব নেই, মাথা দোলায় নারু।

চুপ করো! এতদিন পরে এমন গীতার বানী তোমার মুখে শোভা পায় না, বাদলদিনের কাজল মেঘ হয়ে গর্জে ওঠে চিত্রা। কেউটে সাপের লেজে যেন পা পড়ে। বিজনের মতো অমন একটা পুরুষ সমাজ-সংসারে বিরল। এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া শুনে তোমার লাভও নেই। প্লিজ, নারুদা, তুমি যাও! আমার সুখের সংসারে এমন বিষ ঢালতে এসো না কোনোদিন। প্লিজ!

তাড়িয়ে দিচ্ছ?

যদি মনে করো—তাই!

সত্যিই আমার ভুল হয়েছে। বিজনের আগে তোমাকেই খতম করা উচিত ছিল, সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নারু।

মানে? বিজনের মৃত্যু অ্যাক্সিডেন্ট নয়? চোখের ভ্রূ জোড়ায় গাণ্ডীব রচনা করে চিত্রা।

পুলিশের রিপোর্ট তো অ্যাক্সিডেন্ট বলেই জানে, স্বাভাবিক গলায় উত্তর ঢালে নারু।

তবে কি তুমি...থরথর কেঁপে ওঠে চিত্রা। তার শরীরের সে ভূমিকম্প, মনের ভিতরে সুনামির তোলপাড় ধরা পড়ে না কোনও রিখটার স্কেলে। শুধু বিধ্বস্ত করে যায়।

না, কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। বাবার মৃত্যুতেও ছিল সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব। আসলে মানুষের চরিত্রটাই এমন করুণ। গ্রামের পর গ্রাম, যারা সেদিন-চড়াও হয়েছিল বাবার দরবারে, তারা কেউই এগিয়ে আসেনি সাক্ষ্য দিতে। সুতরাং ফাঁসির আসামীর—

আমি, আমি সাক্ষী দেব।

কী সাক্ষী দেবে? দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন রেপড— লঙ লঙ এগো। কিংবা তুমি নিজের চোখে দেখেছ বিজনকে চলন্ত গাড়ির নীচে ফেলে দিতে—

আই হেট ইউ। আমি তোমাকে ঘৃণা করি— নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না চিত্রা। বাঘিনীর রাগে থাবা মেলে দেয় নারুর বুকে। টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে পুরোনো জামার কাপড়, ইউ স্কাউন্ড্রেল। তবু একটা কথা শুনে রাখো— বিজন আমাকে বিয়ে করেছিল তোমার আমানত যত্নে, সম্মানে তুলে রাখার জন্য। স্বামীর অধিকারে মুহূর্তের দুর্বলতাও তাকে স্পর্শ করেনি। এক মুহূর্তের জন্যও সে আমার শরীর ছুঁয়ে দেয়নি। 'তুমি' সম্বোধন করেনি কখনও। শুধু সান্ত্বনা দিয়েছে— তোমার গুণের নামাবলি শুনিয়েছে। তোমার স্ত্রীর শ্রদ্ধায় আমাকে অপেক্ষা করার মন্ত্র শিখিয়েছে। আর তাকেই কিনা তুমি খুন করেছ? হিংসে করেছ? বেশ করেছ— মানুষ হিসেবে বিজন সত্যিকারের গর্ব— আমারও হিংসে হয়— চোখের জলে বলার গতি স্তব্ধ হয়ে যায় চিত্রার।

আর নারু? হতবাক আসামীর লজ্জায় দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নিচু করে। ছিঁড়ে ফেলা কাগজের মালা সুতোর বন্ধনে জুড়ে ঝুলিয়ে দেয় বিজনের ফ্রেমে। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত তুলে ধরে মাথার কাছে।

তারপর চিত্রাকে টপকে বসার ঘর ছেড়ে সদর দরজা ঠেলে চিতুর কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচে নারু।